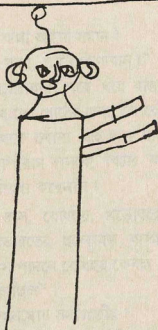


কথকতার নানা কথা

গৌতম ভদ্র



१० २० ३० ४० ५० ६० ७० ८० ९० १००

অননিঃ

□ পর্ব / ১ □

ক. পাঠের জগৎ :

ছোট্ট ছেলে বাবাই। নতুন পিসেমশায়ের উপর তার রাগের অন্ত নেই। পিসেমশায়ের জন্যই তো আদরের ‘তি’ অন্য বাড়িতে চলে এসেছে। আবার পিসেমশায়টা খুব জ্বালাতনেরও বটে। পিসির কাছে বেড়াতে এসে একদিন তাই রাগের মাথায় সে বলে বসে “সারাদিন পিসেমশায় শুনিয়ে থাকে, কিচ্ছু করে না। শুনু শুনুয়ে বই পড়ে। বইও বা পড়ে কোথায়? তাও পড়ে না। বই খুলে পাতার দিকে চুপ করে চেয়ে থাকে।” বাবাইয়ের চোখে, পড়াটাও শোনার জিনিস, আগুলাজ করে বলার কথা। তাকে তো সেভাবে সকলকে শুনিয়ে পড়তে হয়। ‘পড়া-শোনা’ কথাটা তো আর ফ্যালনা নয়। বাবাই এই কথা জানে আর জানতেন কাশীরাম দাস। কত স্বচ্ছন্দে না তিনি লিখতে পেরেছেন,

“মহাভারতের কথা অমৃত সমান।

কাশীরাম দাস কহে, শুনুনে পুণ্যবান।”

লেখা বলা আর শোনার যুগলবন্দী ঘরে ঘরে বাঙালি গৃহস্থকে পুঁথি নকল করতে অনুপ্রাণিত করেছিল। পুঁথি তো পাঠের জন্য, লোকের শ্রবণগ্রাহ্য হবার জন্য। শোনা থেকে লেখা, আবার লেখা থেকে শোনা এই ছকে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের আদি লেখকরা কৃতিবাস ওয়া বা কাশীরাম দাসকে বিচার করেছেন। রামগতি ন্যায়রত্ন এই বিষয়ে সরাসরি মন্তব্য করতে স্বিধা করেননি।

“নিঃস্ব কাশীরাম দাস, বোধহয়, খড়োঘরের পিড়ায় ছেঁড়া মাদুরে বসিয়া সেই প্রকাণ্ড মহাভারতের ছন্দাবদ্ধ বাঙালা অনুবাদ করিয়া গিয়াছেন। তাহলে বৃহৎকার্য সম্পাদনে বোধহয় কেবল কথকের কথামুখ শ্রবণই তাঁহার প্রধান সাহায্য করিয়াছিল”।

আবার কৃতিবাস প্রসঙ্গে তাঁর অনুমান সমগোষ্ঠীয়।

“কথকের মুখে রামায়ণ শুনিন্সা কবি এই গ্রন্থের রচনা করিয়া থাকিবেন। ‘পুঁথি শুনিন্সা গীত রচিল কৌতুকে’। তাঁহার এই নিজে লেখা দ্বারা তাহাই প্রতিপন্ন হয়। কথকরা উপাখ্যানভাগের বৈচিত্র্য সম্পাদনার্থ নানা পুঁথির একত্র সম্বন্ধ করিয়া থাকেন, ইনিও বোধহয় সেইরূপ করিয়াছেন”।^১

কৃতিবাস বা কাশীরামের রচনার উৎস প্রসঙ্গে রামগতির মন্তব্যের সঙ্গে অনেকে স্মিমত পোষণ করবেন। কিন্তু লেখা, পড়া ও শোনার মিশেল উনিশ শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত বিশ্ব সমাজকে এমন আচ্ছন্ন করেছিল যে উৎস সন্ধানের সূত্র বিচারে বাংলা সাহিত্যের ঐতিহাসিক রামগতিও কথকতার পরম্পরার মধ্যে কৃতিবাস ও কাশীরামের লেখার অনুসন্ধান করেছিলেন। পাঠের জগতেই যে এই কবিদের পরিচিতি। রামগতির আরেক সমসাময়িক একসূদ্রে লিখেছেন,

“এই গ্রন্থস্বয় সাধারণের আদরের ধন, অদ্যাপিও ইহা গৃহস্থের গৃহে এবং বণিকের বিপণে বিপণে এবং কখন কখন পল্লীগ্রামের বৃদ্ধ মণ্ডলী মধ্যে পাঠিত হইয়া থাকে।”২

পুঁথি লেখা হচ্ছে, অনুদ্বীপ তৈরি করা হচ্ছে পাঠের জন্য। পুঁথিকায় এর প্রমাণ আকছার পাওয়া যায়। যেমন,

“এত দূরে দাতাকর্ণের পালা হইল, জেবা শূনে জেবা গায় যে জন গায়ায় ॥

তাহার কামনা পূর্ণ করিচন্দ্রে গায়।

হরি হরি বল সব পালা হৈল সায়া ॥”

ইতি দাতাকর্ণ পালা সমাপ্ত। পাঠক শ্রী শ্রীমন্ত নাগ। সাং সালিখা।

লিখিতং শ্রী বারাগসি ঘোষ, সাং খাত ঘোষ। সন ১২৪৩ তারিখ ২৮শে ফাল্গুন।”৩

১৮৩৬ সালের এই পুঁথি কোনো দলছট নজির নয়। গজেন্দ্রমোক্ষণ, গুরুদীক্ষণা, ইত্যাদি পালা লেখা হচ্ছে পড়ার জন্য, কোনো না কোনো পাঠকের ফরমায়েস মারফত। পুঁথিও জমাটি হওয়া চাই কারণ পাঠক জবরদস্ত। ‘যেমন পাঠক তেমন গ্রন্থ মাহাসদর।’ পুঁথি পড়া, পুঁথি শোনা ও পুঁথি লেখা সংস্কৃতির তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে জড়িয়ে পড়েছে।^৪ আবার পুঁথি যেমন তেমন করে পড়লে চলবে না। পুঁথি পড়াটা শিল্প, সবাই শুনবে কারণ “অন্তঃকরণে ততই নানা রসের উচ্ছ্বাস হইবে, কখন হাসিবেন, কখন কাঁদিবেন, কখন চমৎকৃত হইবেন, কখন ভক্তিস্রোতে ভাসিয়া যাইবেন।”^৫

গ্রন্থ বিশেষে পুঁথি পাঠ আবার সাধনার সমতুল্য। কোরআন পড়ার জন্য কারী হতে হয়, গ্রন্থসাহেব পড়ার জন্য গ্রন্থীরা আছেন। ভিনদ্রানওয়ালা ছিলেন ভারতের অন্যতম সেরা গ্রন্থী, দমদমী তাকশালে গ্রন্থসাহেব পাঠে শিক্ষা দেওয়া হয়। প্রাক চৈতন্য আমল থেকে বাংলাদেশে ভাগবতীরা আছেন। চৈতন্য প্রবর্তিত আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে বৈষ্ণব সাধনায় ভাগবত পাঠ ভক্তিমাগে পদক্ষেপ বলে বিবেচিত হত, ভাগবত পাঠ ও চর্চা এক বিশেষ পাঠককুল তৈরি করেছিল। ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমভাগে চৈতন্য জীবননির্মাণ প্রক্টিয়ায় বৃন্দাবন দাস ভাগবত পাঠকে কীর্তন তুল্য বলে গণনা করেছেন। একদা পণ্ডিত সমাজে শ্রীচৈতন্য শাস্ত্র ব্যাখ্যারত, “চারি দণ্ড রাতি তছু নাহি অবসর”। এমন সময়,

“রত্নগর্ভ আচার্য, বিখ্যাত তার নাম।

প্রভুর বাপের সঙ্গী, জন্ম এক গ্রাম ॥...৬

ভাগবত পরম আদরে বিপ্রবর।

ভাগবত শ্লেোক পঢ়ে করিয়া আদর ॥...৭

ভক্তি যোগ শ্লেোক পঢ়ে পরম সন্তোষে।

প্রভুর কর্ণেতে আসি করিল প্রবেশ ॥

ভক্তির প্রভাব মাত্র শূন্যল থাকিয়া ।

সেইক্ষণে পড়িলেন মূর্ছিত হইয়া ॥”৬

ভাগবত শ্লোকের এমন শক্তি, তাকিঁক বিশ্বস্তরও পাঠ শূনে তক’ ভুলে গিয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়েন । আবার বেমক্সা শ্লোক পড়লে চলবে না, ব্যাখ্যা ভক্তিমার্গ অনুগত হওয়া চাই । দেবানন্দ পণ্ডিত হলেন ‘পরম সদ্ধশান্ত বিপ্র’, ‘জ্ঞানবন্ত তপস্বী আজন্ম উদাসীন’ । তাঁর নাম ডাক প্রচুর, ‘ভাগবতে মহা অধ্যাপক’, কিন্তু অপরাধ একটা, ‘তথ্যাপি ভক্তহীন’ । তাই যখন বৃন্দাবনদাসের চৈতন্যদেব “তান ব্যাখ্যা শূনিবারে পায়”, তখন তিনি ক্ষিপ্ত হয়ে পুঁথিটা ছিঁড়ে ফেলতে যান ।

“প্রভু বোলে, ‘সে অধম কিছই না জানে ।

নিরবধি ভক্তহীন এ বোটা বাথানে ।’

আজি পুঁথি চিরে এই দেখ বিদ্যামানে ॥”৭

আবার সঠিক ভক্তিমার্গ ভাগবত পাঠের জন্য বরাহনগরে শ্রী পাট গড়ে উঠেছে । পরিক্রমায় বেরিয়ে শ্রীচৈতন্য পানিহাটি থেকে ত্যাগ করে বরাহনগরে এসেছেন ।

“তবে প্রভু আইলেন বরাহ নগরে ।

মহাভাগবন্ত এক ব্রাহ্মণের ঘরে ॥

সেই বিপ্র বড় সদ্ধশিক্ষিত ভাগবতে ।

প্রভু দেখি ভাগবত লাগিল পাটতে ॥

শূনিঞা তাহান ভক্তিযোগের পঠন ।

আবিষ্ট হইলা গৌরচন্দ্র নারায়ণ ॥...

সেহো বিপ্র পড়ে পরানন্দে মগ্ন হইয়া ।

প্রভুও করেন নৃত্য বাহ্য পাসরিয়া ॥...

এইমত রাতি তিন প্রহর অবধি ।

ভাগবত শূনিঞা নাচিলা গুণনিধি ॥

বাহ্য পাই বসিলেন শ্রী শচীনন্দন ।

সন্তোষেতে বিপ্রেরে করিলেন আলিঙ্গন ॥

প্রভু বোলে “ভাগবত এমত পাটতে ।

কভু নাহি শূনি আর কাহারো মূখেতে ॥

এতেকে তোমার নাম ‘ভাগবতাচার্য’ ।

ইহা বই আর কোন না করিহ কার্য ॥”৮

রঘুনাথ পণ্ডিতের একমাত্র কাজ হবে ভক্তিশেষে ভাগবত পাঠ, সেটাই তাঁর কৃত্য । এই-ভাবে ষোড়শ শতকে পাঠ ও পাঠকের স্বাতন্ত্র্য আর মহিমাকে বৃন্দাবন দাস চৈতন্যের মূখ দিয়ে বৈষ্ণব সাধনায় প্রতিষ্ঠিত করেছেন । এই ধারার অনুসূতি চলেছে । চৈতন্য ভাগবতে প্রায় সব পাঠক ব্রাহ্মণ । পরবর্তীকালে তার কিছুটা ব্যতিক্রম দেখা যায় । ব্রাহ্মণের বৈষ্ণব-গুরুদ্বারাও ভাগবত পাঠে সিদ্ধ, তাঁদের চারি মহিমা ভাগবত পাঠের

আসরে স্ফূর্তিত হয়েছে। নরোত্তম বা শ্যামানন্দের মহিমা ভাগবত চর্চা ও পাঠে ব্যস্ত হয়েছে। কিন্তু পেশাদার পাঠকরূপে ব্রাহ্মণ শ্রীনিবাসাচার্য “সদগ্রন্থ-ব্যবসায়ের” অর্থাৎ গ্রন্থ পঠন-পাঠনের অনুষ্ঠান করে বেশ ভালোমত আয় করেছিলেন।^৯ দীনদারি ও দুর্নিয়াদারির মেলবন্ধন তাঁর জীবনে হয়েছিল। অষ্টাদশ শতকে ‘রসদুয়ে নরহরি’ রচিত ‘ভক্তি রত্নাকরে’ শ্রীনিবাসাচার্যের মহাত্ম্য বার বার ভাগবত পাঠক হিসাবে প্রকাশিত হয়েছে; প্রচলিত আখ্যানে হাম্বিরের সভায় রাজার পাঠক ব্যাসচক্রবর্তীর পাঠকে শ্রদ্ধা করে শ্রীনিবাসের ‘শ্রী কথা’ সভাস্থ সকলকে মন্থন করে।^{১০} তাঁর সময়ে বৈষ্ণব মহোৎসবে পাঠ আবশ্যিক হয়ে ওঠে। শ্রীখণ্ডে নরহরি ঠাকুরের তিরোভাব তিথিতে অনুষ্ঠিত উৎসবে সকালে পাঠ ও রাতে কীর্তন গানের আয়োজন করা হয়।

“শ্রীমদ্ভাগবত অদ্য দিবসে শ্রবণ।
রাগিযোগে সঙ্কীর্তনানন্দ আস্বাদন ॥”

পাঠের আসরের বর্ণনা বাস্তবসম্মত,

“সকল মহান্ত শ্রীনিবাস প্রতি কয়।

“শুনিতে তোমার মূখে বড় সাধ হয় ॥

শ্রীমদ্ভাগবত পড় বসি এ আসনে।

না কর সঙ্কেচ আমা সবার বচনে ॥...

পুনঃ পুনঃ অনুমতি পাইয়া সবার।

বসিলা আসনে—শোভা হৈল চমৎকার ॥

পুন্যকে অর্পিয়া পুষ্প তুলসী চন্দন।

করয়ে আরম্ভ চারু মঙ্গলাচরণ ॥

কোঁকিল জিনিয়া অতি সুমধুর স্বরে।

উচ্চারণে শ্লেোক—যেন সুধাবর্ষিকরে ॥”

সেদিন শ্রীনিবাস পড়ছিলেন ‘শ্রীরাসবিলাস কথা রসের পাথার।’

“কি অন্তত কথার মাধুর্যে! ধৈর্য নাশে।

উপমার স্থান নাই যে মধুর ভাষে ॥”

শ্রোতারা মন্থন, শব্দকদেবের শক্তি যেন শ্রীনিবাসের মধ্যে সঞ্চারিত, গদাধর পণ্ডিত বা শ্রীনিবাসের কৃপায় তাঁর এই পাঠ শক্তি। সারাদিন ধরে পাঠ চলে।

“শ্রীমদ্ভাগবত-কথামৃত আস্বাদনে।

কৈছে দিন যায় তাহা কিছই নাহি জানে।

শ্রীনিবাস দেখে দিবা অবসান হৈল।

প্রার্থনাপূর্বক কথামৃত সাঙ্গা কৈল ॥”

ষোড়শ শতকে শ্রীখণ্ডে ঠিক এরকম কোনো ‘কথার’ আসর বসেছিল কিনা, তা নিয়ে প্রশ্ন থাকতে পারে। কিন্তু অষ্টাদশ শতকের প্রথমভাগে এইরকম আসরকে স্বীকার করে

নিতে কোনো শ্বিধা থাকার সুযোগ ছিল না, নরহরি চক্রবর্তীর ‘ভক্তিরস্নাকরের’ লোক গ্রাহ্যতা তার প্রমাণ। সেই কালে পাঠ ও পাঠের আসর ভক্ত হৃদয়ের প্রকাশক্ষেত্র,

“কেহ কহে কত না করিয়া আশীষবাদ।

ধরিয়া হিয়ায় কহে,—পূর্ণ হৈল সাধ ॥

হৈয়াছে সকল শূণ্য—তা’তে দগ্ধ হিয়া।

করিয়া শীতল কথামৃত পিয়াইয়া।...

কেহ প্রণমিয়া বলে, “কৃতার্থ করিলা।

শ্রীমদ্ভাগবত কথারসে ডুবাইলা।”^{১১}

এই পাঠের চর্চা কিন্তু সম্প্রদায় বা গ্রন্থ বিশেষে আটকে থাকেনি। পুরাণ চর্চা ও পাঠ ব্রাহ্মণের জনে ছড়িয়ে পড়েছে। ঊনিশ শতকের শুরুরূপে পাদ্রি ওয়ার্ড তাঁতি, নাপিত, চাষা, তেলি, ব্যবসায়ী, গন্ধবানক, শূঁড়ি, স্বর্ণকার ইত্যাদি নানারকম জাতের লোকেরা পুরাণ পাঠে দক্ষ এই কথা উল্লেখ করেছেন।^{১২} সদ ব্রাহ্মণ ডেকে পুঁথি পাঠের আসর বসানোও জনপ্রিয় রীতিতে পরিণত হয়েছিল। এই সব পুঁথি পূজা পাঠকরা নিজেরা পড়েন ও অন্যদেরও পড়ান। কিন্তু পড়ার আগে তাঁরা পুঁথি পূজা করতে ভোলেন না। যদি কয়েকদিনব্যাপী পাঠের আসর বসানো হত, প্রথম ও শেষদিন তো পাঠ্য পুঁথিকে খানিকটা সময় ধরে অর্চনা করা হত। প্রত্যেকদিন পাঠের আগে ও শেষে পুস্তক বন্দনা কর্তব্য ছিল।^{১৩} প্রাত্যহিক কাজেও পাঠ ও বন্দনা মিশে যেতে লাগল। পাঠ ও পূজা অর্চনা করা তো সদ গৃহস্থের দৈনন্দিন কাজ হয়ে উঠল। ঊনিশ শতকের শেষ দশকে (১৮৯০) কুলদানন্দ ব্রহ্মচারী তাঁর পরিবারে এই পাঠচর্চাকে মাতৃসেবার অঙ্গ বলে মনে করতেন। প্রত্যহ বেলা ৩টা থেকে ৫টা পর্যন্ত নিয়মিত শ্রীমদ্ভাগবত রামায়ণ ও মহাভারত পাঠ করে মাকে শোনাতেন, পাড়ার লোকও ভিড় করে শুনতে আসত।^{১৪} পূজা অর্চনা ছাড়াও বাঙালি জীবন ও সংস্কৃতির চর্চায় পাঠ তার জায়গা খুঁজে পায়। বৈষ্ণব গ্রন্থ ব্যতীতও অন্যান্য দেশজ আখ্যান আসরে পাঠের উপজীব্য হয়। ঊনিশ শতকের সংস্কৃতিতে সুর করে পড়া, উদাত্ত কণ্ঠে পুঁথি শোনানো তারিফ পেত, গুণ বলে বিবেচিত হত। পিতৃদেবের নানা গুণ বর্ণনা করতে গিয়ে নবীনচন্দ্র সেন লিখেছেন,

“তিনি (পিতা) এমন সুপাঠক ও সুকণ্ঠ ছিলেন, তাঁহার মূর্তি এমন মনোমোহন ছিল, তাঁহার কবিতা পড়া বিশেষতঃ পুঁথি, যে একবার শুনিয়েছে সে ভুলিতে পারিবে না। তাঁহার বিদ্যাসুন্দর ও কবিকঙ্কণ পাঠ এখন যেন কোন আধস্বপ্ন বিস্মৃত সুদূরশ্রুত বীণাসংগীতের মত শুনিতে পাই। মনসা-পুঁথির ‘দংশন’, ‘বিষ নামান’ ও ‘বেহুলা লক্ষ্মীদেবের সন্ন্যাস’—এই তিনটি অংশ তিনি নিজে বাড়ী গিয়া পড়িতেন। সময়ে সময়ে তাঁহাদের চক্ষে জলের ধারা বহিত। ‘দংশন’ ও ‘সন্ন্যাসের’ সুকোমল কণ্ঠোচ্ছ্বাসিত করুণরসে শ্রোতাগণ চিত্তবৎ বসিয়া কাঁদিত, রমণীগণ কাঁদিতে কাঁদিতে আত্মহারা

হইত। 'বিষ নামান' পাঠে তাঁহার সেই গগনস্পর্শী গলার ব্যঞ্চারে সমস্ত গ্রামস্থানি যেন কঁপিত হইত।”^{১৫}

গোপীমোহন রায় জজ আদালতের পেশকার। সারাদিন পেশকারি কাজের পর সন্ধ্যায় পাঠ প্রায়শ তার ক্লাস্তি অপনোদনের উপায়।

পেশাদার পাঠকের আসরের সঙ্গে সঙ্গে ঘরে ঘরে পাঠের আসর বসছে। গ্রামে যৌথ পরিবারে দৈনন্দিন অবসরের সময় বসত পাঠের ঘরোয়া আসর। উনিশ শতকের মধ্যপাদে গ্রামের গৃহস্থ বাড়িতে কোনো না কোনো পুঁথি পাঠের জমাটি ঘরোয়া আসরের বর্ণনা নবীনচন্দ্র সেন দিয়েছেন। একটু পড়তে শিখে নবীনচন্দ্র সেনও এইরকম আসরের পাঠকে রূপান্তরিত হলেন।

“...আমি স্মরণ করিয়া ও শব্দ জোড়াইয়া পুঁথি পড়িতাম। আর পিতামহী বড়ি ও আমার মা খুড়ীরা সেই অপূর্ব পাঠ শুনিয়া হাসিতেন, কাঁদিতেন। সময়ে সময়ে তাঁহাদের চক্ষে জলের ধারা বহিত।”

এই সব গেরস্থালির আসরে পাঠাবিষয় চয়নে সবসময় যে খুব বাদ-বিচার করা হত, এইরকম মনে হয় না। যেমন, করা হত—

“তখন বঙ্গ সরস্বতী দেবীর দীনাক্ষীণা মূর্তি-স্থানি বটতলায় স্থাপিত। সেইখানে নিকুণ্ঠ কাগজে অস্পষ্ট অক্ষরে জননী যন্ত্রমুখে যে সকল ছাইমাটি প্রসব করিতেন, আমি সকলই পড়িতাম।”^{১৬}

বাড়ির কোনো বাচ্চা ছেলে একটু লেখাপড়া শিখলেই সে হয়ে উঠত কথক, তার পাঠাভ্যাস তৈরি হত পারিবারিক আসরে। পাড়া-প্রতিবেশীর সামনে। উনিশ শতকের তৃতীয় দশকে মনোমোহন বসু তাঁর শৈশব অতিবাহিত করেছেন মাতুলালয়ে, যশোহরের গ্রামে, সর্দার পোড়ো বলে তাঁর খ্যাতির অন্ত ছিল না। তাঁর ভাষায়,

“ক্রমে আমার পুঁথি পড়ার খ্যাতি পাড়ায় বড় ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল, ক্রমে আমাদের দরদালানে বৈকালবেলা পাড়ার যত প্রাচীনা, প্রৌঢ়া ও দূরই একজন নব্যোও আমাকে মধ্যে রাখিয়া মণ্ডলাকারে বসিতে লাগিলেন। আমি স্বীয় প্রবৃত্তি, তাঁহাদের অনুরোধ ও মাতৃআজ্ঞাতে প্রত্যহ তাঁহাদিগকে পুঁথি পড়াইয়া শুনাইতাম। ক্রমে আমাদের দরদালান নৈমিষারণ্য, পাড়ার মেয়ে ঋষি-মণ্ডলী এবং আমি সাক্ষাৎ উগ্রপ্রবা হইলাম।”^{১৭} ... (নজরটান আমার)

একেবারে পুরাণ পাঠের আসর, বিষয়ও হয় দাতাকর্ণ, গুরুদক্ষিণা, প্রহ্লাদ চরিত্র বা কাশীদাসী মহাভারত। কিন্তু বাচ্চা ছেলে পড়ছে আর পরিবারে নিয়মিত পাঠ চলছে; ছেলের দারুণ কদর এমনকি “পাঠশালায় যাওয়া একপ্রকার বন্দু হইল।” পড়তে পারলে অপরকে শোনাতে হবে, এই ব্যবহার পরিবারে ও পাড়ায় প্রত্যাশিত, সেইকাজ থেকে সদ্য পড়ুয়ার রেহাই নেই। উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে বর্ধমানের জমিদারবাড়ির অন্তঃপদুরে এক রীতি দেখা যায়। জমিদার গৃহিনী রাখালমনি পরিবারে কাজের ফাঁকে ফাঁকে আসর বসাতেন এবং তার দৈনিক বৈঠকে পরিবারের পড়ুয়া ছাত্র ‘ফেলদ’ বা

রামকৃষ্ণ মিত্র পাঠকপদ অধিকার করিতেন। কুলদানন্দ ব্রহ্মচারীর পরিবারের মতো এই পরিবারেও মালা গাঁথা সদগ্রন্থ পাঠ ও শ্রবণ ইত্যাদি কাজ প্রাত্যহিক সাংসারিক ক্রিয়া-কলাপের অঙ্গ বলে বিবেচিত হত; তার জন্য দিনমানের সময় ঠিক করা থাকত।^{১৮}

বিংশ শতকের দ্বিতীয় দশকেও আখ্যান শোনা ও গল্প বলার রীতি চালু ছিল। বীরভূমের লাভপুরে তারাশঙ্করের শৈশব ও কৈশোর স্মৃতি জুড়ে আছে পাঠ ও গল্প শোনার অনুষ্ণ। গ্রামে সব নামজাদা গল্প বলিয়ে ও বাচক থাকত। বড়দের ও ছোটদের আসরে তাঁদের খাতির ছিল সমান।^{১৯} গ্রিকাল ভট্টাচার্য পেশাদার গল্প বলিয়ে, তাঁর সঙ্গে তারাশঙ্করের পরে আলাপ হয়। কিন্তু ছেলেবেলার গ্রামে ছিলেন আরো অনেকে—ব্রজ জ্যাঠা, কৈদার চাটুজ্যে, তারাশঙ্করের বাবা গোঁসাইবাবা এমনকি গাঁয়ের লাঠিয়াল। সবাই গল্পের মজলিশ বসাতেন, ছেলেবুড়ো একমনে শুনত। সেরকম আব্দুলেও বদনচন্দ্র চৌধুরির মতো লোক ছিলেন, জমিয়ে কথকতার চঙে গল্প বলতেন। গ্রামের ছেলেপুলেদের কাছে তিনি ‘গল্পদাদু’। কিন্তু ‘বড় বড় সম্ভ্রান্ত মজলিশে’ও তাঁর ডাক পড়ত। মজলিশে আখ্যান শোনা আর তার তারিফ করা তখন রসিকের অভিজ্ঞান হয়ে দাঁড়িয়েছিল।^{২০}

ভদ্রলোকের বাড়িতে শুধু এই বলা আর শোনার সংস্কৃতি আবদ্ধ ছিল না। পাঠের আসরের চৌহদ্দিতে আম জনতাও ঢুকে পড়েছিল। ১৮৭৯ সালে এক সরকারি প্রতিবেদক লিখেছেন^{২১}

“কলকাতা শহরে একটু খেয়াল করলেই কোন দর্জির বা দেশীয় মৃদির দোকানের সামনে বেশ কিছু লোকের জমায়েত প্রায়শ পথচারীর চোখে পড়ে। এদের মধ্যে একজন লোকের উপর তার নজর প্রথমে আটকে যায়। মুসলমানি বাংলায় [sic] লেখা একটা আখ্যান সেই লোকটা পড়ছে এবং অত্যন্ত সঙ্গীতমূলক ও শাস্ত্রভাবে, গভীর আগ্রহের সঙ্গে, বাকিরা সেই পাঠ শুনছে। সামান্য ব্যাঘাতে তারা চটে যায়। তাদের চোখে পাঠক মহাশয় পরম বিম্বান। তার গুণ হয়ত একটি। বর্ণ প্রয়োগে ও শব্দ পাঠে তার দখল আছে ও সুর সহযোগে গভীর স্বরে সে দ্রুতগতিতে পড়ে যেতে পারে। পড়ার তালে তার শরীর ও মাথা দোলে। না দুলে সে পড়তেই পারে না।”

প্রতিবেদকের মতে, যে কোনো আরবি জানা মৌলভি এইরকম আসরে আসতে নাক সিটকোবে। নাদান ও জাহিল লোকেদের জন্য এই রকম পাঠের মজলিশ বসে। পাঠক এঁরা সবাই; রঘুনাথ ভাগবতাচার্য, শ্রী নিবাসাচার্য থেকে গ্রাম্য ‘কে’ড়েল’ মনোমোহন বসু, বাক্সা ফেলু বা দুলে দুলে পড়ায় গুস্তাদ নাম না জানা কোনো এক ‘মিঞা’ সাহেব। আসর সব কিছুই; কোথাও সেটা বরাহনগরের পাঠবাড়ি, শ্রীখণ্ডের মহাস্ত সমাবেশ, আবার কোথাও বা দর্জি বা মৃদির দোকানের দাওয়ার সামনে ‘নাদানদের’ জমায়েত। সবাই নিজের নিজের মতো করে রসজ্ঞ, পাঠের জগতে তারা সবাই শরিক। শ্রীখণ্ডে মহাস্তরা যেভাবে আত্মমগ্ন হয়ে পাঠ শোনেন, কলকাতার গরিব-গদুবোঁরাও সেভাবে একনিষ্ঠ হয়ে

কিস্যার পদার্থ শোনে। শোনাটা প্রত্যেকের কাছে জ্ঞাতব্য, শোনার মধ্য দিয়ে তারা জগৎকে চিনছে। তারাশঙ্করের মা দারুণ সব দেহাতি গল্প করতেন; সেইসূত্রে বলা ও শোনার এক মোক্ষম ‘মুহাব্বার’ তিনি তাঁর ছেলেকে শিখিয়ে দিয়েছিলেন, “বলনে-ওয়ালা ঝুট্টা, শুননেওয়ালা সান্ধা।”^{২২}

যে শোনে সেই সত্যি, তার কাছেই আখ্যানটা জীবন্ত। শোনাকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে বলার জগৎ, পড়ার কাজ, পাঠক থাকেন শ্রোতার মধ্যে। এখানে পাঠের রূপ সামূহিক। গ্রন্থাগারে বসে পড়া যায়, পড়া সেখানে স্বগত, মনে মনে। নৈশব্দ রক্ষা করা যে কোনো গ্রন্থাগারের বিধি। হাজারো লোক পড়ে অথচ কোনো আওয়াজ নেই। পড়ুয়ারা এখানে ব্যক্তি, তাদের পাঠ একান্ত, প্রত্যেকের পাঠের সঙ্গে অপরের অধ্যয়ন পৃথক। পদার্থের সঙ্গে, বইয়ের সঙ্গে পড়ুয়ার যোগ একক, নিঃসঙ্গ। অথচ পড়ার অন্য এক প্রেক্ষিত, অন্য এক আবহাওয়া থাকতে পারে।

রাসসুন্দরী দেবী ভীরু ও লাজুক। একদম ইচ্ছা নয় যে কেউ জানুক, তিনি পড়ছেন বা পড়ার চেষ্টা করছেন। অথচ সবাইয়ের চোখ এড়িয়ে যখন তিনি চুপিচুপি চৈতন্য-ভাগবতের পদার্থের পাতা ওলটাচ্ছেন, তখনও দৃ-একজন প্রতিবেশিনী তাঁকে ঘিরে বসে আছেন, শুনছেন।^{২৩} মহিলাদের জোট দৃ-সংবদ্ধ। তাঁর একান্ত পড়ার চেষ্টায় শরিক হচ্ছেন আরো দৃ-একজন। ‘সমজুটীদের’ কথা তিনি বার বার বলেছেন, না শুনলে, শরিক না থাকলে, পড়ার অর্থ, গান গাওয়ার মজা রাসসুন্দরী দেবীর কাছে কি মার খেত?

শরিকত্বের ধারণাটি গুরুত্বপূর্ণ। ইংরাজিতে সাক্ষরতা (Literacy)-র সঙ্গে সাহিত্য (Literature) জড়িত হয়ে পড়েছে। অথচ আমাদের কাছে সাহিত্যের ধারণা অন্যভাবে নিষ্পত্তি হয়েছে। কুন্তকের ভাষায় “সাহিত্যোভাবঃ সাহিত্যম্।” (সাহিত্যের ভাব=সাহিত্য)।^{২৪}

সাহিত্যে অর্থ যে দুইটি সহভাবে অবস্থিত। যে কোনো পদে শব্দ ও অর্থ যে প্রকারে সহভাবে অবস্থিত ঠিক সেইপ্রকার পাঠেও পড়া আর শোনা সহভাবে থাকতে বাধ্য, পদ বিন্যাসের লালিত্য, অর্থের গাভীর শব্দধ্বনির মধ্যে গ্রাহ্য হতে পারে। ‘সাহিত্যে’, সহভাবের চিস্তার মধ্যে নিহিত আছে পড়া ও শোনার যুগলবন্দী।

সাহিত্যে ‘রসকে’ ব্যাখ্যা করা হয়েছে ‘ধ্বনি’র বিশিষ্ট বিশ্লেষণ দ্বারা। ভারতীয় নন্দন-তত্ত্বের প্রসিদ্ধ গ্রন্থের নাম তো ধ্বন্যালোক। তাঁর ‘বাক্য-পদীয়ত্বে’ ভূত্বহরি ধ্বনি ও নাদ (আওয়াজ)-কে এক পর্যায়ের শব্দ হিসাবে প্রয়োগ করেছেন, ‘স্ফোটাত্মকশব্দ’ বা শব্দের অখণ্ড প্রতীতি কীভাবে ধ্বনি বা নাদের মধ্য দিয়ে অভিব্যক্ত হয়, সেই বিষয়ে বিশদ আলোচনা করেছেন।^{২৫} এবং এই স্ফোটাত্মকেই অন্যভাবে প্রসারিত করে আনন্দবর্ধন ও অভিনবগুপ্ত শব্দের ব্যঞ্জকত্বকে ‘ধ্বনি’ অভিধা দ্বারা ভূষিত করে রস তত্ত্ব গড়ে তুলেছেন, তাদের প্রস্থানের নাম হয়েছে ‘রসধ্বনি’ বা ‘ধ্বনি’।^{২৬} তাদের রসতত্ত্ব ধ্বনি অর্থ শব্দ নাদ বা আওয়াজ নয়; কিন্তু নাদ ব্যতিরেকে ‘রসতত্ত্ব’ গড়ে তোলা সম্ভব

নয়। কারণ আনন্দবর্ধন স্পষ্ট স্বীকার করেছেন যে আদি গুরু তো বৈয়াকরণিকরাই (‘প্রথমে হি বিম্বাসো বৈয়াকরণাঃ ব্যাকরণমূলত্বাৎ সর্ববিদ্যানাম্।’) ২৭

ফলে ভারতীয় নন্দনতত্ত্বে নাদ বা ধ্বনির বা আওয়াজের সঙ্গে রসের সহযোগ স্বীকৃত, বর্ণের ব্যঞ্জকত্ব নাদের মধ্য দিয়ে সিদ্ধ হয়।

ধ্বন্যালোকের ‘তৃতীয় উদ্যোতে’ আনন্দবর্ধন ও অভিনবগুপ্ত এই বিষয়ে স্পষ্ট সিদ্ধান্তের অনুসারী। ২৮ বিভাবাদির সংযোগেই রস নিষ্পত্তি হয়। কিন্তু কখন? বিশিষ্ট শ্রুতি শব্দের (বিশিষ্টশ্রুতিকশব্দ) সাহায্যে যদি বিভাবাদিরূপ অর্থের উপস্থাপন হয়, তবে রসের প্রতীতি সম্ভব হতে পারে। এতদূর যেতেও তারা স্বেচ্ছা করেননি যে পদহীন গীতধ্বনিতে অর্থের প্রতীতি নেই অথচ শ্রবণ মাধুর্যের জন্য রসের বোধ হয়। তাই শব্দ কণগ্রাহ্য হলে বর্ণ স্বভাবহেতু রসনিষ্পত্তিতে সহযোগী হয়। ‘শ্রোতএক গ্রাহ্যোর্থপি চ স্বভাবো রসনিস্যন্দে ব্যাপ্রিয়ত এব, অপদগীতধ্বনিবৎ।’ ২৯

শোনার মধ্যে রস আছে। রসসৃষ্টিতে বর্ণের দ্যোতনা শ্রবণগ্রাহ্যত্বের মধ্যে, শ্রুতি মাধুর্যের মধ্যে দিয়ে সম্ভব। বর্ণ তো ধ্বনির লৈখিকরূপ, বর্ণ উচ্চারিত হলে ধ্বনিতে ফিরে যাই। এবং রসধ্বনিতত্ত্বে এই বলা, পড়া, শোনা শু লেখার সাযুজ্য ‘ওঁচিতা’, তার অভাবে রসাভাস ঘটে। এই বোধকে কুন্তক সুন্দর ব্যাখ্যা করেছেন: “তস্যাং স্পর্ধিৎস্নে যাসাববাস্থিতিঃ পরস্পর সাম্যসুভগমবস্থানম্” অর্থাৎ প্রতিস্বন্দিতার সঙ্গে “পরস্পরের সাম্যে সুন্দর অবস্থান।” ৩০ নানা টানাপোড়েনের মধ্যে শব্দের সঙ্গে অর্থের, বলার সঙ্গে লেখার, লেখার সঙ্গে পড়ার, পড়ার সঙ্গে শোনার প্রতিস্বন্দিতা অথচ যোগপদ্য, এইরকম অবস্থিতি সাহিত্যপদবাচ্য। তখন শোনা হয়ে ওঠে জানা, উভয়ের উপলব্ধি এখন যুগপদভাবী। লেখা অধ্যয়ন করা যে জ্ঞানের একমাত্র পথ নয়, শব্দ লেখার মাধ্যমে জ্ঞান অভিযুক্ত হয় না বরং বলার সঙ্গে সঙ্গে ভাবনা দানা বাঁধে, জ্ঞানে অধিকার আসে— এই চিন্তার রেশ রবীন্দ্রনাথের জ্ঞানতত্ত্বেও আমরা পাই। ‘আশু মধুজ্যের’ অনুরোধে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সাহিত্য নিয়ে তিনি তিনদিন ধরে ‘বকেছিলেন’, তাঁর বক্তৃতায় কেতাদুরস্ত অধ্যাপকরা আদৌ খুঁশি হননি। তাদের বেজার হবার কারণ দেখাতে গিয়ে, লেখাপড়াভিত্তিক জ্ঞানতত্ত্বের বিপরীতে স্বকীয় সাহিত্যবোধ ও রসতত্ত্বকে কবি হাজির করেছিলেন। তাঁর নিজের জবানিতে, “আমি যা কিছু শিখেছি সে কেবল বলতে বলতে সাহিত্য সম্বন্ধে যে কি বলব আগেভাগে তা জানবার শক্তিই ছিল না। একটা অশ্ব ভরসা ছিল যে বলতে বলতেই বিষয় গড়ে উঠবে...ভেবে বলতে পারি না, বলতে বলতে ভাবি, মৌমাছির পাখা যেমন উড়তে গিয়ে গুণগুণ করে।” ৩১ কুন্তক, ভর্তৃহরির তা সেকালের লোক, রবীন্দ্রনাথ কিন্তু একালের।

অনস্বীকার্য যে পড়া আর শোনার সঙ্গে সাক্ষরতার সম্পর্ক আছে। অক্ষরজ্ঞান থাকলে নিজে পড়া যায় বা নিজে লেখা যায়। অক্ষরজ্ঞান না থাকলেও শব্দনতে কোনো অসুবিধা

নেই। রাসসুন্দরী দেবীর আত্মজীবনীতে লেখা, পড়া আর শোনার সম্পর্কে অক্ষর জ্ঞান ও অক্ষর লেখার অভ্যাসের সম্বন্ধ ধরা পড়ে। কিন্তু কেবল সেই অভিজ্ঞতার নিরিখে পাঠের জগতের সব কিছু বিচার করা মূর্খাকল।^{১৩২} প্রথমত, পাদ্রি ওয়ার্ডের প্রাগুক্ত সাক্ষ্য থেকে পরিষ্কার যে অষ্টাদশ শতকের শেষে ও উনিশ শতকের গোড়ায় বাংলার নিম্নকোটির লোকেরা নিজেরা পুঁরাণ পড়তে পারত ও পড়ত। তবুও তারা আসরে ব্রাহ্মণ পাঠককে নিয়োজিত করে পাঠ শুনত। কথকতার আসরে শ্রোতাদের সবাই নিরক্ষর, তার কোনো প্রমাণ নেই। দ্বিতীয়ত, পড়ার মধ্য দিয়ে যে অন্য অনুভূতি হয়, রবীন্দ্রনাথ সেটা জানতেন। ছেলেবেলায় গদ্যরীতিতে ছাপা ‘গীতগোবিন্দ’ থেকে তিনি পড়ে পড়ে জয়দেবের ছন্দকে আবিষ্কার করেছিলেন। বড় বয়সে তিনি বন্ধ ঘরে ‘সুদর করে করে’ মেঘদূতের আবৃত্তি করতেন, পড়ার আওয়াজ কানে শুনতেন, ধ্বনিমাধুর্যে মন ভরিয়ে তুলতেন।^{১৩৩} শব্দের ঝংকার, ধ্বনিমাধুর্য বঝতে গেলে আবৃত্তি করতে হবে, সুদর-লয় যোগে পড়তে হবে। নিরক্ষর ও সাক্ষর, উভয়ের ক্ষেত্রে সমরীতি প্রযোজ্য। তৃতীয়ত, শিক্ষার ক্ষেত্রে, শেখানোর ক্ষেত্রেও এই পড়া আবৃত্তি করা, ও শুনতে সবাই মিলে আবার আবৃত্তি করা, স্বীকৃত পদ্ধতি ছিল। পাঠে শিশু মনোমোহন বসুর শিক্ষানবিশি এইভাবে শুরুর হয়েছিল। চিন্তাকর্ষক বিবর্তিটি তোলা যাক,

“আমার বেস মনে পড়ে, আমার পঞ্চম বর্ষ বয়ঃক্রমের পূর্বে আমার বাটীস্থ গুরুমহাশয় আমাকে উলঙ্গ করিয়া আমার পরিধেয় ধুতিখানা আমার মস্তকে জড়াইয়া গাছ রামায়ণ গায়কের ন্যায় পাকড়ী বাঁধিয়া দিতেন। পাঠশালার সকল ছাত্রকে সারি দিয়া দাঁড় করাইয়া আমাকে ঘোষাইতে কহিতেন।” (নজরটান আমার)

‘এখনকার বাবুরা’ ঘোষানো কী তা, বুঝবে না। এই কথা মনোমোহন বসু জানতেন। তাই তিনি ব্যাখ্যা করেছেন যে নানা আরিজা (আর্ষা)

“এবং চাণক্য শ্লোক প্রভৃতি সুদর করিয়া এক নিঃশ্বাসের উপযুক্ত চরণভেদ করিয়া পড়াইত, তাবৎ বালক তদনুসরণে পড়িত।... অনেক প্রাচীন মহাশয়েরা আমোদ করিয়া শুনিতেন এবং গুরুমহাশয়ের আদেশে আমি যখন তাহা বালকদিগকে পড়াইতাম, তখন ভদ্রাভদ্র, শ্রীপদ্রুষ অনেকেই দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া শুনিতেন।” পাঠশালায় ‘ঘোষানোও’ একার নয়, অনেকের, শূদ্ধ ছাত্রদের নয়, পাড়া-প্রতিবেশীরও শ্রবণীয়। ঘোষানোর উদ্দেশ্য ধরা পড়ত সবার শেষে, সরস্বতীর বন্দনায়,

“গলায় গজমতি মুক্তার হার।

দেও মা সরস্বতী বিদ্যার ভার।”^{৩৪}

রস ও বিদ্যা সাধিত হয় ধ্বনি ও আওয়াজের মধ্যে, শোনা ও শোনানোর মাধ্যমে। পাঠের মাধ্যমে রসভুক্তি সামূহিক, লেখার ঐকান্তিক প্রাধান্য তখনো স্বীকৃত নয়! অবশ্য সেক্ষেত্রে লেখা নাকচ হলে যায়নি, হওয়া সম্ভবও নয়। কিন্তু পড়া আর শোনার অভিব্যক্তিরূপে লেখা গৃহীত হয়, পড়া আর শোনার যদুগলবন্দীতে লেখার অবস্থান। ‘সহিত’ এই ধারণা পরিব্যাপ্ত আছে সর্বত্র, শ্রবণগ্রাহ্যতা, শ্রুতিমধুরতাকে স্বীকার করে

সাহিত্যের অস্তিত্ব দানা বেঁধেছে। পাঠের এই সরণিতেই কথকের আবির্ভাব। এরকম একটা জগতে তারা হয়ে ওঠেন স্বরাট, মৰ্যাদা পান শিল্পীর।

খ. কথকের স্বরাজ্য

পাঠ নানারকমের আছে, কথকতা এক বিশেষ প্রকারের পাঠ। সূত, পাঠক, ব্যাস ইত্যাদির ধারণা পুরাণে আছে। বুদ্ধদেব বসু মহাশয় সূতের সঙ্গে কথকের ব্যঞ্জন খুব সুন্দরভাবে বিশ্লেষণ করেছেন সঞ্জয়ের স্বকীয় ও পৈতৃক বৃত্তি সূতের, তাঁর মুখে ধৃতরাষ্ট্র কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ শুনছেন। মহাভারতের কথক উগ্রশ্রবা, তিনিও সোঁতি। মূল ধারণা ‘বাহকের’, রথে চাড়িয়ে তিনি লোকদের স্থান থেকে স্থানান্তরে নিয়ে যান আর কাব্য আবৃত্তি করে কীর্তিকাহিনীকে, সূত দৌত্য কর্মও করে থাকেন। তা কেবল দুই রাজার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না; পুরাণ কথকের ভূমিকায় তাঁরা একের সঙ্গে অন্য বহুদলের যোজকও বটে।

বৃহদ্ধর্ম পুরাণে এই কথকতা ও পাঠ সম্পর্কে সুন্দর এক গল্প আছে। রামায়ণ লিখে আদি কবি বাল্মীকি রণে ভগ্ন দিলেন, ব্রহ্মার হাজার অনুরোধেও আর কলম ধরতে রাজি হলেন না। তিনি কৃতার্থ। অতএব মহাভারত লিখবেন বেদব্যাস, তাঁর কাছে বাল্মীকি ‘কাব্যবীজং সনাতনম্’ দিয়ে যাবেন। অষ্টাদশ মহাপুরাণ ও অষ্টাদশ উপপুরাণ লেখার প্রকল্পও তাঁর, কিন্তু তা শ্রোকে নিবদ্ধ হয়নি এবং সংক্ষিপ্ত।

সেইগুণি পুরাণ করার ভারও বর্তাল ব্যাসের উপর। এতে অনেক মূর্খি খাষি চটে গেলেন। তাঁরাও বা কম যান কীসে? নানা লোকের মধ্যস্থতার ফলে ঠিক হল যে সমস্ত শ্রোকে ব্যাস রচনা করবেন কিন্তু অন্যরা “কেহ লেখক, কেহ বক্তা, কেহ অর্থ নিরূপিত হইবেন” (লেখকোঃ কেহপি বক্তা চ কেহপি চার্থ নিরূপকঃ) বক্তা বা পাঠক নিছক যে কেউ নন, তিনিও কেউকেটা, মূর্খিবংশ জাত, ‘সনাতন কাব্যবীজ’-এর ভাগীদার তিনি, একটি পরম্পরায় স্থিত। পৌরাণিকোক্তম সূত নিজে বদরিকাশ্রমে ব্যাসের মুখে কথা শুনছেন, পাঠ নিয়েছেন তবেই তাঁর উপরে পুরাণবর্ণনার অধিকার দেওয়া হয়েছে। (ন্যস্তং পুরাণমমলং বক্তারমিতং সর্বতঃ) অতঃপর বদরিকাশ্রমে শিক্ষিত লোমহর্ষণ পুত্র মহাজ্ঞানী সূত উগ্রশ্রবা পুণ্যাত্মা মূর্খদের কাছে নৈমিষারণ্যে পুরাণ ব্যাখ্যা ও পাঠে রত হলেন কারণ সমুদয় স্বীপের মধ্যে জন্মস্বীপ প্রশস্ত, জন্মস্বীপের মধ্যে পবিত্র স্থান ভারত, আবার ভারতের সর্বোত্তম তীর্থ নৈমিষারণ্য।^{৩৫}

‘কাব্যবীজ’ এক জনের কাছ থেকে আরেকজনের কাছে যাচ্ছে, সবাই পবিত্র, কথক ও শ্রোতা উভয়ে, স্থানও পুণ্যময়। পুরাণ রচিত হয়েছে পাঠের জন্য। তার বিস্তৃত বিধিও তাঁর আছে। পুরাণ মাহাত্ম্যের বর্ণনার মধ্যে রীতি, লাভালাভ বেঁধে দেওয়া হয়েছে। পাঠের মধ্যে ব্যাখ্যা করার ক্ষমতা ও সুযোগ স্বীকৃত, প্রাকৃতজনের কাছে অর্থ বলে দেওয়ার দায়িত্ব পাঠকের (এতৎবাং কেহপি বক্তারঃ কেহপি শ্রোকার্থ কারকঃ।) পৌরাণিক মাহাত্ম্য গাথায় পরিষ্কার যে পুরাণ পাঠ সবাইয়ের জন্য, সবাই শুনবে,

পুৱাণ পাঠ করা হবে নানা ব্রত ও সামাজিক অনুষ্ঠানে। কোনো ব্রত বা কোনো সামাজিক অনুষ্ঠানে কোনো কোনো পুৱাণকাহিনী শ্রবণযোগ্য, তার বিস্তৃত বিধি আছে। সেই বিধি অনুসরণ করে সমন্বয়যোগীভাবে পুৱাণ ব্যাখ্যা করা ব্যাখ্যাতর কাজ। পুৱাণ হল সংহিতা, নানা জায়গা থেকে জোড়া দেওয়া সংগ্রহ, সকলে সেই সংগ্রহ চয়নে সাহায্য করেন। বলতে বলতে, শব্দে শব্দে পুৱাণ রূপ পায়। পুঁথি বদলে যায়; ৩৬ আদি কবি বাঙ্গালীক বেদব্যাসকে কাব্যবীজ দিয়ে যান, তিনি মূল শ্লোকও লেখেন। কিন্তু সেই সব শ্লোক পড়েন ও ব্যাখ্যা করেন অন্যরা, তাঁরাও হয়ে ওঠেন কবি (ব্যাসস্যানুগ্রহাদ্ যুগ্মং কবয়োহপি ভবিষ্যথ) ৩৭ পুৱাণ পাঠ ও শোনায় পুণ্যও আছে, কাব্যও আছে।

রচিত পুৱাণ সাম্প্রদায়িক; কিন্তু পাঠে ও শোনায় অধিকার সর্বজনীন। ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতিতে ব্রাত্যরা, দস্যু, শূদ্র, রমণী, গণিকা, সবাই পুৱাণ পাঠ শব্দে পুণ্য লাভ করছে, এই ধারণা নানা উপাখ্যানে বিবৃত হয়েছে। এক ধরনের পাঠের নাম পারায়ণ। “সঙ্কল্পপূর্বক ভাগবতাদি পুৱাণ আদ্যন্ত পাঠ হইলেই তাহাকে পারায়ণ বলে।” মূল গ্রন্থ পাঠ এই অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য; নিজস্ব ব্যাখ্যা, গান, যোজনা বা কাহিনী পুনর্বিব্যাখ্যাস পারায়ণের লক্ষ্য নয়। পারায়ণ পুরোপুরি পুণ্যলাভের অনুষ্ঠান, কঠোরবিধি শাসিত। যেমন, যিনি পাঠ দিবেন ও যাঁরা পাঠ করবেন, প্রত্যেককে হবিষ্যন্ন খেতে হবে। রাতে আহার নিষিদ্ধ, পাঠকালীন দিনগুলিতে মৈথুন পরিত্যাজ্য বিধিমনে বৈশাখ, অগ্রহায়ণ ও মাঘাদি পুণ্যমাসে পারায়ণ প্রশস্ত। ৩৮ পারায়ণ আরম্ভ হয় সকালে, দিবাকালে পাঠ সিদ্ধ।

পারায়ণে মূল ও সঠিক পুঁথিনিষ্ঠ হওয়া ও সঠিক উচ্চারণে পাঠ করা একান্ত আবশ্যিক। রামগতি ন্যায়রত্ন এই রীতির এক নিদর্শন দিয়েছেন। ৩৯ একজন ব্রাহ্মণ সঙ্কল্প করে রামায়ণ পাঠ করেন এবং ওই কাজের জন্য প্রায়শ্চিত্ত করেন। কারণ ‘গঙ্গাজল ও তুলসী’ হাতে নিয়ে তিনি “বাঙ্গালীকপ্রাপ্ত সমস্ত রামায়ণ পাঠ করিব, এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া—ছিলাম, পাঠক ও ধারকের কাছে সমুদায় তিনখান পুস্তক ছিল—ঐ তিন পুস্তকেরই স্থানে স্থানে পাঠের এরূপ ন্যূনাধিক্য ও বিপর্যয় যে, পরস্পরের কিছুমাত্র ঐক্য হয় নাই।... ঐ সকল পাঠের মধ্যে কোন পাঠ প্রকৃত, তাহার কিছুই বুদ্ধিবার যো নাই—হয়ত আমাদের সংগৃহীত তিন পুস্তকেই বাঙ্গালীক রচিত প্রকৃত পাঠের অনেক ন্যূনতা আছে,—তাহা হইলে আমি যে সঙ্কল্প করিয়াছিলাম, তাহার ভগ্ন হইয়াছে, সুতরাং তৎ প্রতীকারার্থ প্রায়শ্চিত্ত করা অবশ্য-কর্তব্য।”

পারায়ণ অনুষ্ঠানে মূল গ্রন্থকে হুবহু অনুসরণ করতে হবে, কোনোখানে কোনোভাবে ব্যত্যয় হলে চলবে না। পারায়ণের পরে হল ব্যাখ্যা সহযোগে পাঠ। ব্যাখ্যাতর ভূমিকা পাঠকের অপেক্ষা কিছুটা স্বতন্ত্র। পারায়ণে ব্রতী পাঠক ও সাধারণ কথকের মধ্যবর্তী স্তরে ব্যাখ্যাকারের অবস্থান। পশ্চিমপুৱাণে ব্যাখ্যাতার ভূমিকা নিয়ে বর্ণনা আছে, গল্পও আছে। ঘোর পাপী ছাড়া যে কেউ ব্যাখ্যাতা হতে পারেন। ধীর গতিতে পাঠের পরে প্রাপ্ত পাঠক বিচারপূর্বক আশ্বে আশ্বে ব্যাখ্যা করবেন। পড়ার

রীতিও বলা হয়েছে : শ্লোকগুণিলর অবয়ব ভাগ করবেন ও তার পরে অর্থ বলবেন। মূল গ্রন্থের প্রতি অনুগত থেকেও ‘দেশভেদে’ ব্যাখ্যাতার বলার ভাষাও আলাদা হবে। ব্যাখ্যা যে কোনো লোক যেভাবে খুশি দিতে পারেন কারণ পৌরাণিক ব্যাখ্যা হিত-সাধক হতে বাধ্য। সং ইচ্ছা থাকলে পৌরাণিক পাঠক হওয়া যায়। তবে তাতে যে বামেলা একেবারে নেই, এইরকম নয়। শ্রোতার বিপাকে ফেলতে পারেন। এই প্রসঙ্গে নানা গল্প বলা হয়েছে। গোতম বলে এক দুষ্ট ব্রাহ্মণ “প্রতোলীম্‌উপাস্থিতঃ” বা রাজ পথের মোড়ে এক মণ্ডপে ব্যাখ্যাকারের শ্লোক শুনে প্রশ্ন করেছিল কারণ তার মনে খটকা লেগেছিল। আবার রামের রাজসভায় বিজবর শম্ভু বলে ফেলেছিলেন যে রাবণ বধের পর রাম কুন্তকর্ণকে বধ করেছিলেন। রাম রেগে আগুন। ‘অন্যথা কথা’ বলে বিজ সভাস্থ লোককে নাস্তিক করে তুলেছে, অতএব দণ্ড বিধেয়। অবশেষে জাম্ববান উঠে ‘পদ্রাক্ষপীয়’ রামায়ণের কথা বলে রামের ক্রোধকে শান্ত করেন। পদ্রাণে আছে যে পাঠকের কাছে ‘ব্যাখ্যাসংগ্রহ’ থাকত, বৈমল্ল্য প্রশ্নের জবাব তাঁরা সেই ‘নোটবই’ থেকে দিতেন।^{১০}

অতএব পাঠের সঙ্গে অর্থ বলা ও বিবৃতি দেওয়া ব্যাখ্যাকারের কাজ। ভাষান্তর হচ্ছে, টীকা-ভাষ্য জোড়া হচ্ছে। এই সবই ব্যাখ্যাকারের কৃতি, তাঁর যোজনা। শ্লোক পরিবর্তন করার কোনো অধিকার তাঁর নেই কিন্তু পাঠের দিক নির্দেশে, অর্থের দ্যোতনা-সৃষ্টিতে তাঁর স্বকীয়তা স্বীকার্য। শ্রোতাও সেখানে সক্রিয়, তাঁর ব্যাখ্যাকে প্রশ্ন করতে সমর্থ। একটি স্তরে আদান-প্রদান পার্থক্য, আধিদৈবিক নয়।

অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতকে এই সব পাঠের আসরে দুয়েকটা পাম্বর্চরিত থাকত। ধারকের নাম পারারণ বা ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে পাই। তৎকালীন একটি অভিধান অনুযায়ী, ধারকের অর্থ হল “পদ্রাণ পদ্রাক্ষ ধরিয়া যে পদ্রাণ পাঠকের প্রমাদাদি অপনীত করে।^{১১} শ্রাবক বা প্রধান শ্রোতাও নির্বাচিত হতেন, পাঠের আসরে তিনি নিয়মিত হাজিরা দিতেন কারণ উপযুক্ত শ্রোতা না থাকলে তো আসরের উদ্দেশ্য ব্যর্থ। এই পাঠের আসরে কথকদের আবির্ভাব পাম্বর্চরিতরূপে। সাধারণের কাছে সহজে পাঠককে বুদ্ধিয়ে দেওয়া তাঁদের কাজ। তাঁরা পাঠের বা ব্যাখ্যার পরে আসরে উঠতেন। দিনমানে পাঠ ও ব্যাখ্যা এবং সন্ধ্যার ঠিক সেই পাঠের অনুসরণে কথক ঠাকুরের সরল বর্ণনা চলত। আসরে কথকরা সহযোগী। কিন্তু ক্রমে ক্রমে উনবিংশ শতকের গোড়ায় কথকরা পাঠের জগতে হয়ে উঠলেন স্বরাট, এক বিশেষ রীতির প্রবক্তা।

এখন ব্যাখ্যাকারকেও কথক ঠাকুর ছাপিয়ে গেলেন। তিনি দেওয়া পুঁথি পড়েন না, পদ্রাণ ও কাব্যের বিন্যাসকে পদ্রাবিন্যাস করে নিজে পুঁথি তৈরি করেন, নিজের লেখা পুঁথিটা পড়েন। রামগতি ন্যায়রত্ন কথকের লক্ষণ ব্যাখ্যা করেছেন প্রাগুক্ত উক্তি “কথকেরা উপাখ্যান ভাগের বৈচিত্র-সম্পাদনার্থ নানা পদ্রাণের একত্র সম্বন্ধ করিয়া থাকেন।” নানা আখ্যানের মিশেলে একটি নতুন “কথা” বা পালা তৈরি করা কথকের অধিতারভুক্ত। মাঝে মাঝে গীত গাওয়া হয়, বর্ণনার জন্য “সাঁট” বা “চুর্ণী” তৈরি

করা হয়। প্রাকৃতজনের কাছে ধর্মকথা বলতে গিয়ে পারায়ণের নিগড় থেকে তাঁরা মুক্ত হয়েছিলেন। তখন দোভাষীরা, অনুবাদকরা হয়ে উঠলেন শিল্পী।

পারায়ণে আছে নিছক ধর্মের শ্রুতি। কথকতায় লোকশিক্ষা, ধর্মশিক্ষার সঙ্গে মিলেছে সাহিত্য ও কাব্যবোধ। পদ্মরাগধৃত রক্ষণশীল নীতিবোধের সঙ্গে কল্পনা মেশে, তৈরি করা হয় নানা রসের গল্প। পদ্মপদ্মরাণের সম্পাদক ভট্টপল্লীর চরম রক্ষণশীল পণ্ডিত পণ্ডানন তর্করত্ন একবাক্যে বলেছেন, “কাব্যোৎকরণাশ্বেষী কবি, থিয়েটার বা যাত্রাদলের অধ্যক্ষ ও ধর্মপ্রচারক কথক প্রভৃতি সকলেই এই স্বর্ণখণ্ড পাঠে প্রভূত উপকার লাভ করিবেন।”^{১৪২}

ধর্মবস্তা ও কবির সহাবস্থান কুস্তকের তত্ত্বে থাকায় অসুবিধা নেই। কাব্য “সুকুমার ক্রমোদিতঃ” “সুকুমার পরিপাট্যরূপে কথিত”, তাই তার দ্বারা সহজে চতুর্বর্গের কথা বলা যায়, লোকশিক্ষা সহজসাধ্য হয়। কিন্তু ‘চতুর্বর্গফলাশ্রয়’ অতিক্রম করেও সাহিত্য ‘রসানিস্যন্দী’ সেখানে সাহিত্যের প্রধান জোর।^{১৪৩}

আমাদের পড়া গল্পেও দেখেছি পৌরাণিকরা সবাই কবি হতে চেয়েছিলেন, নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করেছিলেন, মহাকাব্য রচনা করার ইচ্ছা তাঁদের ছিল। তাঁদের দাবি পদ্মোপদ্রি মানা হয়নি, বাঙালীর প্রসাদে ব্যাস ‘সনাতন কাব্যবীজের’ সম্প্রদায় পেয়ে মহাকাব্য ও পদ্মরাগ লেখেন, তাঁর প্রসাদেও পরম্পরায় কথকরা রচনা করেন তাঁদের আখ্যান, বসেন তাঁরা ব্যাসের আসনে। ধর্মপ্রবক্তাদের হাতে চলে আসে রসের ভাণ্ডার। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দৌলতে আমরা জানি যে পদ্মথির পাতা পুড়ে গেলে বটতলায় কিরপানাথ নতুন পদ্মথি তল্লাস করতে যান। তাতে চটেমটে ‘পাকা কথক’ চাঁইবুড়ো বলে উঠেছিলেন “মারুতির পদ্মথি ছাপা হয় নাই বাপ, বাজারে পাবে রামানন্দী রামায়ণ, দাম চারিটাকা।” তখন ‘দোতকলম’ নিয়ে বুড়ো নিজেই পদ্মথি ঠিক করতে বসলেন, শোধান করার দায়িত্ব তাঁর, পদ্মথিটা তো এ কার্যে তাঁর নিজের।^{১৪৪}

□ পর্ব / ২ □

কথকের জন্ম : পাঠ থেকে ‘কথা’

বাংলাদেশে উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে কথকদের বোলবোলা ছিল বলেই মনে হয়। ‘সুরধনু’ কাব্যে গঙ্গা-প্রবাহের যাত্রাপথের সঙ্গে সঙ্গে দীনবন্ধু মিত্র বিখ্যাত জায়গা ও তাদের খ্যাতির কারণ বলছেন। তাঁর মতে, বাঁশবেড়িয়া (বংশবাটি) বা ভাট পাড়ার খ্যাতির পিছনে আছেন গ্রীধর কথক বা রামধন ‘কথকরতন’।^{১৫} অপরপক্ষে তর্কযুদ্ধে অবতীর্ণ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রতিপক্ষদের জন্ম করতে কৃষ্ণহরি শিরোমণি নামে কথক চুড়ামণি সম্পর্কে চালু লোকগল্পকে মোক্ষম অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করেছিলেন।^{১৬} গোড়দেশ-খ্যাত কথকদের জন্ম ও কৃতি এই সময়কালে আবদ্ধ।

‘বাগ্‌জীবন’ বা কথোপজীবীরা মানুষজনকে আনন্দ দিয়ে দুই পয়সা কামাই করে এবং সেইজন্য কর দিতে তারা বাধ্য, কোর্টিল্য সেইদিকে সজাগ দৃষ্টি কতকাল আগেই রেখেছিলেন।^{১৩} তবে উনিশ শতকে প্রচলিত দেশজ রীতিতে পদার্থ তৈরি করে পৌরাণিক আখ্যান বলার চল অষ্টাদশ শতকের আগে চালু ছিল বলে মনে হয় না।^{১৪} উনিশ শতকের প্রারম্ভে ওয়ার্ড সাহেবের বর্ণনায় স্পষ্ট যে, সেকালে মূল গ্রন্থ, পাঠ বা পারায়ণ হত। বিকলে সাধারণের জন্য বাংলায় মূল গ্রন্থের অনুবাদ ও ব্যাখ্যা করতেন যারা ‘কথক’ বলা হত তাঁদেরই।^{১৫} সংস্কৃত ও বাংলা, দুই ভাষার দুই গোত্রের পড়ুয়া : পাঠক ও কথক। উনিবিংশ শতকের গোড়াতে জয়নারায়ণ ঘোষাল তাঁর ‘করুণা নিধান বিলাসে’ (১৮১১) পাঁচালি, রামায়ণ, তরঙ্গা ইত্যাদি অবসর বিনোদনের নানা অনুষ্ঠানের তালিকাতেও কথকতাকে স্থান দিয়েছিলেন।^{১৬} লোকগ্রন্থ জনশ্রুতি অনুসারে প্রতিযোগিতার চাপে ভাগবত পাঠকে চিত্তাকর্ষক করতে বাঁকুড়ার সোনামুখীর গদাধর শিরোমণি বঙ্গদেশে কথকতার ঢঙ চালু করেন। অন্ততঃ-পক্ষে বাংলা সাহিত্যের আদি ইতিহাসের চিহ্ন বইগুলিতে এই কথা বার বার লেখা হয়েছে।

“বৈকালে শিরোমণি মহাশয় বেদীতে বসিয়া ভাগবতের কোন কোন স্থান ব্যাখ্যা করিতেন। তিনি উত্তম ব্যাখ্যাতা ছিলেন। অন্যান্য স্থানে তাঁহার ব্যাখ্যা শ্রুতিতে বিস্তর লোক উপস্থিত হইত। কিন্তু ঐ স্থানে অধিক শ্রোতা আসিতেছে না দেখিয়া শিরোমণি মহাশয় তাঁহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। শ্রুতিলেন, নিকটে একস্থানে রামায়ণ গান হইতেছে। শিরোমণি মহাশয় বলিলেন ‘আচ্ছা, সকলকে বলিবে কল্য হইতে আমার নিকট ভাগবত গান শ্রুতিতে পাইবে’। তিনি যেমন সঙ্গীত তেমনি গায়ক ও কবি ছিলেন। রাত্রিতে পরদিনের ব্যাখ্যায় অংশকে তাঁহার স্বকপোল উদ্ভাবিত কথকতার রীতিতে পরিণত করিয়া রাখিলেন। পরদিন বৈকালে নতুনরীতির কথকতা আরম্ভ করিলেন; চারিদিক হইতে লোক ভাঙ্গিয়া পড়িল। তাঁহার স্বরসংযোগ, বাক্যবিন্যাস, ব্যাখ্যা ও সংগীত পদাবলী শ্রুতিনীয়া লোকে বিস্মিত ও মোহিত হইল। এইরূপে শিরোমণি মহাশয় প্রতিদিন ধুবচরির, প্রহ্লাদ-চরিত্র, দক্ষযজ্ঞ, বামনভিক্ষা প্রভৃতি শ্রীমদ্ভাগবতের অংশ সকল ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। ইহাই কথকতার প্রথম সৃষ্টি”।^{১৭}

প্রচলিত এই কাহিনীর সত্য-মিথ্যা নিরূপণ করা শক্ত। কিন্তু গ্রন্থ পাঠের ব্যাখ্যাংশ গীত ও গল্প সংযোগে পুনর্কথনই যে কথকতা এই ধারণা স্পষ্ট। গ্রন্থের পাঠ এই প্রক্রিয়ায় রূপান্তরিত হচ্ছে। ওয়ার্ডের সাক্ষ্যও অনুরূপ ধারণাকে সমর্থন করে। পরে দেখব পদার্থ প্রকরণ বিচারও একই ধরনের সিদ্ধান্তের অনুযায়ী। নির্দিষ্ট স্থান ও পাত্র নিয়ে অবশ্য বিতর্কের স্বেচ্ছা থেকে যাবে। স্থানমাহাত্ম্যের ক্ষেত্রে স্মর্তব্য যে পশ্চিমবঙ্গে আজও পেশাদার কথকদের অন্যতম প্রবীণের বাসস্থান হল বাঁকুড়ার সোনামুখী।

উনিশ শতকের প্রথমার্ধের নামকরা কথক শ্রীধর ও রামধন শিরোমণি। তাঁদের জীবনীর তথ্য বিচার করলে কথক তাঁর হবার একটা ছক পাওয়া যায়। জীবনীগুলি মৃত্যুর পর লিখিত, পারিবারিক আত্মীয়দের কাছ থেকে সরেজমিন তদন্তে সংগৃহীত। ব্যক্তি বিশেষে তথ্যের হেরফের হতে পারে কিন্তু উনিশ শতকের আদর্শ কথক চরিত্র গড়ে তোলার ক্ষেত্রে সংগৃহীত সাক্ষ্যগুলির ঐতিহাসিক তাৎপর্য অনস্বীকার্য।

১২২৩ সনে বাঁশবেড়িয়াতে এক পণ্ডিত বংশে শ্রীধরের জন্ম। বংশে কথকতা বা ভাগবত পাঠের ধারা ছিল। পিতা রতনকৃষ্ণ শিরোমণি সংস্কৃত চর্চা করতেন। তবে পিতামহ লালচাঁদ শিরোমণি ছিলেন কথক। ছেলেবেলা থেকে শ্রীধর ভাগবত পাঠে দীক্ষা পেয়েছিলেন হুগলির মালিপাড়া গ্রামের রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের কাছে। শ্রীধরের দ্রাতৃপুত্র শ্রীযুক্ত অতুল্যচরণ ভট্টাচার্য ও কথকতাকে পেশা হিসাবে নিয়েছিলেন। অতএব পরম্পরা ছিল, বংশের আবহাওয়ায় শ্রীধর শিক্ষিত হয়েছিলেন। কিন্তু এই পাঠের ঘরাণায় শ্রীধর পাঁচালি গানে মেতে উঠলেন। ঘরানার প্রতিভা জ্যেষ্ঠতাত জীবনকৃষ্ণ শিরোমণি আদৌ তা পছন্দ করলেন না। বিবাদ দেখা দিল। বহরমপুরে শ্রীধর ব্যবসায়ে দু-পয়সা উপার্জনের চেষ্টা করলেন। সেইখানেই তিনি কথক কালীচরণ ভট্টাচার্যের কাছে তালিম নিলেন। তালিম প্রধানত অভিনয়ের, মৃদুভক্তিগমার। জীবনীকারের ভাষায় :

“কথকতা নাট্য ভাবরসাদির অভিব্যক্তি। কোন অবস্থায় মানুষের কিভাবে হইয়া থাকে, কথকতার অঙ্গভঙ্গে বা বাক্যরঙ্গে তাহা বিকশিত করিতে হয়। কথকতা শিক্ষার কালে শ্রীধর কখনো কোন বালকের হাতে সন্দেশ দিয়া কাড়িয়া লইতেন, আর দুইটি বিশাল চক্ষুর অন্তর্দৃষ্টিতে বালকের ও তখনকার সেভাব তুলিয়া লইতেন। আবার কখন বা বৃদ্ধের দন্তহীন মুখের কথার ভাব গ্রহণের জন্য কোন বৃদ্ধের সঙ্গে কথা কহিয়া, নির্নিমেষে তাঁহার রসনার গতিপ্রকৃতি পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্যালোচনা করিতেন। সর্ববিধ ভাবাভিব্যক্তির বিকাশ সাধনায় তাহার এমনই সাধনা ছিল। তাই তিনি আদর্শ কথক হইয়াছিলেন।”

বর্ণনায় পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, শ্রীধর কথকতার রীতিতে ভাবাভিনয় যোগ করেন, সুদূরতালে গীত বসান। পাঠ্য কাহিনীর চরিত্রানুযায়ী অভিব্যক্তি ফুটিয়ে তোলায় তিনি দক্ষ ছিলেন। নানা বিষয়ে গান লিখেছিলেন। দারুণ জনপ্রিয় হয়েছিল তাঁর গান, নানা লোকের নামে গানগুলো চলে আসে। কথকতার জন্য বিশেষভাবে পদাবলীও লেখেন। আদর্শ কথক গান গাইবেন ও অভিব্যক্তি অনুযায়ী অভিনয় করবেন, তা প্রত্যাশিত। পাঠ থেকে উনিশ শতকীয় কথকতার রূপান্তরের দুটি সূত্র এইভাবে পরিস্ফুট হল।

শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্নের পিতা রামধনের জীবনী প্রসঙ্গে আমরা আরেকটু বেশি খবর পাই।^{১০} উনিশ শতকের প্রথমার্ধে তাঁর জন্ম, চব্বিশ পরগণার বারাসত মহকুমায় অবস্থিত খাঁটুরার

লক্ষপ্রতিষ্ঠ বড় বাড়িতে রামপ্রাণ বিদ্যাবাচস্পতির তৃতীয় পুত্র রামধন তর্কবাগীশ। রামচন্দ্র ন্যায়বাচস্পতির টোলে কৃতি ছাত্র ছিলেন রামধন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাদের আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে বেশ পসার হয়েছিল অথচ রামধনের অবস্থা অনূরূপ ছিল না। শিক্ষক রামরুদ্রের পরামর্শে স্দুকণ্ঠী ও পণ্ডিত রামধন কথকতাকে পেশা হিসাবে বেছে নেন, কারণ 'ইহাতে বিলক্ষণ দুই পয়সা উপার্জনের সম্ভাবনা আছে।' পণ্ডিতবংশে তিনিই প্রথম কথক কারণ জ্যেষ্ঠ রামরতন স্দুকণ্ঠী ও বাম্মী হওয়া সত্ত্বেও কথকতাকে পেশা হিসাবে গ্রহণ করেননি।

কথকতার রীতিতে রামধনও পরিবর্তনের কথা ভেবেছিলেন। ১৮ বছর বয়স থেকে পেশায় নামবার কথা তাঁর মাথায় ঢুকেছিল। কিন্তু প্রতিযোগিতা জোরদার, কৃষ্ণহরি ও গদাধরের রীতিকে টেক্ষা দিতে হবে, শূদ্ধ মিশ্রিট গলার জোরে পার পাওয়া যাবে না। প্রথমে তিনি ভাগবতীয় পণ্ডিতের কাছে পুঁরাণাদি পাঠ করে ভাগবতের গল্পকে নিজে সাজান এবং নিজস্ব বর্ণনা বা সাট বা চুণী তৈরি করেন। কথকতার রীতিতে আখ্যানের টানে অনুপ্রাসবহুল বর্ণনার টুকরো টুকরো ছক জুড়ে দিলেন।

এরপরে তিনি সংগীতে পারদর্শী চাকম্বীপের (চাকদহ) নিকটবর্তী নারায়ণপুর গ্রামের পণ্ডিত ব্রাহ্মণ ভ্রাতৃবয় রাম-শ্যামের সঙ্গে পরামর্শ করেন ও তাঁদের মতামত চান এবং তাঁরা 'রামধনের স্বরচিত ভাগবত ও চুনি'কা শুনিয়ে মোহিত হইল'।

তাঁদের উপদেশমতো রামধন কথকতার রীতিতে দ্বিতীয় অভিযোজন করলেন। শিমূলিয়ার কাঁসারিপাড়ার রাধানাথ দত্তের আনুকূল্যে একজন হিন্দুস্তানি গায়কের কাছে দুই বৎসর সংগীত শিক্ষা করেন ও রাগ-রাগিনী-সহ কথকতার আখ্যানে 'মহাজনী পদাবলী' যুক্ত করেন। এটা রামধনের 'প্রণালী' যাকে উনিশ শতকের মধ্যবর্তী সময়ে 'অভূত সৃষ্টি' বলা হয়েছিল। মনে হয় যে ভাগবত থেকে কথকতার জন্য নির্দিষ্ট আখ্যান বাছা ও লেখা এবং সেই কাহিনীর মাঝে মাঝে পরিমার্জিত অনুযায়ী নির্দিষ্ট গানের বিন্যাসের রীতি রামধনের হাতে পূর্ণ পরিণতি লাভ করেছিল। রামধনের কথকতার এই ধারা তাঁদের পরিবারের কেউ কেউ অনুসরণ করেছিলেন। লোকশ্রুতি অনুসারে কথকতায় উমাকান্তের সহজাত ক্ষমতা ছিল। কিন্তু মাত্র ৩৫ বৎসর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়। ভ্রাতৃপুত্র ধরণীধর শিরোমণি (১৮১৩-১৮৭৫) কথকতা করতেন। ধরণীধরের পসারের সীমা ছিল না, লক্ষাধিক টাকা আয় করেছিলেন, বর্ধমান রাজসভার কথক ছিলেন তিনি। আবার বঙ্কিমচন্দ্রের বাবা যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বাড়িতেও তিনি ডাক পেতেন। ধরণীধরের গলা সুৱেলা ও পাঠে দক্ষতা ছিল অসাধারণ কিন্তু 'বিদ্যাসাধা' সেরকম ছিল না, নিষ্ঠাও পিতৃব্যতুল্য নয়। নতুনত্বের জন্য রামধনের পদাবলী বা সাট নানা লোকে ব্যবহার করত। কিন্তু ধরণীধরের রচনায় সেইরকম কোনো অভিনবত্ব ছিল না। চরিত্রদোষও নাকি ছিল। কিন্তু কথকতার অতুলনীয় গলাতেই তিনি আসন্ন মাত করতেন। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর স্মৃতিতে সেই ছবি ধরা পড়েছে।

“ধরণী কথক মহাশয় খুব ভালো কথা কহিতেন তাঁহার সৃষ্টিগুণ অথচ গম্ভীর উচ্চ স্বরে প্রথম হইতেই আসর গম গম করিত। কিন্তু তিনি যখন হাঁ করিয়া গালের কাছে হাত আনিয়া গান ধরিতেন, তখন সমস্ত লোক মূগ্ধ হইয়া যাইত। আমরা তখন গানের কি বদ্বি? কিন্তু এখনো সে সুর কানে লাগিয়া আছে” ১০।

চুর্ণী বা সাট তৈরি, গান রচনা, দক্ষতা ইত্যাদি নানা প্রকরণে রামধনী রীতি ও শৈলী গড়ে ওঠে।

ধরণীধর শিষ্য-প্রশিষ্য সৃষ্টি করেন। বোঁক ছিল ভাগবতী কাহিনীতে। অপরপক্ষে রাঢ় অঞ্চলে গদাধরী রীতি চালু ছিল। জোর দেওয়া হয়েছিল রামায়ণী কথকতায়। অন্যান্য অঞ্চলেও কথকতার নিজস্ব রীতি গড়ে উঠেছিল। যেমন কথকতার শিক্ষকরূপে উদ্ধব চুড়ামণির নামডাক ছিল। হাওড়ার বাগনান বা হুগলির ধনিয়াখালিতে তাঁর জন্ম হয়। হাটখোলার ভৈরবচন্দ্র বিদ্যালঙ্কারের টোলে তিনি পড়েন এবং পণ্ডিত রঘুনাথ শিরোমণির কাছে পাঠের শিক্ষা নেন। চন্দননগরে রঘুনাথ শিরোমণির টোল ছিল। প্রথম জীবনে রঘুনাথ গুণ্ডিয়াতে ও বরানগরে ব্যাকরণ পড়াতেন। পরে গোন্দলপাড়া নিবাসী গোপালচন্দ্র মুনোপাধ্যায় মহাশয়ের মাতার আগ্রহে চন্দননগরে বাস করতে শুরু করেন। দক্ষিণেশ্বরে তাঁর কথকতার আসর বসত। উদ্ধব চুড়ামণি তাঁর শ্রেষ্ঠ ছাত্র। এই উদ্ধব ঠাকুরেরই ছাত্র মহানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়। ১৩২০ সালে উদ্ধবের মৃত্যু হয়। রঘুনাথ শিরোমণির পুত্র রামনাথ চট্টোপাধ্যায়ও যশস্বী কথক ছিলেন। ১৩৩১ সালে তিনি জীবিত, চন্দননগরে বাস করেছেন এবং হুগলির অগ্রগণ্য কথক। সঙ্গে সঙ্গে টুপা গেয়েও তিনি আসর জমাতেন। ১১

পূর্ববঙ্গের কথকদের মধ্যে কৃষ্ণকান্ত পাঠকের বেশ নামডাক ছিল। ১২২৮ বঙ্গাব্দে ফরিদপুর জেলার কাসাভোগে তাঁর জন্ম ও ১২৯৮ বঙ্গাব্দে মৃত্যু হয়। ৭০ বৎসর বয়স পর্যন্ত তিনি গান তৈরি করেছিলেন ও দাপটে গান গাইতেন। ঢাকা জেলার বিক্রমপুর ফরশাইল বা ফুল্লশালী গ্রামের কালাচাঁদ বিদ্যালঙ্কারের খ্যাতি ছিল অভিনব আখ্যান ও শ্লোক ব্যাখ্যায়। ভাগবতের কাহিনীর তাক লাগানো ব্যাখ্যা করতেন তিনি। অঞ্চলে ‘কিশোরী ভজন’ সম্প্রদায়ও তিনি প্রতিষ্ঠা করেন, ভক্তরা তাঁর নিজস্ব পাঠ ও ব্যাখ্যাকে মান্য করত। উনিশ শতকে কথক হিসাবে ধর্মসম্প্রদায় তৈরি করার কৃতিত্ব তাঁর। ১২

কথকদের রাজত্বে পূর্ববঙ্গেরই আধিপত্য ছিল। দ্বারকানাথের আমলে ঠাকুরবাড়িতে নিয়মিত একজন বৈষ্ণবী ঠাকুরাণী আসিতেন। এ প্রসঙ্গে স্বর্ণকুমারী দেবীর সাক্ষ্য:

“সংস্কৃত বিদ্যায় ইহার যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি ছিল অতএব বাঙালা ভাষা জানিতেন ইহা বলা বাহুল্য। উপরন্তু ইহার চমৎকার বর্ণনাশক্তি ছিল, কথকতা-ক্ষমতায় ইনি সকলকে মোহিত করিতেন। যাঁহাদের বিদ্যালভের ইচ্ছা নাও বা

থাকিত, তাঁহারাও বৈষ্ণবী ঠাকুরাণীর দেবদেবী বর্ণনা, প্রভাত বর্ণনা, শুনিতেন কুতূহলী হইয়া পাঠগৃহে সমাগত হইতেন।”^{১২২} ক

বৈষ্ণবী ঠাকুরাণী অন্তঃপুরে বৈঠকী কথকতা করতেন। বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ও বিপিন পালের লেখা থেকে জানা যায় যে বৃন্দাবনে একজন বাঙালি মহিলা আসরে ভাগবত পাঠ করতেন। তাঁর ব্যাখ্যা ও পাঠ শুনতে জনসমাগমও হত। বিংশ শতকের গোড়ায় হাওড়ার আমতা অঞ্চলের রামচন্দ্রপুর গ্রামে কলকাতা থেকে একজন পেশাদার গায়িকা এসে কয়েকদিন ধরে ভাগবত পাঠ করেছিলেন।^{১২৩} কিন্তু পুরুষ কথকদের নাম জানলেও মহিলা কথক ও পাঠকদের নাম ধাম কোনো কিছুরই জানা যায় না। সভায় পেশাদার মহিলা কথক হিসাবে এই শতকে চন্দননগরের ক্ষান্তিলতা দেবীই বোধ হয় প্রথম। পরে কোমলগরের বাসন্তী দেবী, কৃষ্ণ বকসী প্রমুখ বিদূষী মহিলারা আসরে পাঠ ও কথকতা করে সুনাম অর্জন করেছেন। কথকতার পরিবার ও পরম্পরার কথা ঘুরে ফিরে আসছে। দেখা যায় যে কথকতার রবরবার যুগে কথকতার শিক্ষক হিসাবে কয়েকজন নাম করেছেন। অধিকাংশই ব্রাহ্মণ, পরন্তু কথকতা বৈষ্ণবদের একচেটিয়া। শাস্ত্র সাধনার দ্বারা পেশাদার কথক হিসাবে কাউকে দেখা যাচ্ছে না।^{১২৪} ডাকসাইটে কথকদের সবাই পণ্ডিত, সংস্কৃতে কিছু না কিছু অধিকার সকলেরই আছে। তবে সংখ্যায় অল্প হলেও কিন্তু অন্য ধরনের কিছু কথকেরও উল্লেখ পাওয়া যায়। অষ্টাদশ শতকে মেদিনীপুরের হরিহরপুর গ্রামে ভরস্বাজ গোত্রের দে বংশীয় কায়স্থ ছিলেন দুঃখী শ্যামদাস। সংস্কৃত জানতেন না। ভাগবতের পাঠ শুনেন নিজেই পাঠ ও গাইবার উদ্দেশ্যে “গোবিন্দ মঙ্গল” কাব্য লেখেন এবং সেই গ্রন্থটি তাঁর পরিবারে পুজিত হয়। পাঠক ও গায়ক হিসাবে তাঁরা গুরুবংশ, অধিকারী পদে সম্বোধিত। শিষ্যরা প্রায়শই নিম্নবর্ণের। গ্রামে গ্রামে ঘুরে গ্রন্থ পাঠ করা শ্যামদাসের (আমৃত্যু ১৭৮৩) জীবিকা ছিল, গেল গ্রন্থের আখ্যান তাঁরই সৃষ্টি।^{১২৫}

আধুনিককালে শান্তিনিকেতনের ভুবনডাঙা নিবাসী অবনী অধিকারী অনুরূপ আরেকটি চরিত্র। জাতে শূদ্র, আদি নিবাস বীরভূমের থানা মেজিয়া, গ্রাম রাইডিহ। পূর্বপুরুষ রামদুর্লভ অধিকারী ও মাঘারাম অধিকারী রামায়ণ গান গাইতেন, নিজেদের দল ছিল। তিনি নিজে পড়েছেন অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত। পরে গানের দলে পাচকের কাজ করেন, সঙ্গে সঙ্গে বাজনা বাজাতে শিখলেন। দাদা কানাই অধিকারী প্রধান গুরু, তাঁর কাছ থেকে পালা তৈরি করার কায়দা অবনী আয়ত্ত করেন।^{১২৬} শ্যামদাস ভাগবতী গাইতেন। অবনী গান রামায়ণী।

কিন্তু শ্যামদাস বা অবনীর পরম্পরাতে ও পরিবারগত শিক্ষানবিশির চিহ্ন আছে। অবশ্য একক প্রচেষ্টাতে কথক হয়ে ওঠার নিদর্শন পাওয়া যায়। শিবপুরের লক্ষ্মপ্রতিষ্ঠ মুনসেফ বসন্ত কুমার পাল-এর বিশেষ পরিচিত ছিলেন রাণাঘাটের মাঝের গ্রামের বাসিন্দা উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য। গলা খুব ভাল, গান গাইতেন। হাইকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত জজ রমেশবাবুর [সেনের ?] আনন্দেরূপে তার ভাই পাথোয়ারজবাদক কেশববাবুর কাছে

সঙ্গীতে কিছুটা শিক্ষা নেন। পরে কথকতা করাটাই পেশা হিসাবে বেছে নেন। রমেশবাবুর সুপারিশে প্রেসিডেন্সি কলেজের নীলমণি পাণ্ডেবের কাছে কিছুটা সংস্কৃতও শেখেন। ভাল কথক হবার অন্যতম প্রাকশর্ত ভাল সংস্কৃত জানা। ১৮৯৫ সন নাগাদ ঢাকায় তিনি বসন্তবাবুর পরিবারে আশ্রয় নেন এবং নতুন পেশায় হাতে-কলমে নেমে পড়েন। ঢাকার উকিল ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষ দুষ্টিনায় বিপর্যস্ত, তাঁদের বাড়িতেই আসর বসানোর বন্দোবস্ত হল। বসন্তবাবুর তত্ত্বাবধানে ও উৎসাহে উপেন্দ্রনাথ কথক হিসাবে জীবন শুরু করলেন।^{১৬}

“সংস্কৃতে খুব বড় পাণ্ডিত না হোলেও গলাটি ছিল অতি মধুর, তাই যত সময়োচিত গান বেশী হয়, তার জন্যে আমি তাঁকে অনুরোধ করি, কারণ তাহাতেই লোক বেশী আকৃষ্ট হবে।

“আমি তখন বেকার বসে থাকি—সমস্ত দুপুরবেলা কথক মহাশয়ের রিহারসেল দেওয়া—কথকতার মহলা শুনতাম, আর যেখানে পরিবর্তন করলে ভাল মনে লাগত তা তাঁকে বলে দিতাম। সন্ধ্যা থেকে আরম্ভ হয়ে ৩/৪ ঘণ্টা পাঠ হতো সহরের গণ্যমান্য প্রায় সকলেই আসতেন, স্বামীজীও এসে বসতেন। চির প্রথমত দুই চারটি সংস্কৃত পদাবলী না গাইলে নয়, প্রচুর বাংলা গান, এমনকি আধুনিক গানও সময়মত লাগিয়ে দিতেন তাতে সকলের আরো মনোরঞ্জন করতেন। একমাস সেখানে কথকতা হয়েছিল সকলেই বেশ খুশী হয়েছিলেন ব্রাহ্মণের প্রাপ্তিও আশাতীত হয়।”

উপেনী কথকতা স্পষ্টতই পরম্পরা বিহীন, রামধনী বা গদাধরের রীতির সঙ্গে বড় একটা মিল নেই। কিন্তু জমাটি গানের জোরে তাঁর বেশ পসার হয়েছিল। বর্ধমান রাজবাড়িতেও ‘বাঁধা বোঁদ’ পেয়েছিলেন। ১৯১৪ সালে অসুখে তাঁর কণ্ঠস্বর নষ্ট হয়, কথকতার পেশাও তিনি আর করতে পারেন না। উনিশ শতকের শেষে উপেনী কথকতার চণ্ড ঐতিহ্যানুসারী রীতি তরলীকরণের নিদর্শন। এই রীতির বিরুদ্ধে এই সময় প্রতিক্রিয়া দেখা যায়।^{১৭} কথকতা ও পাঠের ধারায় তৃতীয় প্রতিসরণ আসে, যদি গদাধর প্রথম এবং রামধন ও শ্রীধর দ্বিতীয় প্রতিসরণের জনক হন, তবে তৃতীয় রীতির উদ্ভাবক হলেন প্রভুপাদ অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী (১৮৬৬-১৯৪৪) ও তাঁর শিষ্য-প্রশিষ্যরা। প্রথমত, উনিশ শতকের শেষভাগ থেকে গোড়ীয় বৈষ্ণব সমাজে একটি সংগঠিত আন্দোলন শুরু হয়। নিখুঁত সম্পাদনাসহ বৈষ্ণব গ্রন্থ মদ্রণ, বিধিবদ্ধ নিয়ম প্রবর্তন ইত্যাদি পরিকল্পনার মাধ্যমে প্রভুপাদ অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী নানা স্থানে ‘হরিসভা’ প্রতিষ্ঠিত করতে লাগলেন ও শ্রীপাটগুরুলোকে পুনরুজ্জীবিত করতে যত্নবান হলেন। ভাগবত পাঠ ও কাহিনী বর্ণনা, বৈষ্ণব মহোৎসবের আয়োজন করা ইত্যাদি হরিসভাগুলির নিত্যকর্ম ছিল।

গ্রন্থাগার স্থাপন করাও শুরু হল। অন্যত্র নানা বৈষ্ণব ‘উপসম্প্রদায়ের’ উপর আক্রমণ চলল, গোড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের মতানুগ ‘নিকলুষ’ ‘শাস্ত্রসম্মত’ ব্যাখ্যার জন্য গোস্বামীরা

একজোট হলেন, হাত মেলালেন বিমানবিহারী মজুমদারের মতো সুপরিচিত। ১৭ এই প্রেক্ষাপটে গোড়ীয় সম্মিলনীর (১৪ই বৈশাখ, ১৩৩৮ সন) উদ্যোগে প্রচলিত কথকতা ও পাঠরীতিকে সংশোধিত করার কথাও ভাবা হয়। দীনেশচন্দ্র সেনের সহযোগিতায় প্রভুপাদ অতুলকৃষ্ণ কীর্তন ও কথকতাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠক্রমের অন্তর্গতও করতে চেয়ে ছিলেন; পরীক্ষা নেবার ও ডিগ্রি দেবার কথা ভেবেছিলেন। ১৮ শ্রবতীয়ে, এই আন্দোলনে পাশ্চাত্য শিক্ষিত পণ্ডিতরা অংশ নিলেন। টোলে পড়া সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতদের জায়গায় এলেন বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষিত, অধ্যাপনা পেশায় নিযুক্ত ব্যক্তিরা। ঢাকার প্রভুপাদ প্রাণকিশোর গোস্বামী (১৮৯৯-১৯৮০) এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। পূর্বে বাংলার মফস্বলে বৈষ্ণবধর্ম প্রচারের মাধ্যম হিসাবে পাঠ ও কথকতাকে তিনি ব্যবহার করেন। কৃতি ছাত্র অধ্যাপকরূপে তখন নবী ঠাকুরের নামডাক ছিল। ১৯ পাশ্চাত্য প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় শিক্ষিত কথক ও পাঠকদের দ্বারা বৈষ্ণব সম্মিলনী আন্দোলনের সময় থেকে শূন্য হয়। আধুনিককালে অধ্যাপিকা রাসন্তী চৌধুরী এই রীতির পদাঙ্কানুসারী।

প্রভুপাদ অতুলকৃষ্ণ গোস্বামীর জন্ম নিত্যানন্দ বংশে। পাঠ ও কথকতার আবহাওয়ায় তিনি মানুষ হয়েছেন। পিতা মহেন্দ্রনাথ গোস্বামী স্বয়ং যশস্বী পাঠক ছিলেন। চাকরি ছেড়ে পাঠকতা তাঁর পেশা হয়। কাঁসারিপাড়ার তারকনাথ প্রামাণিকের বাড়িতে কথকতা, পাঠ, কীর্তন লেগেই থাকত এবং সেই বাড়িতে অতুলকৃষ্ণের নিত্য যাতায়াত ছিল। কিন্তু নীলকান্ত গোস্বামীর ব্যাখ্যাই তাঁকে অভিভূত করত। ঘটনাচক্রে পাটনার বারীকপুরে মথুরবর্মণের বাড়িতে তাঁকে একটি অনুষ্ঠানে ব্যাসাসনে বসতে হয় ও শ্রুতির উপরে নির্ভর করে “ধর্মঃ প্রোজদত” (ভাগবত, ১ম স্কন্ধ, ১ম অধ্যায়) শ্লোকের ব্যাখ্যা নীলকান্ত গোস্বামীর অনুসরণে প্রদান করেন। ‘পুঞ্জির ভিতর একটি মাত্র শ্লোক।’ তবুও সেই দিনের প্রশংসা ও বাহবা যুবক অতুলকৃষ্ণকে পাঠক হিসাবে আবির্ভূত হতে প্রণোদিত করে। ডাকও আসতে লাগল, কারণ ‘গোসাঁইয়ের ছেলে, ভাগবত জানে না, এ কখন হতে পারে!’ নানা অন্য খেলালে অতুলকৃষ্ণ ছেলেবেলায় মত্ত ছিলেন। গুরু বংশের এই দায়িত্বে তাঁর, সেই অর্থে, শিক্ষা ছিল না, জানতেন মাত্র একটি শ্লোকই। তাই দিয়ে কতদিন চালান যায়! কিন্তু অবস্থা বেগতিক। এ প্রসঙ্গে অতুলকৃষ্ণের নিজের জবানি শোনা যাক :

“মনসাতলাগিলর চ নং দর্প নারায়ণ ঠাকুরের স্ট্রীট। ৩গন্না প্রসাদ মল্লিক বাবার শিষ্য। তাঁহার স্ত্রীর ইচ্ছা হইল—নিয়মসেবার সময় একটু করিয়া ভাগবত শুনেন। আমাকে অনুরোধ করায় রাজি হইলাম। দশম স্কন্ধ পাঠ আরম্ভ হইল। পাঠের শেষে তাঁহারা একটু ব্যাখ্যা শুনিলার আশ্চর্য করিলেন। তাহাও পূর্ণ করিতে হইল। সারাদিন হাড়ভাঙা পরিশ্রম করিয়া ব্যাখ্যার উপকরণ সংগ্রহ করিতে লাগিলাম। রাতে নীলকান্ত গোস্বামী মহাশয়ের ব্যাখ্যা এখানে ওখানে শুনিয়া বেড়াইতে ও বেদান্ত

আলোচনা করিতে লাগিলাম। আমার ব্যাখ্যা সকলের পছন্দসই হইতে লাগিল। কিছু টাকাও পাইতে লাগিলাম। উৎসাহ খুব বাড়িয়া যাইতে লাগিল। এইরূপে আমি ক্রমশঃ একজন ব্যাখ্যাতা হইয়া পড়িলাম।”^{২০}

ছেলেবেলার বখাটে ছেলে অতুলকৃষ্ণ ধীরে ধীরে বংশগত পেশায় ফিরে এলেন। ভৃদেব কবিরত্নের অনুরোধে ও যোগেন্দ্র নাথ কবিরাজ প্রমুখ পণ্ডিতদের উপস্থিতিতে ১৩০১ সনে অতুলকৃষ্ণ রামকানাই অধিকারীর ঠাকুরবাড়িতে হরিসভার সাংবাৎসরিক উৎসবে ‘যমলার্জুন ভঞ্জন’ ব্যাখ্যা করলেন, শিষ্যবাড়ির আঙিনা ছাড়িয়ে এতদিনে সভাসমিতিতে অতুলকৃষ্ণ তাঁর স্বীকৃতি পেলেন, নিজস্ব রীতিও উদ্ভব করলেন। প্রচলিত পাঠ ও কথকতার রীতি থেকে তা ভিন্ন। হরিসভা আন্দোলন গড়ে ওঠার সময় ঢাকা জেলার বৃন্দনী গ্রামের প্রাণগোপাল গোস্বামী তাঁর সহযোগী হন। অতুলকৃষ্ণের তালিমে সতেজ কণ্ঠের অধিকারী প্রাণগোপাল হরিসভার আসরে পাঠের এই রীতিকে প্রতিষ্ঠিত করায় সচেষ্ঠ হলেন। প্রাণকিশোর প্রাচীনের সঙ্গে নতুন ও প্রচলিত রীতির সন্দ্বন্দর তুলনা টেনে লিখেছেন :

“সেই প্রাচীন কথকরা দিনের পর দিন ভাগবতীয় প্রসঙ্গ লইয়া কথকতা করিতেন। এই কথকতার রীতি ব্যাখ্যা-রীতি হইতে সম্পূর্ণ পৃথক ধরনের। কথকেরা গান গাহিতেন, অঙ্গভঙ্গী করিতেন, অযথা প্রায়শঃ রসিকতার অবতারণা করিতেন, পুরাণকথা অবলম্বন করিয়া বিচিত্র উপন্যাস সৃষ্টি করিতেন, শব্দধূ তাহাই নয় এক পুরাণের কথায় বহু পুরাণের কথা ও দৃষ্টান্ত উপস্থাপিত করিয়া কখনও বা ভাষার ছটায় কখনও বা গুরু গৌরবকণ্ঠের গান্ধীর্ষ্য পুরাণ কথাকে একটি অভিনয়ের পর্যায়ে নিয়া ফেলিতেন। গীতি-নাট্যের মত এই কথকতা আগাগোড়া ধারাবাহিক সংগীতের মতই মনে হইত। কথকগণের কথকতায় নানা রাগ-রাগিনীর আলাপ হইত—কখনও কখনও বা প্রাণগলানো কীর্তন আবার কখনও বা হাসির ফোয়ারা ছুটিত শ্রোতৃবৃন্দের মহলে। প্রাণগোপাল প্রভু পাঠ আরম্ভ করিলেন পূর্বোক্তাচার্যগণের ব্যাখ্যা টীকার মাধুর্য পরিবেশন রীতিকে অবলম্বন করিয়া। শ্রীরূপসনাতন শ্রীজীব ভাগবতের ব্যাখ্যায় যে সিদ্ধান্ত সম্প্রদীত করিয়াছেন, শ্রীপাদ বিশ্বনাথ যে রসবিন্যাস পরিপাটী দেখাইয়াছেন, সেই সকল বিষয় হইল প্রাণগোপালের পাঠের মূল উপাদান। এই অভিনব রীতি প্রদর্শনে শ্রোতাদের চমক লাগিল, ভাবকের ভাব উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল, ভক্তের প্রাণ গলিয়া গেল আর সর্বসাধারণের মনে ভাগবতের মহিমা প্রসারলাভ করিল দ্রুতগতিতে।”^{২১}

(নজরটান আমার)

প্রাণকিশোরও এই রীতিভুক্ত। কথকতার আদর্শ সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব বক্তব্য :

“যে যত আবোলতাবোল বলতে পারবে সেই-ই তত ভালো কথক হে।... এখন ছাপা বই থেকে কিছু টুকে নিলে আর নিজের মনোমত কতগুলো

গান ছড়া, রচনায় একটু রংগরস জমাতে পারলেই হল। কাজেই গান আর গল্পই হয় কথকতার প্রধানতম অঙ্গ। যথার্থ শাস্ত্র তাৎপর্য, সে পড়ে থাকে অনেকটা পশ্চাতে। যারা নিছক শাস্ত্র কথা নিয়ে এ বাজারে নামবে তাদের জমাতে ঘটাতে একটু বেগ পেতেই হবে।”^{২২}

আসলে অতুলকৃষ্ণ, প্রাণগোপাল ও প্রাণকিশোর ফিরতে চেয়েছিলেন তত্ত্বআলোচনায়। কথকতার দুইটি মেরু আছে, শ্রোতাদের চিত্ত বিনোদন এবং ভাব ও তত্ত্বের ব্যাখ্যা। লোক মনোরঞ্জননের জন্য কথার সূকুমার বিন্যাস কথকরা করতেন। কিন্তু উনিশ শতকের প্রান্তে সংস্কারবাদী ভাগবতী পণ্ডিতদের মনে হল যে এই বিন্যাসে তত্ত্ব হারিয়ে যাচ্ছে, কথকতাটা তো কাব্য নয়; তার উদ্দেশ্য ধর্মপ্রচার, শুদ্ধদেব পরীক্ষণকে যেভাবে পরকালের পথ চিনিয়োছিলেন। তাঁরা গদ্য বিন্যাসকে মেনে নিলেন, টীকা অনুমোদিত পাঠে নিজেদের বিন্যাস আনলেন। সংস্কৃত ভাষাকে পরিহার করে টুকরো টুকরো ছোট বাক্যে কথা সাজালেন। কিন্তু উদ্দেশ্য কথকতার বিন্যাসকে তত্ত্ব আলোচনার কাঠামোয় আনা। উদাহরণ দেওয়া হল কোনো গভীর তত্ত্বের অনুষঙ্গে, গল্পও বলা হল সেই প্রসঙ্গে। গল্পের অনুষঙ্গে তত্ত্ব এল না। প্রাণকিশোর ঘরোয়া ধরনের সংলাপে তত্ত্ব ব্যাখ্যা করার রীতি নিলেন, জীবের ব্রহ্মসাম্যজ্ঞ দেখাতে গিয়ে বললেন :

“তেল সলতে যতক্ষণ আছে, প্রদীপও জ্বলিতেছে। কামকামনা আছে। জীব একঘোনি হতে অন্য ঘোনিতে চালাতেছে। তেল সলতে গেল, প্রদীপ নির্বাণিত।”^{২৩}

পাঠের এই রীতি বরানগরের পাঠবাড়ির কেদারনাথ রায় কাব্যপদ্যরূপ-ব্যাকরণতীর্থও নিয়েছিলেন। তাঁর ভাষণ বিন্যাস চিরাচরিত আখ্যান অনুযায়ী নয়, বরং তত্ত্ব অনুযায়ী, সমস্যা অনুযায়ী। যেমন—গুরুতত্ত্ব, জীবস্বরূপ ইত্যাদি। সমস্যা তোলা হয়েছে, ভাগবতে ভক্ত চরিতের প্রবেশ কেন? উত্তর দিতে লৌকিক উদাহরণ টানা হল :

“চিকিৎসক যখন রোগী দেখেন, তখন রোগ সম্পূর্ণ নিরাময় না হলে শক্ত জিনিশ খেতে দেন না। তরল জিনিশ খাইয়ে রাখেন, ক্ষুধা বাড়লে ধীরে ধীরে শক্ত জিনিশ খেতে দেন। শিশু ভূমিষ্ট হলেই তার অন্নপ্রাশন হয় না। ছমাস দুধ খাইয়ে অন্ন হজমের পাকস্থলী তৈরী করা হয়। তারপর অন্নভক্ষণ। তেমনি করেই শুদ্ধদেব পরীক্ষিতের কৃষ্ণতৃষ্ণা জাগবার জন্য ভক্তচরিত বলেছেন।”^{২৪}

এই পাঠেও বক্তার নিজস্ব বিন্যাস আছে, ক্রম তিনিও অনুসরণ করেছেন। কিন্তু স্বর গীতি বা নাটিকার প্রবন্ধে গ্রন্থনা নিহিত নেই বরং তত্ত্ব প্রচারের বন্ধনে আবদ্ধ।

আসলে পাঠক ও কথকের মধ্যে, তত্ত্ব বিন্যাস ও গল্পের দাবির মধ্যে টানাটানি, কামড়া-কামড়ি আছে। রামধনের জীবনের দুইটি প্রচলিত কাহিনীতে এই টানাপোড়েন সূক্ষ্মপট। পাঠক বা পণ্ডিতরা যে জনপ্রিয় কথকদের সবসময় খুব পান্ডা দিতেন, তা নয়। প্রচলিত লোক কাহিনী অনুসারে রামধনের জীবনে এইরকম অভিজ্ঞতা বার বার হয়েছে। উনিশ

শতকের ধনিয়াখালি ছিল পাঠক ও কথকদের বড় আড্ডা। একসভায় একদিন রামধন বেদিতে বসে ভাগবত ব্যাখ্যা করার ইচ্ছা প্রকাশ করলে ‘পাঠক মহাশয় প্রত্যাখ্যান করিয়া বলিলেন যে কথকতা করাই কথকের কর্তব্য; কথক কর্তৃক ভাগবত ব্যাখ্যা করিবার প্রয়োজন নাই’। সেদিনের শাস্ত্র আলোচনায় পরাস্ত রামধন কাশীতে বেদ ও বেদান্ত অধ্যয়ন করে তাঁর জ্ঞানের খামতি পূর্ণ করেন। আবার আরেকবার রামধনের কথকতা শুনে ভট্টপল্লীবাসী পণ্ডিতগণ ‘রামধন লেখাপড়ায় জল দিয়াছেন বলিয়া ব্যঙ্গ করেন।’ প্রত্যুত্তরে রামধন সংস্কৃতে আলোচনা শুরু করেন। পুরুষরা তুষ্ট হলেও মেয়েরা একবর্ণ ‘কিছু বুঝল না। “তখন রামধন পুনরায় সাধুভাষায় কথা কহিয়া ভট্টপল্লী-বাসিনী বামাগণকে পরিভূপ্ত করিয়া স্বকীয় বাসভবনে প্রত্যাগত হইলেন।”^{২৫} কথকতা আখ্যানমূলক। কথাকাহিনী ও সঙ্গীতে বিধৃত পাঠে এই সব থাকতে পারে কিন্তু তা বিধিমাগে আবদ্ধ, তত্ত্ব আলোচনা ও সমস্যা নিরসন পাঠকের উদ্দেশ্য। পাঠ একটি ওজনে বাঁধা, সেখানে হালকা হবার জো নেই। কথকতা এবং পাঠে নিজস্ব বিন্যাস বিংশ শতকে সবাই করেন কিন্তু স্বর ও কাঠামোতে থেকে যায় বেশ কিছু ফারাক। প্রকরণ বিচারের সময় এই শাস্ত্রে আবার ফিরে আসব।

□ পর্ব / ৩ □

ক. কথকতার পেশা : পোষ্টা ও শ্রণামী

কীর্তন বা রামায়ণী গানের দল থাকে, কথক বা পাঠক একাই অনুষ্ঠান জমান। কিন্তু দুটোই পেশা, দুটোর জন্য প্রতিযোগিতা আছে, দুটোর পোষ্টা দরকার। সমাজের অবনয়ে রদবদলের সঙ্গে সঙ্গে পোষ্টাও বদলে যায়। জমিদার পরিবাররা কথকদের অন্যতম পৃষ্ঠপোষক ছিল। কিছু কিছু জমিদারবাড়ির বাঁধা কথক ও পাঠক থাকত। বিরূপপুরের তেলিরবাগের ভূঁইঞারা যখন বসতি স্থাপন করেছিলেন তখন ‘বৃন্তি’ বা চাকরান জমি দিয়ে গ্রামে লোক বসিয়েছিলেন—যেমন, নাপিত, ধোপা ভূঁইমাল ইত্যাদি। এদের সঙ্গে নিয়ে আসা হয়েছিল সংস্কৃতজ্ঞ গোলকচন্দ্র চক্রবর্তীকে। বাবুদের বাড়িতে কথকতা ও পাঠ করা তাঁর কাজ। গ্রামে তাঁর ভিটাকে সবাই পাঠকবাড়ি বলত। রামকৃষ্ণ পরমহংসের কাছে বরানগর থেকে আসতেন যুবক নারায়ণদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, কথকতা ছিল তাঁর পেশা। সেই সূত্রে বেলঘরিয়ার জয়নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁকে দেবোত্তর জমি দেন এবং বরানগরের কুঠিঘাটে তাঁর বসতবাটি সেই ভূখণ্ডের উপরে আজও আছে।^{২৬} হুগলির রাধানগরের জমিদার তীর্থভ্রমণ প্রণেতা যদুনাথ সর্বাধিকারীর সান্ধ্য আসরে নিয়মিত হাজিরা দিতেন গ্রামের পাঠক ও কথক গোপাল চট্টোপাধ্যায়। প্রত্যেকদিন অনেক রাতি পর্যন্ত ভাগবতের পাঠ হত। কিন্তু কার্তিকমাসে বিশেষ উৎসব উপলক্ষে গোসাঁই মালপাড়া গ্রাম থেকে একজন গোস্বামী আসতেন। ঠাকুর

দালানে সমস্ত কীর্তিক মাস ধরে সকালে ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা এবং অপরাহ্নে কথকতা হত। জমিদারবাড়িতে এই সময় পাঠ করার জন্য তাঁর আসর বাঁধা থাকত।^{১২} কথা ব্যবসায়ী হিসাবে ঢাকা জেলার সাভার নিবাসী ভারতচন্দ্র রায় ত্রিপুরার রাজসভায় নিয়োজিত ছিলেন। তার মাসিক বেতন ছিল ৬০। তবে দীনেশচন্দ্র সেনের বর্ণনা থেকে মনে হয় যে ভারতচন্দ্র ঠিক কথক নয়, গল্প বলিয়ে ছিলেন।^{১৩} লক্ষ করার বিষয়, ছেলের গানের খ্যাতির খবর শোভাবাজারের রাজবাড়িতে অনুষ্ঠিত এক কথকতার আসরে নিধুবাবুর মা শুনিয়েছিলেন।^{১৪} নানা উপলক্ষে এই রকম আসর বসত। শ্রদ্ধা ইত্যাদি দশকর্মাদিও উপলক্ষ হতে পারত, তীর্থভ্রমণ সমাপ্তি শেষেও গিন্নিমা আসর বসাতে পারতেন। আবার ব্রত উদযাপন সংকল্পে ও পারিবারিক বিপর্যয়ে মনে শান্তি পাবার জন্য কথকদের ডাকা হত। কথকরা আসতেন। দোল, রাস ইত্যাদি বাৎসরিক উৎসবেও কথকদের ডাক পড়ত। তবে পুরাণ পাঠ ও কথকতার নাকি উৎকৃষ্ট সময় ছিল অন্তর্জাল যাত্রা। মৃত্যুর প্রাকমুহূর্তে শূকদেব পরীক্ষণকে ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করে শুনিয়েছিলেন। তাই কৃষ্ণমোহন শিরোমণি বা কৃষ্ণহরির কথক গঙ্গাতটে ওইরকম কথকতার আসরে দানগ্রহণ পর্যন্ত করতেন না।^{১৫}

সম্মানময় আসর নানা রকম হতে পারত : বৈঠকী আসর, একদিনের কথা বা মাসাধিক পাঠ। আয়োজন বা দক্ষিণাও সেই অনুযায়ী হত। কথকদের অবশ্য আসর পাবার জন্য চুক্তি করতে হত, চুক্তির খেলাপ হলে আসর হাতছাড়া হবার সম্ভাবনা ছিল। তাই ‘দেহকৃৎ ঠাকুরকে’ (পিতাকে) বীরভূমের সেবক শ্রী ঈশ্বরচন্দ্র দেবশর্মা লিখছেন—

“সাঁখপুঁর হইতে মনুষ্য আসিতেছে ৪ রোজ জৈষ্ঠ না জয়া হইলে জবাব হইবে দ্বিতীয় কথক আসিবে অতএব ৩ রোজ জৈষ্ঠ সাঁখপুঁর মোকাম জাইতে হইবেক জানিবেন...পুনুছ নিবেদন কুনুক মোতে ওজর না হয় তাহা করিবেন সে স্থানেতে দিন দুয় কথ্য করিয়ে আসিবেন যথিক কি লিখিব”^{১৬}

জমিদার ছাড়াও গ্রামে উঠতি সম্পন্ন গৃহস্থরা কথকদের বেশ বড় পৃষ্ঠপোষক ছিল। উনিশ শতকে নানা জাতি সমাজে মর্যাদা লাভে সচেষ্ট হয়েছিল। উন্নতিকামী ‘নবশাখ’ গোষ্ঠীরা বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণ করেছিল। নানা উপলক্ষে তাঁরা কথকতার আসর বসাতেন। এই পরিস্থিতিতে রামধন তর্কবাগীশ কথকতার পেশায় ঢুকে পড়ার সুযোগ পান। খাঁটুরার সিদ্ধিরাম রক্ষিত জাতে তাম্বুলি, দালালির কাজে বেশ কিছু উপার্জন করেন। পাঁচ টাকা বায়না নিয়েও শেষপর্যন্ত গদাধর শিরোমণি তাঁর বাড়িতে কথকতা করতে অস্বীকার করেন। শেষ মুহূর্তে কৃষ্ণহরিকে ধরে আনা হয়, রামধনকে কথকতার ধারক হিসাবে নিযুক্ত করা হয়।^{১৭} তারারামের লাভপুর গ্রামে ব্যবসায়ীরা কথকতার আসর দিতেন।^{১৮} কান্দুঠাকুরের বংশধর নদীয়ার ভাজনঘাটের কৃষ্ণকমল গোস্বামীর প্রধান পৃষ্ঠপোষক তো ছিলেন সুবর্ণ বণিক সম্প্রদায়। ঢাকা নিবাসী মদনমোহন পোন্দার সাহাদের নেতা, তিনি ঢাকাতে কৃষ্ণকমলের থাকার প্রথম বন্দোবস্ত করেন। সুবর্ণ-বণিকদের আনুকূল্যে তিনি ‘পৌরাণিক বৃত্তি’ অবলম্বন করে জীবিকা নির্বাহ করেন।

এই ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের যোগাযোগ সূত্রে কলকাতাতেও তাঁর ডাক আসে, ঢাকা নিবাসী ব্যবসায়ীগণের যত্নে তিনি বড় বাজারে কথকতা করেন। আবার সেই আসরে উপস্থিতির সূত্রে টালিগঞ্জও রামদিয়াবাসী কুণ্ডুদের আড়তবাটিতে তিনি পাঠের আমন্ত্রণ পান। এক আসর থেকে অন্য আসরে যাবার যোগাযোগ হয়। সেখান থেকে খিদিরপুর নিবাসী কায়স্থ নীলরতন সরকারের ভবনে এক সপ্তাহ ধরে তাঁর পাঠ ও কথকতা চলে।^{১৮} ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের নিজস্ব যোগাযোগ, আসরে উপস্থিত ভক্ত শ্রোতাদের আগ্রহ এবং নিজ বাড়িতে কথকতার আয়োজন করবার ইচ্ছা, এইগুলি ছিল কথকদের পসার বৃদ্ধি হবার সূত্র। ক্ষান্তিলতা দেবীও এইভাবে আসরে মৃদু শ্রোতাদের কাছ থেকে নিত্য নতুন জায়গায় বলতে যাবার আমন্ত্রণ পেতেন। একটা আসরে ভাল পাঠ করা হয়ে ওঠে অন্য আসরে বসবার অন্যতম শর্ত।

পরবর্তীকালে বারোয়ারি পূজা অনুষ্ঠানে কথকদের ডাক পড়ত। প্রথম মহাযুদ্ধের পরে হাওড়ার ব্যাটার কদমতলার বারোয়ারি দুর্গাপূজার সময় কথকতা হত। বারোয়ারি থেকে কথককে প্রত্যেকদিন পারিশ্রমিক দেওয়া হত।^{১৯} একবার মহানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়ও গ্রামের বারোয়ারিতলায় ‘তরুণীসেন বধ’ কথকতা করেছিলেন।^{২০} উনিশ শতকের শেষে ও বিংশ শতকের গোড়ায় স্থাপিত হরিসভাগুলিতে কথকরা প্রায়ই অনুষ্ঠানের আমন্ত্রণ পেতেন। ১৯২৮ সালে বেহালা হরিভক্তি প্রদায়িনী সভার ৭৬ তম সাম্বৎসরিক উৎসবে দুর্গাচরণ সাংখ্যাতীর্থ, প্রমথনাথ তর্কভূষণ প্রমুখ পণ্ডিতদের গুরুগুর্তীর বক্তৃতার শেষে কথকতার অনুষ্ঠান রাখা হয়েছিল। তখন, ‘শেষে আড়িয়াদহ নিবাসী প্রসিদ্ধ কথক শ্রীযুক্ত নেপালচন্দ্র ভাগবত রত্ন মহাশয় উঠিয়া সরস বাগবিন্যাসে সমাগত জনগণের চিত্ত বিনোদন করেন’। নানা কথক এইসব হরিসভায় আসতেন। খিদিরপুরের ক্ষীরোদ চন্দ্র মধুখোপাধ্যায় বা কথক গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য কোনো কোনো বৎসরে নিযুক্ত হতেন। আবার কোনো বছর উল্লেখ পাওয়া যায় যে বিবেশ্বর শাস্ত্রী মহাশয় শাস্ত্র ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে দুই মাস কথকতা করেছিলেন। ১৯৬১ সালেও আমরা খবর পাই যে ‘চুঁচড়ো নিবাসী সীতারাম ভাগবতচার্য আষাঢ় ও শ্রাবণ প্রায় দুইমাসকাল ভাগবতীয় উপাখ্যানগুলি কথকতার মাধ্যমে অতি সুন্দরভাবে সভায় পরিবেশন করিয়াছেন।’ হরিসভার এইসব আসরের পৃষ্ঠপোষক হিসাবে যাঁদের নাম পাচ্ছি তাঁরা সবাই উঠতি গোষ্ঠী, ‘আঢ্য, সাহা, কুণ্ডু, নস্কর, শীল, দাস, কস্মকর’ ইত্যাদি। একবার নীলমণি মান্না কথকতার আসরের জন্য বিশেষ দান হিসাবে পাঁচ টাকা দিয়েছেন।^{২১}

জমিদার বা উঠতি ব্যবসায়ীদের টাকার জোর আছে, সমাজে প্রতিষ্ঠা পাবার ইচ্ছা আছে, তাঁরা শহরে ও গ্রামে কথকতার আসর বসাবেন, কীর্তন গানের বন্দোবস্ত করবেন, যাত্রার দল খুলবেন, এই সব তথ্যে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। কিন্তু কথকতা শোনা ও শোনানো পুণ্য লাভের পথ, শ্রদ্ধা শ্রদ্ধনতেও ভাল লাগে। কথকতার বোলবোলাওয়ার সময় গ্রামের সাধারণ গৃহস্থ বাড়িরাও এই শিল্পের গুণগ্রাহী ছিল। এইসব আসরের

পৃষ্ঠপোষকতা করতে বাড়ির মেয়েরা বেশি করে এগিয়ে আসতেন। প্রসঙ্গক্রমে বীরভূমের হরেকৃষ্ণ মূখোপাধ্যায় স্মৃতি-নির্ভর রচনায় লিখেছেন,

“বেশী দিনের কথা নয়, পঞ্চাশবৎসর পূর্বেও দেখিয়াছি—কথক গ্রামে আসিয়াছেন, কিন্তু একবৎসর পূর্বে গ্রাম হইতে বাহির হইতে পারেন নাই। দক্ষিণা ছিল দিন দুইটি মাত্র টাকা। কখনো একাকী আসিতেন, কখনো সঙ্গে একজন মাত্র সেবক থাকিত। সংগতিপন্ন গৃহস্থ বাহারা তাঁহারাই পাঁচ দিন দশ দিন পনের দিন পর্যন্ত কথক ঠাকুরকে সম্বল্লে গৃহে রাখিতেন। ব্রাহ্মণেতর জাতি হইলে কোন ব্রাহ্মণবাড়িতে তাঁহার আহার ও বাসের ব্যবস্থা হইত। কখনো বা নিজেদের চণ্ডীমন্ডপে বা বৈঠকখানায় স্থান দিয়া আহারের ব্যবস্থা করিতেন ব্রাহ্মণগৃহে। অতিদুর্গন্ধিনী শূদ্র বিধবা অন্ততঃ একটা দিনও কথকতা দিতেন। সন্ধ্যায় গ্রামের কোন দেবস্থানে অথবা গ্রাম্য প্রধানের কিস্বা কোন ভক্তিমান গৃহস্থের চণ্ডীমন্ডপে কি বিষ্ণুমন্দিরে কথক কথকতা করিতেন।”^{১২} (নজরটান আমার)

সময়কালে গ্রামে কথকতার পৃষ্ঠপোষকতার ব্যাপ্তি উদ্ধৃতাংশের ছহে ছহে ধরা পড়ে। সেরকম কিছুর না জুটলে কলকাতা শহরে কথকরা নিজেরাই বসে যেতেন এবং শ্রোতা সমাগমও হত। কথকতার রসজ্ঞ যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি তাঁর একটি অভিজ্ঞতা এইভাবে লিখেছেন,

“সাত আট বছর পূর্বে একবার কলিকাতায় কয়েকমাস ছিলাম, বৈকালে গোলদীঘিতে বেড়াতে যেতাম। দেখতাম দীঘির দক্ষিণ পাড়ের মন্ডপে একটি লোক কি বলত, বিশ পঁচিশজন একমনে শুনত। কথক কৃষ্ণবর্ণ, কিণ্ডিৎ স্কুলকায়, চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ বৎসর বয়স। গা খোলা, উড়ানী কখনও কোলে, কখনও ভূমিতে পড়ত। দক্ষিণবাহু কখনও প্রসারিত, কখনও বক্ষলগ্ন; স্বর কখনও উদাত্ত, কখনও অনুদাত্ত হ’ত। লোকটির দেবদত্ত শক্তি ছিল, নইলে এতগদ্গলি লোক প্রত্যহ শুনতে আসত না।”^{১৩}

বিংশ শতকে যানবাহনের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে কথকের চাহিদা অণ্ডলে আবদ্ধ নেই। আসরের ডাক দূর-দূরান্ত থেকে আসে। প্রয়াত ফেলারাম বন্দ্যোপাধ্যায় ‘বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা, অধুনা বাংলাদেশ, আসাম, উত্তরপ্রদেশ’ প্রভৃতি এলাকায় রামায়ণী কথকতা করেছেন। অধুনা তাঁর পুত্র শ্বিজরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভৌগোলিক পরিভ্রমণ একই ধরনের। গত জুন মাসে, (১৯৯৩) এক মাস ধরে উড়িষ্যার ময়ূরভঞ্জের রাজালোকায় শ্রীশচন্দ্র দাসের বাড়িতে শ্বিজবাবু কথকতা করেছেন; সভায় মাইক ছিল, আসরে সহস্রাধিক লোক হত। বাসন্তী দেবী বিদেশেও পাঠ করেন। প্রবাসী বাঙালিরা সাধারণত আসর বসায়। আবার ১৯৯৩ সালের জানুয়ারি মাসে নিউ-আলপদুরের এন-ব্লক-এ রঙিন পোস্টার দেখা যায়। লন্ডননিবাসী বিশ্ববিখ্যাত ‘ষড়্‌বমানস প্রবক্তা’ শ্রীকিরীট ভাই কলকাতায় ‘সঙ্গীতময় ভাগবত প্রবচনের’ অনুষ্ঠান করবেন। প্রচার মাধ্যম ও সময়ের সঙ্গে সবাইকে মানিয়ে নিতে হয়।

১৮৩৪ সালে কার্তিক মাসে বীরভূমে কথকতায় আয় কীরকম হত? বীরভূমে প্রাপ্ত একটি জমা খরচের হিসাবে দেখা যাচ্ছে যে কথকের আয় নিজস্ব একটাকা এক আনা।^{১৪} উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে পাদ্রি রেভারেন্ড জেমস লঙ কথকদের স্মৃতিশক্তি ও বলার ক্ষমতায় মূগ্ধ হয়েছিলেন।^{১৫} ক সেই প্রসঙ্গে জানিয়েছিলেন যে দক্ষ কথকদের কয়েক-জন মাসে ৫০০ আয় করতেন। কোনো কোনো ঋতুতে কেউ কেউ ২০০০ টাকা পর্যন্ত উপার্জন করেছেন। এঁদের মধ্যে দুয়েকজন কোনো বাড়ির বাঁধা কথক হয়ে থাকতেন। ঘরে জ্ঞান পণ্ডাশেক মহিলাকে দৈনিক দু'ঘণ্টা কথা শোনার জন্য কলকাতার একজন ধনী লোক কথক নিযুক্ত করেছিলেন। কথকতার জনপ্রিয়তা এই সময় তুঙ্গে উঠেছিল। বিংশ শতকের গোড়ায় বাঁকুড়ায় যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধির মা গ্রামে রামায়ণী কথকতার আসর দিয়েছিলেন। তিন ক্রোশ দূর থেকে কথক ঠাকুর শিষ্য নিয়ে এসেছিলেন; ওই অঞ্চলের নামকরা কথক। একমাস পাঠ চলেছিল, ৩০০ দক্ষিণা নিয়েছিলেন।^{১৬} ১৩১১-১২ সনে ১৩ই ফাল্গুন থেকে বৈশাখ পর্যন্ত কবিরাজপুরে পার্বতীচরণ রায়ের স্ত্রী বগলাসুন্দরী দেবী মহাভারত পাঠ ও কথকতার আসর বসান। পাঠক ছিলেন হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ ও কথক ছিলেন তাঁর কাকা জানকী নাথ শিরোমণি। পাঠ ও কথকতা বাবদ তাঁদের প্রাপ্ত হরিদাসবাবুর হিসাবের খাতা থেকে উদ্ধৃত করা যাক,^{১৭}

“পূর্ব সনের ১৭ ফাল্গুন	৫৭
৭ চৈত্র	২০৭
মোট	২৬৭
১১ বৈশাখ লক্ষ্মী বাটী আসিবার কালে তাহার মাং	২৬৭
২ জ্যৈষ্ঠ খড়্গা বাটী আসিবার কালে তাহার মাং	২৭
৫ জ্যৈষ্ঠ মহাভারতের দক্ষিণাদ—	১১০৭
সোনা একভরি সাড়ে ছয় আনা (মুং অং)	৩৪১১০
শাল এক জোড়া (মুং অং)	২০৭
গরদ এক থান ঐ	৪৭
চেলির জোড়া ১টা, ,,	৪৭
চেলির সাড়ি ১ খানা ,,	৩৭
কাঁসার বাটি ৭টা (মুং অং)	৩১১০
পিতলের ঘটি ৩টা ,,	১১১০
কাসার থাল ১ খানা ,,	২১১০
সুতার কাপড় মোট ,,	২৬৭
সংসারে পিতৃঠাকুরের নিকট দত্ত মোট—	২৫০৭
মাং=মারফত, বাং=বাবদ, মুং অং=মূল অনুমান”	

আসলে আয় দুই রকমের। কথকতা বা গানের জন্য যজ্ঞমানের কাছে ব্রাহ্মদ দক্ষিণা ও আসরে পাওয়া প্রণামী। রামায়ণী গান দলবদ্ধ; রামায়ণী কথকতা একক কিন্তু

দক্ষিণাদির বন্দোবস্ত একইরকম ছিল। কলকাতার পুরনো এক বাসিন্দা লিখেছেন, ‘তখন [উনিশ শতকের শেষপাদে] মধ্যবিত্ত গৃহস্থ বা গরীবগুরুবো যাদের বাড়ীতে একটু উঠান আছে তাঁরাই বাড়ীতে রামায়ণ গান দিতেন।’ এর জন্য বন্দোবস্তের নাম ছিল ‘মালা নাবানী’, অবস্থা বিশেষে তা হতে পারত ‘পাঁচ টাকা থেকে পনের টাকা পর্যন্ত।’

“মালা নাবানী ব্যাপারটা হ’ল, কথক ঠাকুর জামাকাপড় ছেড়ে গলায় পৈতে বার করে বেগুনী রংয়ের বেনারসী জোড়, গলায় চাদর, খালি গায়ে বসলেন, যিনি গান দিয়েছেন তিনি এসে কথক ঠাকুরের গলায় এক ছড়া গোড়ে মালা পরিয়ে দিলেন। গান শেষ হলে তার গলা থেকে মালা ছড়াটা খুলে নিয়ে চুস্তি মোতাবেক টাকা দিয়ে দেবেন। কথক ঠাকুর তখন হাতের চামরটা কটার মাথায় বার তিনেক ছুঁইয়ে আশীর্বাদ করলেন। শ্রোতারা গান শুনেন যে প্যালা কথক ঠাকুরের থালায় দিয়েছেন, সেটা তাঁর উপরি প্রাপ্য। যদি কেউ সিঁদে দিয়ে থাকেন সেটাও ধর্তব্যের মধ্যে নয়।”

এই প্যালা দেওয়া আসরের অপরিহার্য অঙ্গ। প্যালা না দিলে, না নিলে, কোনো কথকতার আসর সিদ্ধ হয় না।

অনুপম ভাষাতে বনেদী বাসিন্দাটি লিখেছেন,

“বাড়ীর বিধবা ঠাকুমা বা জ্যাঠাইমারা একখানি চাদর জড়িয়ে দুই একাট নাতি নাতনীর হাত ধরে কথা শুনতে যেতেন। সঙ্গে দুটো এক আনি বা দোয়ানী নিতেন বা দুচারটে পয়সা আঁচলের খুঁটে বেঁধে নিতেন, প্যালা দিতে হবে। ‘রামায়ণ গান শুনলে মূল্য না দিলে কানে কালা হয়ে যাবে। তিনকাল গিয়ে এককালে ঠেকেছে প্যালা না দিয়ে গান শুনলে এসে কানে কালা হয়ে নরকে যাবে নাকি?’ ছোট উঠান, তার উপর সত্তরটি পাতা, ফরসা চাদর দিয়ে মোড়া, শ্রোতারা সব অধিকাংশ ঠাকুমা ও জ্যাঠাইমার দল। গুঁটি গুঁটি এসে কথক ঠাকুরের জায়গাটা ফাঁক রেখে, গোল হয়ে বসে গেল।”^{১৭}

প্যালা আদায় করার কায়দাও কথকদের জানতে হত। মেহেরপুরের কথক ঠাকুর কালীনাথ ভট্টাচার্য এইকাজে বেশ পোক্ত ছিলেন। যেন,

“এক কথকতা উপলক্ষে মধ্যে মধ্যে তাঁহার উপরি প্রাপ্তিও মন্দ হত না। সন্ধ্যার পর কথা শেষ হইলে কোনদিন চিকের অন্তরালস্থিত পুরমহিলাগণকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেন, ‘মা সকল, কাল রামের বিবাহ, বিবাহে ‘নকতা’ দিতে হয়,—তা যেন মনে থাকে।’ কোনদিন বলিতেন, ‘কাল লক্ষণভোজন, সিধা আনিতে ভুলিও না।’—কেহ নতুন কাপড় দিত, কেহ কাঠের বারকোশ পূর্ণ করিয়া সিধা দিত, কেহ নতুন কাঁসার ডিসে নানা মিষ্টান্ন দিত; এতস্ত্র ডাব, পেঁপে, তরমুজ, সুপক্ক কলা, এবং নানাবিধ তরকারিও তাঁহাকে উপহার দেওয়া হইত।”^{১৮}

প্রণামী ও সিধার মাধ্যমে কথকের নানা প্রাপ্তিযোগ হত। আসর জমাতে পারলে লোক

আসবে, আয়ও হবে। আসরে প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা ধরা পড়ে এক কথকের নিজের জীবানিতে,

“...গিন্নীমার একটু আগেই বাড়ী ফিরে যেতে হচ্ছে। তিনিই সবার আগে দাঁড়ালেন সিধের ডালাটি দহাতে করে। তার ডালার ভেতর চাল ডাল তেল নুন মশলা গব্যঘৃত তৈল আলু কুমড়া সবই আছে। সঙ্গে একখানা ছোট গীতা, একটি পৈতে আর একটি ক্ষুদ্র চামরও রয়েছে দেখা গেল।

“...কাপড় একখানা, তার সঙ্গে রূপোর টাকা, একটি তামার পয়সা আর একটি সোনার তুলসীপাতা কাগজে মোড়া, এগুন্নিও ঠাকুরের হাতে দিলেন নন্দর মা। ঠাকুর এগুন্নি নিজের পাশেই আসনের উপর রেখে দিলেন। বামনভিক্ষার কথা তো পড়ে রইল সৈদিনের মত ঐ পর্যন্ত। নন্দী গিন্নীর পর মেয়েমহলে ক্রমশই চণ্ডলতা ঘনিষ্মে উঠলো। এক এক করে মায়েরা সব ডালা থালা চুপরি রেকাব করে সিঁধে নিয়ে এগুতে শুরুর করলেন, আর তখন কথকতা চলে? ডাব আর নারিকেল শুপীকৃত হতে লাগলো ঐ তুলসী মণ্ডের একপাশে।” ১৯

সফল কথকের স্বপ্ন এটা। বাস্তবে কাপড় বা সিঁধে পাওয়া যায় কিন্তু অনেকদিন ধরে কথকতা চললে প্যালার পরিমাণ হয় ৫ পয়সা বা ১০ পয়সা। চালতাবাগানের আসরে স্বিজবাবুর থালায় ওইভাবেই পাড়ার জ্যাঠাইমা বা মাসিমারা তাঁদের সাধ্যমত প্যালা দেন। স্বিজবাবুর হাতেও চামর থাকে, তাই বুলিয়ে তিনি তাঁদের আশীর্বাদ করেন, সেটা রীতি। আসরে বাসন্তীদেবীকে যিনি যাই দেন, বাসন্তীদেবী হাসিমুখে তাই নেন। শ্রোতারা ভক্ত, তাঁদের দান শিরোধার্য। সেই দানকে ফিরিয়ে দেওয়া অসম্মানের কাজ, ধর্মবিগর্হিত। এই শোভনতা কথকদের আচার আচরণে প্রত্যাশিত।

খ. জনপ্রিয়তার পট পরিবর্তন : একটি বিতর্ক

উনিশ শতকের শেষভাগ থেকে কথকতার জনপ্রিয়তার ভাটা দেখা দিচ্ছে। সঞ্জীবচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র প্রমুখদের চোখে সেটা ভাল করে ধরা পড়েছে। বিংশ শতকের তৃতীয় দশকে দীনেশচন্দ্র সেন ‘কথকতাকে’ বাংলার ‘লুপ্ত সম্পদ’ বলছেন। অধুনা কথকতার ক্ষীণ ধারা দেখা যায়। সোনামুখীর কথক রাজকৃষ্ণ গঙ্গোপাধ্যায় নিজেদের প্রজন্মকে এই পেশার শেষ প্রতিনিধি বলে মনে করেন। স্বিজবাবুর বংশেও আগামী প্রজন্মে এই পেশা কেউ অবলম্বন করবে না। রাজকৃষ্ণবাবুদের বংশের সবাই কথক; প্রয়াত হেরশ্বনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ও ফকিরনাথ গঙ্গোপাধ্যায় এই পেশায় নিয়োজিত ছিলেন। তাঁর জ্ঞাতী ভ্রাতা বিশ্বনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ও কথকতা করেন। রাজকৃষ্ণবাবুর বাঁধা আসর আছে, শান্তিনিকেতনেও গৃহস্থবাড়িতে তাঁর আসর বসে। কিন্তু উপার্জন কমেছে। আগে যেখানে জমাটি সময়ে আয় হত আট হাজার, এখন সেখানে আয় দুই হাজারের বেশি হয় না। রাজকৃষ্ণবাবুর কথায় এক বংশানুক্রমিক পেশাদার শিল্পীর আক্ষেপ স্পষ্ট। ২০

এই জনপ্রিয়তার হাসবৃদ্ধি প্রসঙ্গে আমেরিকার গবেষকদের কিছু বক্তব্য আছে। মিল্টন সিগ্গারের নির্দেশে ডামলে মহারাষ্ট্রে কতকগুলি হরিকথা পাঠের আসর সমীক্ষা করেছিলেন, কথকদের ও শ্রোতাদের জাতপাত-এর একটা হিসাব তাঁর রচনায় পাওয়া যায়। সাম্প্রতিককালের একটি সন্নিবিষ্ট প্রবন্ধে ফিলিপ লুটগেনডর্ফ (Philip Lutgendorf) বারানসি শহরে রামচরিতমানসের পাঠের জনপ্রিয়তাকে ব্যাখ্যা করেছেন উচ্চবর্ণের পৃষ্ঠপোষকতার সূত্রে; তাঁর লেখায় পাঠের রীতিবদলও বিশ্লেষণ করা হয়েছে এই পোষ্টাদের রদবদলের কার্যকারণ সম্পর্কে। এই প্রসঙ্গেই কথকদের চাহিদা ও আয়ের তেজী বা মন্দাভাব আলোচিত হয়েছে। সমাজ 'সংস্কৃতায়নের' নির্দেশক হল রামায়ণ পাঠের জনগ্রাহ্যতা।^{২১}

কথকতা প্রসঙ্গে আমেরিকার পণ্ডিতদের বক্তব্যের সঙ্গে বৈমত্য আছে। সমাজে কিছু লোক সব সময় ওঠে, কিছু লোক সবসময় পড়ে। প্রকৃতপক্ষে, ওঠা-পড়া, পোষ্টাদের খাই, উচ্চবর্ণের সংস্কৃতির অনুবৃত্তি, কোনোটাই নির্দিষ্ট শিল্পের প্রতি সামাজিক আনন্দকূল্য বা উদাসীনতার 'করণ' হতে পারে না। শিল্পের নিজস্ব ভূমিকা আছে, শ্রোতাদের রুচি ও রসবোধ আছে।

সংস্কৃতায়ন ও পোষ্টাদের সামাজিক বিবর্তনের ছকের বিচারে শিল্পরীতির নিজস্ব সামাজিক ভূমিকা এবং শ্রোতাদের রুচি ও রসবোধের পরিবর্তনের সমস্যা একদম আমল পায় না। গোষ্ঠীর ওঠানামার সমান্তরাল প্রতিফলন বলে বিবেচিত হয় কথকদের পেশার জোয়ার-ভাটা।

উনিশ শতকের প্রাসঙ্গিক সাক্ষ্যগুলি খুঁটিয়ে পড়লে আপত্তির সারবত্তা বোঝা যাবে। লুটগেনডর্ফের গবেষণার অন্যতম প্রতিপাদ্য বিষয় হল—হিন্দী ছাপাখানার আগমন রামায়ণ পাঠের জনপ্রিয়তা বাড়িয়েছে। ছাপাখানা আসার ফলে সুলভ মূল্যে রামায়ণ কাশীর মধ্যবিস্তার হাতে এল, বাড়িতে বাড়িতে রামায়ণ পাঠের দৈনিক আসর বসতে শুরুর হল, 'রামায়ণীজী'দের শিক্ষা আরো সহজসাধ্য হল।^{২২} পাঠের জনপ্রিয়তার পেছনে সুলভে বই পাবার চাইতেও বড় প্রশ্ন হল, বারানসি শহরের মধ্যবিস্তারের পাঠের রুচি, বিষয়ের প্রতি আকর্ষণ। বাজারে চাহিদা আছে বলে সস্তায় বই ছাপা হচ্ছে, উল্টোভাবে শুরুর নয়। অনুরূপ অবস্থায় বটলার ছাপাখানাও সুলভ মূল্যে রামায়ণ ছাপিয়েছিল, হাজারো অন্যরকম ধর্মগ্রন্থও ছাপানো হয়েছিল। আজও সেই ধারা অব্যাহত আছে। কিন্তু তারও মধ্যে পাঠের রুচিতে, সাহিত্যের রুচিতে বদল দেখা দিল, বাঙালি পাঠক-সমাজ বদলাতে শুরুর করল। তাতে ছাপাখানার ভূমিকাও বদলে গেল। দীনেন্দ্র-কুমারের প্রাসঙ্গিক মন্তব্য শোনা যাক।

“আমাদের পক্ষী হতে কথকতা উঠিয়াই গিয়াছে। সে কালে যাহারা কথকতা দ্বারা সংসার প্রতিপালন করিতেন, একালে তাহাদের বংশধররা অন্য বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছেন। গাল’স্কুলের কল্যাণে একালের মেয়েরা লেখাপড়া শিখিয়া সেকালে রামায়ণ, মহাভারত আর স্পর্শ করেন না; এখন তাহারা

সাহিত্যে আর্ট ও মনস্তত্ত্বের বিশ্লেষণসূচক, নব্য ঔপন্যাসিকগণের প্রণীত কামায়ণ পাঠে তৃপ্তলাভ করিতেছেন, রামায়ণে আর মন ওঠে না।”^{২৩} (নজরটান আমার)।

নবীনচন্দ্র সেন নিজে পাঠে সন্নিপুণ ছিলেন। পাঠ উঠে যাওয়ার গাওনা গাইতে গিয়ে তিনিও হৃদহৃদ এক কথা বলেছেন।^{২৪}

“...দেখিলাম আমার বাল্যকালে যাহারা পাঠক ছিল, তাহাদের মধ্যে এখন ২/৪ জন যাহারা জীবিত আছে, তাহারাই এখনকার খ্যাতনামা পাঠক। তাহাদের উত্তরাধিকারী আর কেহ গ্রামে জন্মে নাই। কারণ জিজ্ঞাসা করিলে শূন্যলাম—দেশে পুঁথি কে শূন্যে যে পাঠ করিতে কেহ শিক্ষা করিবে। কোন বাড়ীর স্ত্রীলোকেরা আর এ পুঁথি শূন্যে না। বৃদ্ধিলাম স্ত্রীশিক্ষায় দেশ যথার্থই টলায়মান। এ সকল পুঁথির স্থান উপন্যাস গ্রহণ করিয়াছে।”^{২৪}

‘নবল পড়া মেয়েদের’ উপর দীনেন্দ্রকুমার ও নবীন সেনদের জাতকোথ কতটা উনিশ শতকের পুরুষতন্ত্রের স্বভাবজ ফল, সেই প্রসঙ্গ বর্তমানে আলোচ্য নয়। প্রাসঙ্গিক শূন্য এই ইংগিত যে কথকতার প্রধান শ্রোতা মেয়েরা, কিন্তু তাঁদের রুচিতে বদল হয়েছে; তাঁরা নিজেরা পড়তে সক্ষম হয়েছেন ও বাদ-বিচার করছেন, রসবোধ অন্যদিকে মোড় নিয়েছে, সাহিত্য বদলে গেছে, উপন্যাস পাঠ জনপ্রিয় হচ্ছে। পৃষ্ঠপোষকতার পরিবর্তনের পেছনে সামাজিক গোষ্ঠীর ওঠা নামার চাইতে অনেক বেশি সক্রিয় রসের আশ্বাদের রূপান্তর, উপন্যাস নামে নতুন শিল্পের প্রতি ক্রমবর্ধমান আগ্রহ।

অন্যদিকে উনিবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে কথকদের সামাজিক ভূমিকা প্রসঙ্গে প্রত্যাশায় খামতি ঘটেছিল, আচার-অনুষ্ঠানের মূল্যায়নেও প্রশ্ন উঠেছিল। কথকতা ও পুরুষপাঠ ধর্ম-সাধনার সঙ্গে যুক্ত, পাঠে পুণ্য হয়, শূন্যে পাপ কেটে যায়, এই জাতীয় বিশ্বাসে তার আবেদনের একটি দিক জড়িত আছে। কথক ঠাকুর বিশেষ গুণ বিশিষ্ট হবেন, এই ধারণা প্রত্যাশিত। রামগতি ন্যায়রত্ন কথকদের প্রতি গৃহস্থের বিরক্তির কথা উল্লেখ করেছেন।

“সম্প্রতি কিছু নিরক্ষর বা স্বপক্ষর লোক ঐ ব্যবসায় অবলম্বন করিয়াছেন, এবং তাহাদের অনেকের পান্যাসক্তি, বিশেষতঃ পরদারানুরক্তি দর্শনে ঐ শ্রেণীর উপরেই লোকের অভক্তি জন্মিয়া গিয়াছে। এখন আর কোন ভদ্রলোকে নিজ বাটীর মধ্যে কথা দিতে পার্যমানে সম্মত হন না।”^{২৫} (নজরটান আমার)

শ্রীহট্টে পুরুষপাঠ প্রচলিত ছিল, পুরুষোচিতরাও যেমন তেমন করে পাঠ সেয়ে দ্রুপস্যা আয় করতেন। কিন্তু এই রীতি যে আচার সর্বস্বতায় পরিণত হচ্ছে, শিল্প কুশলতা যে হারিয়ে গেছে, সেই বিষয়েও গৃহস্থরা সজাগ হচ্ছিল। বিপিনচন্দ্র পাল লিখেছেন, “আমার মনে পড়ে দ্ব” একবার আমার জেঠুত ভাই, ইনি বাবার মৃদুরী ছিলেন এবং বাবার সংসারের কাজকর্মের তত্ত্বাবধান করিতেন—বাঙলা নজির খড়োয়া দিয়া মৃদুরী পুরুষ বলিয়া এই পাঠের সময় রাখতেন। কখনও

কখনও আমাদের পরিবারে হয় নাই কিন্তু অন্যত্র এমনও শুনা গিয়াছে—দুশত বালকেরা ছেঁড়া চটি এইরূপে মর্দাড়া পুরাণের আসনে স্থাপন করিত। লোকেদের ধর্মবিশ্বাস কতটা যে নষ্ট হইয়া গিয়াছিল, এই সকল ঘটনা ও কাহিনীতে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়।” ২৬

ময়মনসিংহেও পুরাণ পাঠের দুরবস্থা, পাঠক ও কথকদের নিরক্ষরতা ইত্যাদি অভিজ্ঞতার কথা কৃষ্ণকুমার মিত্রও লিপিবদ্ধ করেছেন। ২৭ বিপিন পাল বা কৃষ্ণকুমার মিত্রের লেখায় ব্রাহ্মসমাজের ছোঁয়াচ থাকা অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু রামগতি নিশ্চয় ব্যতিক্রম। পূর্বের কথকরা সবাই দক্ষ বা নিষ্কলুষ ছিলেন, এমন মনে করারও কারণ নেই। কিন্তু কথকরা আর আগের মতো নেই, পুরাণ পাঠের মাহাত্ম্য কমে যাচ্ছে, ভদ্র গৃহস্থের মনে এই ধারণার জন্ম, তজ্জনিত অশ্রদ্ধা ও তাচ্ছিল্যের ভাব, পেশাকে আঘাত হানার পক্ষে যথেষ্ট। মনে রাখা দরকার যে জমাটি দীর্ঘস্থায়ী আসর বসাবার উদ্যোগ জমিদার বা উঠতি ব্যবসায়ীরা নিত। কিন্তু আসরে গৃহস্থবাড়ির মেয়েদের, সাধারণ শ্রোতাদের উৎসাহ ও অংশগ্রহণের কথা সাক্ষ্যে বার বার বলা হয়েছে। সাধামত পালা তারাই দিত, তাদের আগ্রহও কম ছিল না। তাই ‘গেরস্তদের’ ও বাড়ির মেয়েদের মনোভাবের পরিবর্তন এই ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ। আবার অশ্রদ্ধা বা তাচ্ছিল্য যে সবসময় সার্বিক ধর্মবিশ্বাসে শিথিলতার পরিচায়ক, তা নাও হতে পারে। বরং ঠিক এই সময়ে ‘নব্য হিন্দু’ পুনরুত্থানবাদীরা যেভাবে ধর্মকে বিন্যস্ত করতে লাগলেন, তার সঙ্গে পুরাতনী কথকতার রূপ ও ব্যাখ্যা হয়ত তাল রাখতে পারল না।

অন্যদিকে যাত্রা ইত্যাদির উদ্ভব হচ্ছে, বাংলা রঙ্গমঞ্চেও পৌরাণিক পালা জাঁকিয়ে বসেছে, বিনোদনের ক্ষেত্রে কথকতার নানা প্রতিযোগী বেড়েই চলেছে। বাংলার সামাজিক ইতিহাসে রুচির ও অনুভূতির পট পরিবর্তন নিয়ে লেখা সবে শুরু হয়েছে। পোষ্টার সামাজিক অবস্থান বা তার পণ্য ক্রয়ের ক্ষমতা বা বাজারি চাহিদা, শিল্পের পৃষ্ঠপোষকতাকে নির্ধারণ করার একমাত্র শর্ত হতে পারে না। নানা স্তরে সহৃদয়ের মনের রূপান্তর, রসের আশ্বাদে রদবদল, নন্দন বোধে পরিবর্তনও সমভাবে বিবেচ্য। বর্তমান পর্যায়ে কোনগুলি ‘কারণ’, কোনটাই বা ‘ব্যাপার’ কারণ বা ‘করণ’ তা ঠিক করা মূর্শকিল। এই ক্ষেত্রে আপাতত জয়ন্ত ভট্টের অনুগামী হয়ে বলা যেতে পারে যে সামগ্রীর ‘করণত্বই’ প্রাসঙ্গিক। কোনো কারণই এককভাবে কার্যের ‘করণ’ নয়। যেহেতু সামগ্রী (কারণকূট বা নিখিল কারণের সমষ্টি) থাকলে কার্য অবশ্য উৎপন্ন হয়, সেটাই অসাধারণ কারণ বা ‘করণ’। ইতিহাসবিচারে জয়ন্ত ভট্টের ধারণা অনেক এঁড়ে তকের অবসান ঘটাতে পারে। ২৮

কথকতার কুৎকোশল

ক. আসর বিলুপ্ত

পশ্চিমপুরাণের পাতালখণ্ডের একটা পদ্যে অধ্যায় জুড়ে আছে পাঠের আসর কীরকম হবে তার বিবরণ। উনিশ শতকে ওয়াডের বিবরণীতেও আসর সাজানোর কথা প্রাধান্য পেয়েছে। আসর জমাট না হলে কথকতা মার খাবে। উনিবিংশ শতকের সাতের কোঠায় একটি গ্রামের কথকতার আসরের বর্ণনা এইরকম :

“একবার চাটুয্যে গিন্নী তীর্থ পর্যটন করিয়া আসিয়া বাড়ীতে তিনমাস ‘কথা’ দিয়াছিলেন ; এই উপলক্ষ্যে তাঁহাদের বাড়ীর বাহিরের আঙ্গিনায় বাঁশের ‘চ্যাটাই’-এর আচ্ছাদন দ্বারা একটি প্রকাণ্ড মণ্ডপ নির্মিত হইয়াছিল। তাঁহার নীচে দক্ষিণপ্রান্তে কথক ঠাকুরের উপবেশনের জন্য একখানি কাঠের তক্তপোষ সংস্থাপিত ছিল। সেই আসনে ‘উত্তরমুখো’ হইয়া বসিয়া কথক ঠাকুর কথকতা করিতেন, তাঁহার দক্ষিণ পার্শ্বে অনুচ্চ টুলে শালগ্রামশিলা সংস্থাপিত হইতেন। কথক ঠাকুরের সম্মুখে মৃত্তিকার উপর প্রসারিত সতরাণিতে বসিয়া শ্রোতার কথা শুনিতেন। আঙ্গিনায় উত্তর সীমায় একখানা খড়ো ঘর ছিল, তাহার সম্মুখে চিক টাঙ্গাইয়া পল্লী রমণীগণ সেই চিকের অন্তরালে বসিতেন। অপরাহ্নে চারিটার সময় কথারস্ত্রের সংবাদ প্রচারের জন্য চাটুয্যে বাড়ীতে কাঁসর-ঘণ্টা বাজিয়া উঠিত। আমরা ছেলের দল সেই শব্দ শুনিয়া কথা শুনিতে ছুটিতাম। বিলম্ব হইলে স্থানাভাব হইতে পারে ভাবিয়া আমরা সবগ্রে সেখানে উপস্থিত হইয়া ‘ফরাস’ অধিকার করিতাম। গ্রামস্থ অধিকাংশ লোক পাঁচটা বাজবার পূর্বেই সেখানে উপস্থিত হইতেন। নিম্নশ্রেণীর লোকেরা মাটীতে বসিয়া নিঃপন্দভাবে কথা শুনিত।”^১

চাঁদোয়া ব্যাসাসন, বেদি, শালগ্রাম শিলা—ইত্যাদি সব আসরেরই সাধারণ অঙ্গ ছিল। কথকের আসন উঁচু হবে, তা পবিত্র, এই কথা পশ্চিমপুরাণে বলা আছে। কথকী পরিভাষায় ‘ব্যাসাসন’ আজও চালু শব্দ। আসনকে কথক প্রণাম করে বসেন কারণ আসন তাঁর পূজার সামগ্রী। বিক্রমাদিত্যের সিংহাসনের উপর গড়ে ওঠা চিবিতে বসে যেমন রাখাল বালক সেরা বিচারকে রূপান্তরিত হয়, ওই আসনের প্রসাদে কথক ঠাকুর হয়ে ওঠেন পরম্পরাগত ব্যাস। তাই ক্ষমতা থাকলে ব্যাসাসন তৈরিও করা হত তাঁরবৎ করে। এক কথকের জবানিতে এই তাঁরবতের কথা শোনা যাক :

...“চাঁদোয়ার তলায় তক্তপোষের উপর গালিচা, গালিচাখানা কাম্মীরী কিন্তু শতবর্ষেরও অধিক তার বয়স। স্থানে স্থানে একটু ছিন্ন হয়েছে। গেলবারে কুস্তমেলায় গিয়েছিলেন বড় বউমা। তিনি কথক ঠাকুরের বসবার জন্য আগ্রা

থেকে সুন্দর ঝালর দেওয়া একখানা রেশমের আসন এনেছেন। সেই আসনখানা গালিচার উপর দেওয়া আছে। পাশেই একটা তাকিয়া। তুলো দেখা যায় নতুন ওয়াড় দেওয়া হয়েছে।”২

কথকতা সাধনার অঙ্গ, ঠাকুরের কাজ। চালতাবাগানে রাধারাণী বিগ্রহের কথা মনে রেখে শ্বিজরাজবাবু মাসাধিককাল কথকতা করেন। মেহের-হরের কথকঠাকুর কালীনাথ ভট্টাচার্য বা প্রবাদপ্রতিম ধরণীধরের মজলিশে শালগ্রাম শিলার সামনে বসতেন কথক। আর আসর বিন্যাসেও থাকবন্দী সমাজের রূপ থাকত, ব্রাহ্মণ ও শূদ্রদের বসার আসন আলাদাই হত। নৈহাটির কাঁঠালপাড়ায় বস্কিমচন্দ্রের বাড়িতে কিশোর হরপ্রসাদের অভিজ্ঞতা দীনেন্দ্রকুমারের মতোই :

“রায় বাহাদুরের বাহিরবাড়ির পাঁচ ফুদ করে দালানের সামনে যে উঠান আছে, সেই উঠানে কথা হইত। কথকের জন্য যেমন সবজায়গায় ইটের বেদি হয়, এ বাড়িতে তাহা হয় নাই। একখানা বড় চৌকি ও একখানা বড় তাকিয়া বেদির কাজ করিত। ঐ বেদির উপর একখানি ভালো গালিচা পাতা থাকিত। সামনে একটি বড় টিপায়ের উপর একখানি পিতলের সিংহাসনে শালগ্রাম থাকিতেন, তিনি কথার প্রধান শ্রোতা। উঠানময় গালিচা ও শতরং পাতা থাকিত; ব্রাহ্মণেরা গালিচায় বসিতেন, শূদ্রেরা শতরং বসিত।”৩

গ্রামের আসর, সাধ্য কি যে ক্ষমতাবিন্যাসের থাককে অগ্রাহ্য করে? এইরকম আসরের মধ্যমাণি হলেন কথক ঠাকুর। দীনেন্দ্রকুমারের বর্ণনায়,

“কথক ঠাকুরের ললাট চন্দনচর্চিত, নাসিকায় দীর্ঘ তিলক, শিখার গ্রন্থিতে একটি ফুল। দেহ রেশমী নামাবলী দ্বারা আচ্ছাদিত, কণ্ঠে পদ্মমাল্য। তিনি তুলটের কাগজে লিখিত ও পাতলা কাষ্ঠের আবরণাবৃত প্রায় এক হাত দীর্ঘ পদ্মখানি সম্মুখে খুলিয়া রাখিয়া মধ্যে মধ্যে এক একটি শ্লোক দেখিয়া লইতেন, এবং তাহা আবৃত্তি করিয়া ব্যাখ্যা করিতেন; কখন গান করিতেন, ব্যাখ্যা উপলক্ষে নানা গল্প বলিতেন; কখনও হাসাইতেন, কখনো কাঁদাইতেন। কথা কহিতে কহিতে শ্রান্তিবোধ হইলে টাঁক হইতে নস্যপূর্ণ শামুক বাহির করিয়া দুই এক টিপ নস্য লইতেন, এবং সম্মুখস্থিত তো-করা গামছাখানি দ্বারা নাকমুখ মুছিয়া পুনর্বার সংগীতের সুরে কথা আরম্ভ করিতেন।”৪

আসর বসতে পারত নানা উপলক্ষে। উৎসবে তো বসতই। আবার তীর্থ পর্যটন সমাধা করে, ছেলের অন্তপ্রাশন, বা শোক দুঃখ উপশমের উদ্দেশ্যে কিছু দক্ষ কথক চাই, আর মুন্সুফদার পাঠক চাই। আদর্শ পাঠক শূকদেব আর শ্রেষ্ঠ শ্রোতা পরীক্ষিৎ। আসর জমাতে গেলে কিছু তৈরি শ্রোতাও চাই। দুঃদে কথক তাই লেখেন,

...“এর মধ্যেই দেখলুম, কোনো ভক্তের চক্ষে জল গড়াবার উপক্রম হয়েছে।

এদের বড় তাড়াতাড়ি ভাব হয়ে যায়। এসব লোক কথক ঠাকুরের খুব প্রিয়। তিনি গুন্টিকয়েক এরকম ভস্তু খুব কাছে নিয়ে বসেন।

তিনি বলেন, এরাই তাঁর যথার্থ সমজদার শ্রোতা। এদের মূখ না দেখে তিনি কথাই বলতে পারেন না।”৬

কিন্তু আসর যতই সাজানো হোক না কেন শ্রোতারা যতই উন্মুখ থাকুক না কেন শেষপর্যন্ত জমানোর দায়িত্ব গিয়ে পড়ে কথকের উপরই। একদিন ঠাকুরবাড়িতে জসীমউদ্দীন এই কথা মর্মে মর্মে বদ্বোচ্ছলেন।

“গল্পের আসরের উপলক্ষ করিয়া হলটিকে একটু সাজান হইয়াছে। কথক ঠাকুরের মত সুন্দর একটি আসনও রচিত হইয়াছে আমার জন্য।”

সেইদিন আসরে রবীন্দ্রনাথ ছাড়া হাজির ছিলেন সবাই। অবনীন্দ্রনাথ, গগেন্দ্রনাথ, দীনেন্দ্রনাথ, রথীন্দ্রনাথ, এবং ঠাকুরবাড়ির সুসজ্জিতা বধূরা। আর গ্রামদেশের জসীম-উদ্দীন এই রকম আসরে যেন ‘বলির পাঠা’।

“গল্প বলিতে বলিতে গল্পের খেই হারাইয়া ফেলি। পরের কথা আগে বলিয়া আবার সেই ছাড়িয়া-আসা কথার অবতারণা করি। দশ পনের মিনিট বাদে দিন্দুবাবু উঠিয়া গেলেন। সামনের শাড়িতে ঝকঝকিতে দোলা দিয়া কোঁতুকমতীরা একে অপরের কানে কানে কথা বলিতে লাগিতেন। কেউ কেউ উঠিয়া গেলেন।”৭

গ্রামের কবি জসীমউদ্দীনের বলার ধরন ঠাকুরবাড়ির শহুরে মনের হৃদয়-সংবাদী হয়নি। আসর জমল না যদিও বহিরঙ্গে গ্রন্থি ছিল না। আবার এই আসরই মহিম কথক বা ক্ষেত্র কথকের কথায় কীভাবে জমে উঠত তার স্বীকৃতি আছে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্মৃতিচারণায়।

“এ যে মহিম কথকের পুঁথি, একটি একটি পাতা পড়ে যেতেন কথক ঠাকুর আর একটি একটি ছবি যেন চোখের সামনে ভেসে উঠত। লাল বনাত একখানা গায়ে দিয়ে বসতেন পুঁথি হাতে, হাতে রূপোর আংটি, হাত নেড়ে নেড়ে কথকতা করতেন। রূপোর আংটির ঝকঝকানি আজও দেখতে পাই।...”

“...ক্ষেত্রনাথ কথকের বলার ধরন চমৎকার, গলাটাও ছিল সুমিষ্ট। দক্ষিণের বারান্দার গায়ে নাচঘরটা তখন অন্তিমতমহিমা গন্ধর্বনগরের মধ্যে শ্লান শোভা ধারণ করেছে। তারই মধ্যে ক্ষেত্রনাথ কথক মায়ের মনের অবস্থানদুযায়ী এক একটি কথা ভাগবত থেকে বলে চলেছেন, এইভাবে গেল প্রায় একবছর।”৮

শ্রোতার মন বোঝা, কথা তৈরি করা আর সুদ্র ও স্বরে কথা বলাই তো কথকের কাজ, আসর সেইজন্য পুঁথিয়ে থাকে। কথা তৈরি করে লেখা হয় পুঁথিতে, আবার পুঁথি থেকে কথা বলা হয়। একাজে পুঁথি কথকের নিজের, অন্য অর্থে আসরের সমুদ্রের। বিষয়টি পতঞ্জলিরও দৃষ্টি এড়াননি। পার্গাণির ‘হেতুমতী চ’ সূত্রের ভাষ্যে প্রসঙ্গটি

উত্থাপিত হয়েছে।^{১৮} সুদূর অতীতে কংস মারা গেছেন অথচ পালায় বলা হয় “গচ্ছ হন্যতে কংসঃ।” বা ‘গিচ’ প্রত্যয় যোগে প্রযুক্ত হয় ‘কংসংঘাতয়তি’ ইত্যাদি। বাচনে অতীতের এইরূপ বর্তমানত্ব (বর্তমানকালতা) নিষ্পত্তির বিচারে মহাভাষ্যে লোক-জীবনের নানা উদাহরণ দেওয়া হয়েছে। শৌভিক (নটশিক্ষক) ও চিত্রকরের পাশাপাশি সমমর্যাদায় উল্লিখিত হয়েছেন গ্রন্থিক (কথক)। বই হাতে গ্রন্থিক ও সামনে জনমণ্ডলী (গম্ভঃ)। এই মাত্র আয়োজন। আর কিছু নেই অথচ কী করে কংস পালাকে প্রত্যক্ষ করানো হচ্ছে? কংস পালা তখন কথকের ‘বুদ্ধি বিষয়ান্ প্রকাশয়ন্তি’, স্ববুদ্ধি বিষয়ভূত; কথকের জ্ঞান ও বোধে কংসহত্যার অস্তিত্ব আছে। অতএব সেই প্রত্যক্ষে বর্তমানকালের নিষ্পত্তি সংগত। টীকাকার নাগেশভট্টের মতে, বর্ণনার গুণে, গ্রন্থনার শক্তিতে কথক তাঁর বুদ্ধি শ্রোতাকে সমর্পণ করেছেন। গ্রন্থগত অতীত বিষয় ‘শব্দোপহিত’ হয়ে কথক ও শ্রোতামণ্ডলীর বুদ্ধিগোচর ও মানসপ্রত্যক্ষ হয়, পুঁথির পালা হয়ে ওঠে জীবন্ত। তাই এবার আসর থেকে আসা যাক পালার বিচারে।

খ. গল্প ফাঁদার মুনশিয়ানা :

চাঁইবুড়োর সাতরাজার ধন যে একমাণিক, সেটা যে পুঁথি এই কথা সবাই জানে, পুঁথিপকাতেও বার বার তাই লেখা আছে। তাই নানা ঝামেলা, নানা নিষেধ। যেমন,

“পুস্তক পড়িতে দিবে সুবুদ্ধির ঠাই।

সবাগুনা গ্রন্থ জেন গোবরায় নাই।”

মাতুলমহাশয়ের বাহির বাটির মণ্ডপে বসিয়া পুঁথির অনুলিপি করা হয়েছে, “ঘাড়ের মধ্যে সাল হইয়া বড় বেতা পাইয়া এহি পুস্তক সমাপ্ত করিলাম—এহি পুস্তক আর কেহর এলাকা নহি”, ১২৪০ (১৮৩৩) সনে শ্রীকৃষ্ণকান্ত এই কথা লিখেছেন। তাই আরেকজনের ভাষায়, “দুঃখেন লিখিতং গ্রন্থং পুস্তকং পরিপালয়েৎ।” তাই এরকম কোনো পুঁথি অপহরণ করার পাপ প্রসঙ্গে অভিশাপ স্পষ্ট :

“এ পুস্তক জে চুরি করে সে শাস্ত্রাড়ির শৃঙ্গার করে” বা “শাস্ত্রাড়্যা হইবেক।” কিন্তু পুঁথি তো লেখা হয় পাঠের জন্য। ১১৮০ (১৭৭৩) সনে জগন্নাথ ঘোষ গদাপর্ব লিখতে গিয়ে বলছেন, “শ্রবণ কারণ ইহা লিখিলাম সব।” “সংস্কর ঘোষ” তাঁকে দিয়ে প্রতিলিপি করাছেন : “জল্প কাড়ি লেখাইল কাড়ি করে ব্যয়।” ১২৩০ সনে শ্রীমদ্ভাগবত (১৮২৩) ‘মহাপোরাণ’-এর পঞ্চম স্কন্ধের প্রতিলিপি করতে গিয়ে রামপ্রসাদ দাস বোস বলেন, “কিন্তু এক নিবেদন। বস্তা ঠাকুর মহাশয়দিগকে আমার শতং কোট নমস্কার। আমার দোশাদোশ ক্ষমা করিবা।”^{১৯}

পুঁথি লেখাতে পুণ্যও আছে, অর্থ প্রাপ্তিও আছে। লিপিকররা জানে পুঁথিতে যে “দোশাদোশ আছে”, “বস্তা মহাশয়েরান” “তাহাকে সুদ্ধ করিবেন।” লেখা শুদ্ধ হবে পাঠে, পাঠ প্রধান, লেখা পড়া নয়, পড়ালেখা। তাই সুবুদ্ধিই পড়তে পারবেন, অন্যরা পড়তে গেলে হয়ে যাবেন গোবর-গণেশ। আগে জানতে হবে কী লেখা আছে,

হৃদয়ে ভক্তি থাকতে হবে, তবে তো পড়া-লেখা হবে। শুদ্ধ মনে পাঠ করতে হয়। তাই একসময়ে পুঁথিকে পুঁজো না করে কথকতার আরম্ভ বা শেষ অকল্পনীয় ছিল। এ হেন কথকতা করার অধিকারের একটা সূত্র পরম্পরা, পেশার ধারাবাহিকতা, এক কথক ঠাকুরের চোখে পুঁথির মাহাত্ম্য ধরা পড়েছে এইভাবে,

“দেখলুম কথক ঠাকুর নবীন হলেও তাঁর পুঁথিখানা নতুন নয়। অনেক দিনের হাতে লেখা পুঁথি...ভাগবতের সবখানি এই পুঁথির মধ্যে ললিতাক্ষরে লেখা আছে। ধারে ধারে তিনপুরুষের হাতের লেখার নিদর্শন, ক্ষুদ্র টিপননী। কোথাও শ্লোকের একপাদ, কোথাও পূর্ণশ্লোক আর কোথাও কোনো দৃষ্টান্তের সংকেত। যারা এই পুঁথি নিয়ে কথকতা করেছেন, তাদের রুচি ও শিক্ষা অনুসারে নানা শাস্ত্রের প্রমাণ পাশে পাশে সংগৃহীত।

“গুরুদেব বলেছেন, পুরাণ যেমন ষট্ সংবাদ না হলে রুচিজনক হয় না, তেমন পুঁথিও তিন পুরুষের না হলে শোধান হয় না। এ সব পুঁথিও তিন চার হাত বদল হয়ে অনেক তথ্য পূর্ণ হয়, আর লিপিকর প্রমাদও সংশোধিত হয়ে যায়।”^{১০}

পুঁথি কথকের নিজস্ব কিন্তু সেই পুঁথি ধারা-বহির্ভূত নয়, পরম্পরায় বিধৃত। পাঠে পুঁথির সার্থকতা, পুরুষানুক্রমে পাঠের মাধ্যমে পুঁথি পোক্ত হয়। অবিরত পাঠে পুঁথির গৌরব বৃদ্ধি পায়, পুঁথি শুদ্ধ হয়। সেই জন্যই আসরে পুঁথির স্বচ্ছন্দ লেনদেন আছে। পুঁথি বলাটাই তো কথকতার একরূপ। কথক কালীপ্রসাদ দেবশর্মার চিঠির বয়ান হল, ‘এখানে আমার পুঁথি আরম্ভ হইয়াছে, কিছুকাল বিলম্ব হইবেক।’^{১১} আবার ১২৫৩ (১৮৪৬) সনের পৌষমাসে কথকতা করতে গিয়ে লক্ষ্মীনারায়ণ দেবশর্মা ঠাকায় পড়েছেন। শ্যামাচরণ ভট্টাচার্যকে অনুরোধ করে তিনি লিখেছেন, “কিন্তু লক্ষ্যাকাণ্ড পুস্তক এখানে অপূর্ণ হইয়াছে যতবৎ যদুনিলাম জে আপকাদের গ্রামে এই পুস্তক আছে আপনি মম পিতা অনুগ্রহ পিকাস করিঞা ঐ পুস্তক এই লোক সমীভারে পাঠাইঞা দিব।”^{১২}

যেহেতু পুঁথি পাঠ করা হয়, তার চাহিদা আছে, তাই সবসময় মালিকের কাছে পুঁথী ফেরত যোগ্য। তাড়া খেয়ে ১২১৫ (১৮০৮) সনে মাণিকচন্দ্র দেবশর্মা “যদু মঞ্জরী ঠাকুর জীউ” স্থানে একরায়নামা লিখতে বাধ্য হইছেন। “সন ১২০৫ পাচ সাল শ্রীযুত পিতা ঠাকুর আপনকার স্থানে হইতে শ্রীশ্রীভাগবৎ পুঁথী লইয়া আসীয়াছিলেন। সন ১২১৩ সালে সেই পুঁথী নতুনবাজার মোকামে পাট করিয়া এখানে ছিল সে পুঁথী লইয়া সহরের সেবকবাটীতে রাখিয়াছি প্রকাশ করিয়া জাইবার কালে সহর হৈতে পুঁথী লইয়া আপনকার নিকট দিবো।”^{১৩}

পুঁথি না হলে পাঠ হবে না। পুঁথি পরম্পরাগত কিন্তু পুঁথির মালিক আছে, তার উপরে কোনো না কোনো স্বত্ব আছে। পরম্পরার কাঠামোতে পুঁথির চরিত্র নির্ধারিত হচ্ছে, অথচ বিন্যাসে থাকছে বিন্যাসকারের দক্ষতা, নিজস্বতা। পাঠ সামূহিক, পুঁথিও

সামূহিক পাঠের জগতে প্রোথিত, তার সার্থকতা সেখানে। তাহলে কথকের নিজস্ব মন্বিশয়ানা কোথায়, তার সরহন্দই বা কতদূর সেটা বিচার্য হয়ে ওঠে।

যেভাবে পাঠকের রূপান্তর ব্যাখ্যাকার ও কথকের মধ্যে হয়েছে, ঠিক সেইভাবে কথকের পদ্ধতি রচনাও, মূল গ্রন্থের অনুসারে, একটি মাধ্যমিক স্তরের মধ্য দিয়ে দানা বেঁধেছে। এশিয়াটিক সোসাইটিতে রক্ষিত পুঁথি আলোচনা প্রসঙ্গে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় এই জাতীয় রচনার কথা উল্লেখ করেছেন। রামায়ণ, মহাভারত বা ভাগবত আয়তনে বিশাল, নানা শ্লোকে ও জটিলতত্ত্বে পরিপূর্ণ। ফলে কোনটা রাখব আর কোনটা বাদ দেব, সেটা কথকরা ঠিক করতেন, মূল গ্রন্থ থেকে বেছে বেছে আখ্যান ও শ্লোক সাজিয়ে একটা নির্বাচিত সংকলন তৈরি করতেন। রম্যাপতি এইভাবে উত্তরাকাণ্ডের কথা সংগ্রহ করেছেন, কেশব পণ্ডান ভট্টাচার্য এইভাবে ভাগবতের কথা চয়ন করেছেন, গালভরা নাম দিয়েছেন “হরি-ভক্তি তরঙ্গিনী”। উনিশ শতকের গোড়ায় গণেশ বিদ্যাবিনোদ একই পদ্ধতিতে ৫৯০টি শ্লোকে রামায়ণের আদিকাণ্ডের কাহিনীর চম্বক দিয়েছেন। এই সংগ্রহ গ্রন্থগুলি আখ্যানের মূল কাঠামো, কোন কোন বিষয় আলোচিত হবে তার নির্দেশ। এই কাঠামোর উপরে প্রলেপ দেওয়া হয়, তৈরি হয় কথা এবং আখ্যান। এই সংগ্রহগুলি লেখা হত সংস্কৃতে। মূল শ্লোক থাকত, সঙ্গে সঙ্গে সহজ সংস্কৃত গদ্যে গল্পসারও দেওয়া হত। সম্ভবত ওইগুলির উপর ভিত্তি করেই দিবাকালের পাঠকে প্রথমদিকের কথকরা সন্ধ্যাবেলায় লোকের সামনে অনুবাদ করতেন; এই জাতীয় সংগ্রহ করার প্রথম উদ্দেশ্য হয়ত তাই ছিল।^{১৪} কথকের ভূমিকা প্রসারিত হবার সঙ্গে সঙ্গে এই সংগ্রহের কাঠামোও পরিবর্তিত হয়।

‘আদিকাণ্ড’ কথা পুঁথিতে নানা আখ্যানের চম্বক দেওয়া আছে, ‘কথকস্য কথা’ যেমন গঙ্গাবতরণ, “রামাদয়ো মিথিলান্নাং চলিতাঃ।” আবার তারই সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হচ্ছে জটায়ু-মারীচবধ অথবা “জনস্থানে রমতা রামেন শূর্ণথা বিরূপিতা।” এমনভাবে বাক্যবিন্যাস করা হচ্ছে যাতে করে বাংলায় রূপান্তরিত করতে কোনো অসুবিধা না হয়, “সরযুতীরে কোষলো নাম জনপদন্তু অযোধ্যানাম নগরী”। আখ্যানের কাঠামোর সূত্রটি সাজানো হয়ে রইল।^{১৫}

আবার এইরকম সহজ সংস্কৃতে আখ্যানভিত্তিক আরেকটি পুঁথির মাঝে জনকের মূখে একটা সংস্কৃতগন্ধী বাংলা শ্লোক জুড়ে দেওয়া হয়, বোধহয় শ্রোতাদের কাছে লাগসই শোনাতে পারে। যেমন,

“জনক উঃ জগদম্বার শ্লোক

নম অন্নদা অন্নপ্রদান করা। ত্বয়ী দিনদয়াময়ী দ্বুংখহরা।

হে শত্ৰুভক্ষরী সৎকট শাস্তিকর। জগদম্বে জগন্মাতা যোগধরা ॥

হে কাশীশ্বরী শঙ্করি অন্নদাতা।

শমনস্য ভয়ে সদা রক্ষ মাতা ॥

ত্বয়ি শিব সনাতনী শক্তি প্রদা।

এ অশস্ত্রজনে বরদে বরদা ॥

অতি অকৃতি দন্মর্মতি দিন হীনে ।

ওগো দিনর্ময় কর দ্রাণ দিনে ॥“১৬

আবার আরেকটি ‘সংগ্রহের’ পদ্ধতিতে “দেশে দেশে কলগ্রাণি”র মতো রামায়ণের বিখ্যাত শ্লোকগদ্যলির মধ্যে হঠাৎ কুস্তকণের একটি সংলাপ বিচ্ছিন্ন পাতায় দেওয়া হল :

“কুস্ত উঃ দিকপালান্ ভক্ষয়িষ্যামি ২ পাবকং । দেবান্ বিপ্রান্ বধিষ্যামি।... পাতয়িষ্যামি নক্ষত্রং মহীতলে । শতক্রতুং বিজেয্যামি পশ্যামি বরুণালয়ং । পর্বতান চতুর্য়িষ্যামি । দারয়িষ্যামি মেদিনীং । মহাদেবং বধিষ্যামি পশ্যাদ্য বিক্রমং মম ।” বলাবাহুল্য, পাঠের মজলিশে সংস্কৃতে লেখা এই ধরনের সংলাপকে মধুখে মধুখে বাংলায় করে দেওয়া আদৌ দুঃসাধ্য নয় । এই বিশেষ সংগ্রহ পদ্ধতিতে স্থানে স্থানে বিচ্ছিন্ন পাতায় বাংলায় লেখা সাটও আছে, যেমন, “অশ্বমেধ যজ্ঞাবসানে অযোধ্যা মণ্ডল মধ্যবর্তী সৌধ নিকর মণ্ডিত প্রাঙ্গণে বিবিধ ক্ষৌমরাদি [?] বসনোনির্মিতাসনোপরি নৃপ নৃপতিগণ স্ত্রিয়গণ দিব্যসিংহাসনোপবিষ্ট...গাওরে কি রামায়ণ গান শিখেছো।”^{১৭} সহজ সংস্কৃতে লেখা গদ্য সংলাপের পাশাপাশি বাংলা সাটও লেখা হচ্ছে, সংগ্রহের কাঠামোয় নানাভাবে যোজনা চলছে, যোজনা কাঠামোকে রূপান্তরিত করছে স্বতন্ত্র পদ্ধতিতে । এই রদবদলের প্রক্রিয়া ধরা পড়ে এক কথকের লেখায় :

“আমি মনে করেছিলুম, ভাগবতের মূল শ্লোক আর কোন প্রসিদ্ধ ব্যাখ্যা বোধহয় পুঁথিখানায় আছে । ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করে জানলুম, তা নয় । মাঝে মাঝে কোথাও ভাগবতের মূল শ্লোক আছে, আর প্রায়শঃ নানা শাস্ত্রের প্রমাণ, উপাখ্যান আর তার সঙ্গে দৃষ্টান্তগুলির উল্লেখ করা হয়েছে । দেখলুম, কয়েকখানা পাতায় সমাসবহুল সুদীর্ঘ বাক্যাবলীর সমষ্টি আছে । সেগুলি মূল পুঁথির অংশ নয়, কিন্তু খোলা পাতা হিসাবে ঐ সঙ্গেই আছে । ঠাকুর বলেন, ঐগুলি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় । এই পাতাগুলির মধ্যে কোনটা বনের বর্ণনা, কোনটা পর্বতের বর্ণনা আর কোনটা রাজসভা বা নগরের বর্ণনা । এই বর্ণনাগুলো কথা জমানোর জন্য খুব প্রয়োগ হয়ে থাকে ।”^{১৮}

পুঁথিগদ্য থেকে সংগ্রহ, আবার সংগ্রহ থেকে নানাভাবে প্রসারিত ও যোজিত হয়ে কথকের পুঁথি—এই স্তরে উপনীত হবার প্রক্রিয়ায় যোজনার কয়েকটি সাধারণ সূত্র ধরা যেতে পারে । প্রথমত, আখ্যান বিন্যাসে আমরা লোককথা ও পৌরাণিক কাহিনীর মিশ্রণ দেখি, দৃষ্টান্ত হিসাবে লোকগল্পকে বার বার হাজির করা হয় । এই কায়দাকে অগ্নি-পুঁথির ভাষায় বলতে পারি ‘কথান্তরম’, এক কথার মধ্যে অন্য কথা ঢুকিয়ে দেওয়া যাতে করে মূল কাহিনীটা জোরদার হয় । বৈপায়ন ব্যাস বনে যাচ্ছেন । মায়ের কান্না শুনলে থেমে গেলেন । মাতৃভক্ত । তাই মাকে গল্প শোনালেন । বলা হল কিন্তু “ইতিহাসং শৃণু” । ঠিক যেমন ঘটেছিল, ঠিক তাই । শুদ্ধকর্মতি বামুন, তার বৃদ্ধা মা এবং হিংসুটে বউ । “ইতিহাসং শৃণু” পরেই ভাষা বদলে গেলে, তার রঙমানি হয়ে

গেল অন্যরকম। মায়ের বিরুদ্ধে বৌ-এর হিংসা ও স্বামীকে উত্তেজিত করার নমনা :
“ওর স্ত্রী বলে মলো আমি কেয় নই। বানে ভেসে এসেচি। শাশুড়ি বড়ি ঘরের
বালাই। থাকতে সুখ হবে না। দূর করে দেবো। তবে বাঁচবো।”

আবার রাশ্রে স্বামীর পা টেপার সময়,

“চকের জল শুদ্ধমতির পায়ে পড়লো। ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলো। কেন ?
প্রিয়ে কাঁদ কেন। কি জন্যে স্ত্রী যদি কাঁদে পুরুষ টো ব্যস্ত হয়। কি চাই
বল। আমি মলেই বাঁচি। আমার কপালে আর সুখ নাই। পাড়া
প্রতিবেশিনীরে দূদে ভাত খায় একদিন দুগ্ধো অন্তে খেতে পেলাম না। আর
শোনার কি রূপোর আঁচড়া গায়ে হলো না। বলে ডুকুরে ২ কাঁদচে। হাবি
কাঁদসনে, সব দেবো।”

লোককথায় ঝগড়ুটে বউ-এর রূপও এসেছে। স্বামী রোজগারে বেরুলে শাশুড়ির প্রতি
স্ত্রীর মর্দতি,

“প্রাচীনা বলে ও বোমা বড় ক্ষুধা পিপাসা দেয় না খাই। ও ঘরে’ হতে
বেরিয়ে ভিন্নরুলের চকের মত মৃদু ফুলিয়ে বলে মাথা নেড়ে মরহ, আকন্দ
ডাল [sic] মৃদু দেবমেচো তোমার মরণ নাঞ মা ককু’ডর’ প্রেমায়ে পেয়েচো
যম বা তোর পার্জি পুঁতি ভুলে গেছে।”

শাশুড়ি ডাইন, বনে ছেড়ে দেওয়া উচিত, তাই স্বামীকে বলা হয় ও তুক করা হয়,

“ওমা কি হবে? মরণ কেন হলো না। পাড়ায় কাকে খেয়ে এসেচেন।
নজ্জায় মৃদু পাততে পারি না। আমার সোনার ঠাকরুণকে কে আড়ি করে
চোষকা মন্ড দিয়ে গেছে হে।...তুমি বাঁচালে হয়। সাবধানে থেকো। ওয়া
হলে নাকি আপনার ঘরেই আসে। আমাদের কপালে জা থাক তুমি বেঁচে
থাকো। হাতের কগাচি থাক।...এই বলে সাঁড়ের গোবর কেঁচোর মাটি
পিপ্দিমের শিশ। কপালে দিলে আর ফু ২ করে বৃদ্ধে ফুৎকুড়ি”

স্বামীকে ভিজিয়ে বনে শাশুড়িকে পাঠাবার পরে বউয়ের আনন্দ আর ধরে না।

“দূর করেচি ঘরের আপদ। এখন একলা একেশ্বর। সৃষ্টিধরী হয়ে
বসেচি। খাবো দাবো নাচবো গাবো।...বার বার পথ দেখচে। স্বামী ফিরে
এলে হয়। আর আফ্লাদে মাজখানাটা ভেগে ২ ফেটে ২ পড়ছে।...
জেন ফুটি ফটা কাঁকুড় ফটা ফুটকড়াই আটখানা হয়ে দুটি বড়ো আঙুলে
বেড়িয়ে বেড়াচ্ছে পৃথিবী সরে দেখচে।”^{১৯}

শৈবপায়নের জন্ম ও জীবনবৃত্তান্তের মধ্যে এই কাহিনী নিয়ে আসা হল মাতৃভক্তির মাহাত্ম্য
প্রচার করতে; সত্যবতীর প্রতি ব্যাসদেবের চিরন্তন আনুগত্যকে প্রতিষ্ঠিত করা উদ্দেশ্য।
কিন্তু গল্পের ভাষা ও বস্তুর অভিমুখ ভাগবতী আখ্যানের বিপরীত, লোকগল্পের
মেজাজ ও ছক স্পষ্ট। তাই মার্গ ও লোকের মিশ্রণ দেশজ রীতির জন্ম দেয়, সেই
রীতিতে কথকতা করা হয়। আধুনিককালে শিবজরাজবাবুও এই রীতির ব্যতিক্রম

নন। রামের সভায় লবকুশ রামায়ণ গাইতে এসেছে। সকালে তারা অযোধ্যানগরী ঘুরে বেড়াচ্ছে। তখন ময়ূরার দোকান থেকে বিনা পয়সায় মিষ্টি খাওয়ার যে ফন্দি লবকুশ বার করেছিল, তা আমাদের ছেলেবেলার শোনা গল্প : ‘বাবা, মাছি রসগোল্লা খাচ্ছে’ বা ‘পিপড়ে রসগোল্লা খাচ্ছে।’^{২০} আসরে বাচ্চারা গল্পটা শুনলে হেসে ফেলে, আমাদেরও ছেলেবেলার কথা মনে পড়ে যায়, কাহিনীতে মৌতাত ধরে যায়। কিন্তু যতই কথান্তর হোক না কেন, স্মৃতি যতই ছাড়া হোক না কেন, গোটাবার কায়দা জানতে হবে, মূলে ফিরতেই হবে।

আখ্যানের মধ্যে চরিত্রায়নের জন্য ছোট ছোট ‘চুর্টকির’ মতো রচনা থেকে যায়। এই-গদ্যলিটে থাকে লৌকিকের স্পর্শ, কথকের উদ্ভাবনা। কয়েকটা নিদর্শন দেওয়া যেতে পারে। দেবকীর প্রথম সন্তানকে ভাগবতী কংস বধ করতে অনীহা প্রকাশ করে। পরে নারদের কাছে দৈবী চক্রান্তের কথা শুনলে সব ক’টি সন্তানকেই হত্যা করল। কথক এই সূত্রকে নিজের মতো করে সাজিয়েছেন। কংসের কাছে বসুদেব প্রতিশ্রুত, তাই দেবকীর গর্ভের প্রথম সন্তানকে নিয়ে এসেছেন।

“কংস উঃ সদ্যজাত সন্তান, অচ্ছিন্ন নাড়ী। রত্নধিরাস্ত্র এ সন্তান লএ সভায় কেনো। তুমি কি খেপেচো নাকি।”

বসুদেব প্রতিশ্রুতির কথা মনে করিয়ে দিলেন। তখন,

“ওহে বসুদেব ও কথাটা আমার মনে নাই। মিথ্যাতে তোমার এতো ভয়। আমারাত প্রতিদিন কতো মিথ্যা বলে থাকি। ওহে বসুদেব তোমার বাড়িতে কি সত্যের গাচ আছে। তোমাকে আমার পিণ্ডং বলে জ্ঞান ছিলো। এখন জাল্লেম জে তোমার তুল্য মূর্খ আর জগতে নাই।...আকাশবাণি হয়েছিলো। দেবকীর অষ্টম গর্ভের পুত্র হতে আমার বিনাশ হবে। প্রথম জাতো শস্তান কি অপরাধ করে। তোমার হৃদয়ে কি দয়া নাই। লএ জাও ২ গৃহে লএ যাও।”

ভাগবতী কংস ও কথকতার কংসে প্রভেদ প্রচুর। কংসের মুখে এইরকম বিচারবোধ তাকে অনেক স্বাভাবিক করেছে, সত্য ও মিথ্যা বিচারে দৈনন্দিনতার ছাপ লেগেছে। আবার ‘টাইপ’ চরিত্র হিসাবে নারদকে আনা হয়েছে, তার পরামর্শে কংস শিশুকে হত্যা করল। পরামর্শটাও একটি লৌকিক হিসাবের ধাঁধা। কথকতো পুঁথিতে বেশ বিস্তৃত করে লিখেছেন :

“নারদ উ। বটে তুমি অষ্টম কারে বলো। কংস উ॥ সপ্তমের পর জে তারে অষ্টম বলিল। নারদ উ॥ সপ্তমের পর তারে অষ্টম বলো। ভালো আট্টা মণি আনওয়েন করি দেখি। কংস মহারাজ তৎখনাং মণি আনওয়েন কল্লেন। নারদ উ॥ এখানে রক্ষ্যা করে গণনা করো দেখি। কংস গণনা করতে লাগলো। একো মণি ত্ চতুঃ পঞ্চ শষ্ঠ সপ্তম অষ্টম, এইটি অষ্টম হলো। নারদ বলেন বটে ওইটা বাদিকে রেখে গণনা করো। কংস পুনরায়

গণনা করে। পূর্ববৎ এক বিবৃতি চন্দ্র পঞ্চ শষ্ঠ সপ্তম অষ্টম। আশ্রয় সপ্তমটা অষ্টম হলো জে।...এইরূপ পণপূরণ ন্যায়ে দ্বারায় দেবশী নারদ শকলগদুলোকে অষ্টম করে দেখালেন। পণপূরণ ন্যায় কেমন। জেমন একগুণ্ডা দুই গুণ্ডা করে কুড়ি গুণ্ডা করে এক পণ হলো। আবার সেই সকল একত্র করে পূনরায় গণনা কত্তে গেলে আবার এক গুণ্ডাতে কুড়ি গুণ্ডা হয় সেইরূপ সকলগদুলি অষ্টম হলো।”

শ্রোতার কৌতূহল উস্কে দিকে কথক নিজে লেখেন “বলো দেব ঋষি-নারদ কংসকে এমন উপদেশ কেন করলেন।” কারণ লোকবিশ্বাস ও দেবরোষ। “মৃতবৎশা” শ্রী নাকি শীঘ্র গর্ভধারণ করে তাই ছিট সন্তান বিনাশ হলেই “অবিলম্বে বৈকুণ্ঠনাথ হরি ভূতলে অবতীর্ণ হবে।” আর “কংস বালক বিনাশ করে প্রচুর পাপ সঞ্চার করুক। তাহলে শীঘ্রই জমালয়ে গমন করবে।”^{২১} যুক্তির ফাঁক নেই। পরিকল্পনাটিও নারদের লোকগ্রাহ্য কণ্ঠদুলে স্বভাবের সঙ্গ মিলে যায়, তাঁর পাতা ফাঁদে বোকা কংস পা দেয়, দৈবী জগতের চক্রান্ত রূপান্তরিত হয় লৌকিক জগতের প্যাঁচ-পয়জারে। আর সেই বুনটটি কথক নিজেই বানিয়ে তোলেন, পৌরাণিক আখ্যানের টানেতে লোক-অভিজ্ঞতা সহজে খাপ খায়।

পৌরাণিক আখ্যানের ধারার মধ্যে এইরকম ছোট বুনটের কাজ, গায়কীর মতো কথকী ‘গিটিকারি’ পালায় গতি সৃষ্টি করে, বৈচিত্র্যও বাড়ায় দৈবী চরিত্রের মহিমায় মানবিক মাত্রা যোগ করে। এই বুনটের কাজগদুলি ঘটনা ও ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াভিত্তিক, মূল কাহিনীর ইতি-উত্তিতে আবদ্ধ। লঙ্কায় রাম সীতাকে অগ্নি-পরীক্ষার আদেশ দিয়েছেন। কথকের বর্ণনায় হনুমান সেই মনুহুতে অকুস্থলে নেই। কুবেরের উদ্যান থেকে ফুল আনতে গেছে। ফিরে এসে সাজানো চিতা দেখে হনুমান চটে আগুন।

“এই কথা শ্রবণ করে হনুমানের ভাবোন্মাদ হল। আমার মা অশ্রুতি। অশ্রুতি বলে রাম তারে ত্যাগ করেছেন আজ দেখিবো রাম কেমন বির।”

পদার্থে হনুমান বলে, “রামং যমগৃহং নয়ামি।” শালগাছ তুলে রামকে আক্রমণ করেন, লক্ষ্মণের সঙ্গে লড়াইয়ে প্রবৃত্ত হন। অনুযোগ করেন,

“জদি মাকে প্রতিপালন কর্তে পারবে না তবে আমার কেনো বঞ্চে না। আমি ভিক্ষা করে মাকে খায়াতেম।” রামের সব কৃতিত্ব হনুমান নাকচ করে এইভাবে।

“জদি বলো রাম হরধনু ভগ্ন করেছেন। শে ধনু বহুকালের পুরাতন জিন্ন হয়েছিলো।”^{২২}

হনুমানের এই মূর্তি প্রচলিত তুলসীদাসী, বাল্মীকি বা কৃষ্ণবাসী রামায়ণে নেই, সুদ্রাকারেও উল্লিখিত হয়নি। কিন্তু ভক্ত হনুমানের এই প্রতিক্রিয়া স্বাভাবিক লোক-গ্রাহ্য, ওইরকম এক পরিস্থিতিতে রামের অপ্রত্যাশিত আচরণে যে নাটকীয়তার সম্ভাবনা ছিল কথক সেই সুযোগ ছেড়ে দেননি। ভক্ত হনুমানকে দিয়ে রামের আচরণের প্রতিবাদ কথক করিয়েছেন। ন্যায়পরায়ণ ও সীতাভক্ত বলে হনুমান লোকগ্রাহ্য চরিত্রে মিশেও গেছেন।

এইরকমই আরেকটি টুকরো ঘটনার কথাও কথক উল্লেখ করেছেন, একাটি ভাবকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য। স্বর্ণলঙ্কার লক্ষণ মোহগ্রস্ত, অযোধ্যায় ফিরতে ইচ্ছুক নন। তাই লঙ্কার বাইরে বেড়াতে গিয়ে দেখলেন যে মাথায় আগদ্বনের পাত্র ও পায়ে লৌহবর্ম পরে একদল কৃষক চাষ করছে। মাংসাশী পাখি ও বিষধর সাপের উপদ্রবের জন্য তাদের এইরকম বেশ। তখন,

“লক্ষণ উ ॥ এইস্থানে জদি এতো ভয় এস্থান ত্যাগ করে অন্যত্র বাশ করো না। কৃশকেরা বলেন শে শত। কিন্তু জননী জন্মভূমিষ্ট স্বর্গদীপ গরীয়সী। এই নিমিত্ত আমরা এস্থান পরিত্যাগ করে অন্যত্র গমন করতে পারি না, লক্ষণের মনে? আমরা জননী জন্মভূমি আছে।” ২৩

এইভাবে নানা জায়গা থেকে শোনা, তুলনামূলকভাবে অপ্রচলিত সূত্র থেকে নেওয়া বা নিজেরই তৈরি করা গল্প কথার বদনটে ধরা থাকে, অভিযোজনের মধ্য দিয়ে কথকের বৈশিষ্ট্য বোঝা যায়। আখ্যানগদ্যলোর মাগী'য় কাঠামো, এইরকম সংযোজন ও কথান্তরের ফলে লোকভাবনার নানা স্তরে প্রসারিত হয়, নিজেরা। পরিবর্তিত হয়ে দেশজ রীতির অঙ্গ হয়ে ওঠে। হুতোমি ঠাট্টায়, কথকঠাকুর বস্ত্রত যা বলেন “সকাল কাশিরাম খুড়োর উচ্ছট ও কোনটা বা স্বপাক”।

কথার অন্য লক্ষণ বিচারে দশুী নির্দেশ দিয়েছেন যে প্রাকৃতও কথা গ্রাহ্য। ভারতের শ্রেষ্ঠ কথা সংগ্রহই তো লেখা হয়েছে, “ভূতভাষায়”। যে কোনো কথকতার পদ্ধতিতে নানা ভাষার সমন্বয় চোখ এড়াবার নয়। একাদিকে সমাসবদ্ধ দীর্ঘ বাক্য, বর্ণনা, সাট অন্যদিকে যথাস্থানে সুযোগ মতো পরিস্থিতি বুঝে একেবারে লোকজ সংলাপ। একটা নজির দেওয়া যাক :

“ক্রমশঃ দেবকীর গর্ভ বর্দ্ধিত হতে লাগিল। একদা মথুরাবাশিনী স্ত্রী শকল কুম্ভকক্ষে জন্মনার জল আনয়ন করিতে গমন করিতেছে পৃথিমধ্যে মনে ২ ‘অ দিদি চল ন্না একবার দেখে যাই কারাগৃহে বসুদেব দেবকী কি কচে’। অগ্নি জ্ঞাং লোকের ভাষায় হগ, আর মন্দই হগ, না দেখলে যাবেন না।’ পৃথিমধ্যে কুম্ভ রক্ষ্যা করে কারাগৃহস্থারে গমন করে স্থারের উভয় পার্শ্বে হস্তাপর্গ করে দাড়িয়ে দেখেন দেবকীর বসুদেবের রূপেতে করে কারাগৃহ জেন আলৌকিত হএচে। দেখে বলেন মাগো বসুদেব রূপেতে জেনো ফেটে মরচে। মাগির কিরূপ হএচে। মাগিদিকে চাও জায় না। মিনশে জেন রূপের কাঁদি হয়েছে। কোন স্ত্রী বলেন তা অমন হয়। জতো বোটা বোটি মরে বাপ মাএর রূপ হয়, গতর লাগে।” ২৫

বর্ণনা সাধুভাষায়, তৎসম শব্দযুক্ত সংলাপে শব্দ প্রয়োগের ধরন একদম অন্যরকম ‘মাগি’, ‘গতর’, ‘রূপের কাঁদি’ ইত্যাদি প্রাকৃত শব্দ প্রয়োগে বাছ-বিচার নেই, যা কথায় স্বাভাবিক, পদ্ধতিতে হুবহু তাই বসানো হয়েছে। এই স্বচ্ছন্দ ‘গদ্যরূচডালি’ কথকতার ভাষার জোর; কেবল স্ত্রীদের সংলাপেই নয়, পরিস্থিতি বর্ণনাতোও এর লাগসই প্রয়োগ

দেখা যায়। বৃন্দাবন থেকে মথুরায় কৃষ্ণকে আনার জন্য দূত চাই; দূত খোঁজার আয়োজনের বিবৃতি লক্ষণীয় :

“বৈষ্ণব না হলে বিশ্বাস করে আসবে না। একজনা বৈষ্ণব দেখ। এই সন্নে মালা ছিঁড়ে তিলক পুছে সব পলায়ন। একজন দেখে বলেন ঐ বৈষ্ণব কিহে তুমি বৈষ্ণব নও। কোন পদ্রুমেই নই। অপ্রলাপ কথা জাকে জানয় তাই বল। উহুঃ মসয় পাওয়া যায় না। একজনা বলে অকুর মালা হাতে করে না। হাঁ হাঁ ডেকে আন। উনি শূনে বাড়ী গিয়ে লুকাইত। অকুরের শ্রী বলে বড় হাঁপয়ে এলে জে। চূপ কর ২। তুমি হাতের কগাছি রাখবে না খুন্নেবে বলত। কংস দূত ধর্তে আসছে। তুমি জেন প্রকাশ করো না। আ মলো পোড়া কপালের দশা। তেমন মেয়ে নই বলবার জন্য মিচ্ছি। এমন কালে কংস দূত আগমন কোথা গো অকুর বাড়িতে আছ।” ২৫

সংলাপ ও ভাষার বিন্যাসে নাটকীয়তা সৃষ্টি করা হল। মথুরায় দাস ও শোরগোল, সেই মেজাজের সঙ্গে তাল রেখে ভাষা ও সংলাপ সাজানো হচ্ছে যাতে করে বলার সঙ্গে সঙ্গে ওই ভাব কথার বাঁধনিনতে ধরা পড়ে। বিবৃতির বয়ানটা প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ নয়। ‘যদুশ্রেষ্ঠ’ কংস-পার্শ্বদ অকুর রূপান্তরিত হচ্ছেন ভক্ত কিন্তু ভীরু বৈষ্ণবে।

আবার আতীর ও আসন্ন অপমানের ভয়ের মেজাজকে ধরা হয়েছে সরাসরি সংস্কৃত শ্লোক ও টেনে টেনে বাক্য রচনার মিশেলে। পাশাখেলায় পাণ্ডবরা পরাজিত হবার পর একটি পদার্থে দ্রৌপদীর অবস্থা ও মানসিকভাবের পরিচয় দেওয়া হয়েছে এইরকম ছন্দে :

“মহারাজ জন্মেজয় কি কর্বো। রাজসূয়াবভূমে জনেন মহাক্রতৌমন্ত্রপুতেন শিক্তাঃ। সা পাণ্ডবানাং পরিভূয়বীষবলাং প্রমৃষ্যাধৃতারিষ্টয়েন। উ ॥ মৃত্যু উপস্থিত বদ্বি ॥ কি হলো রে ॥ বাড়িতে ডেকে এনে এই করলে। ধন নিলে ॥ এই অপমান ॥ গোবিন্দাভিষিক্ত এ কেশ। কালশাপ দংশিলে সে বিষহাগ পাবি নে ॥” ২৬

কথকতায় ভাষা বদলের এই নজরকাড়া রীতি বর্ষিকের সমজদারিতে ধরা পড়েছে। তাঁর মতে, কথকতার নানা অঙ্গ, ব্যাখ্যা, বর্ণনা, পদাবলী ও গান। প্রথম অঙ্গে ভাষা সংস্কৃতানুসারী, জমাট ভাবে শিখিল করে। পরিস্থিতি বর্ণনায় আবার ভাষা প্রয়োজন-বোধে জমাট, সংস্কৃত-ভিত্তিক। পদাবলীর উদ্দেশ্য ঝঙ্কার ও লালিত্য তৈরি করা; রসানুযায়ী গানের ভাষার রকমফের হয়। কিন্তু এই সবের মধ্যে কথকতার ভাষার নিজস্বতা দেখা যায় পরিস্থিতি বর্ণনায়, “রসোদ্দীপন” যার লক্ষ্য। বর্ষিকমহেন্দ্রের নিজস্ব কথায় :

“ইহার বাক্য (Sentence)-গুণিল ক্ষুদ্রাবয়বের হয়, অনেক ক্রিয়াপদ অনুক্ত থাকে, অনেক ক্রিয়া বিশেষণও অনুক্ত থাকে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাক্যের পর দীর্ঘচ্ছেদ থাকে, কখন কখন কোন বিশেষ কথায় শ্রোতার (বা পাঠকের) মনঃসংযোগ করার জন্য পুনরাবৃত্তি থাকে, আর কথকদের স্থানে এই ভাষার সহায়কারী নানা

ভঙ্গী থাকে। এই ভাষা হৃদয়চ্ছেদ করিয়া পাটে পাটে বসিতে থাকে।... ইহাতে ছোট ছোট জমাট বাক্যের গাঁথনি থাকে। জমাট পদগুলিকে পৃথক করিয়া লইলে সংস্কৃত পদ বলিয়া বোধ হইতে পারে, কিন্তু সমস্ত গাঁথনি ভাগবতের ন্যায় জটিল রীতি যুক্ত নয়।” ২৬ক (নজরটান আমার) কথকতার রওয়ানি ভাষার এই গাঁথনির জন্য সম্ভব হয়েছে।

কথকের মনুশিয়ানার আরেকটি পরিচয় হল তত্ত্বকথা আলোচনা করা, নানাভাবে সামাজিক মূল্যবোধ ও আচারের সঙ্গে কাহিনীকে সংযুক্ত করা। সরাসরি কথক ব্যাখ্যার মাধ্যমে, প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে, এই জাতীয় ক্ষেত্র তৈরি করতে পারেন বা অনেকসময় চরিত্রেরা সংলাপের মাধ্যমে নানা পরিস্থিতির উপর মন্তব্য করেন। যাকে চিরন্তন ও শাস্বত বলে মনে করা হয়, তাকে দৈনন্দিনতার মধ্যে মেশাতে হবে, তা না হলে কথকতার সামাজিক গ্রাহ্যতা বিপন্ন হবে, যৌথের ধারণার সঙ্গে কথকতার বিঘ্নুক্তি ঘটবে।

শিবের বিবাহের পর শিব বাড়ি যান না, ঘর জামাই হয়ে থাকেন, মেনকার জ্বালার অন্ত নেই। কথক রামপদ ভট্টাচার্য নিজে একটি বাক্যে প্রেক্ষিত ঠিক করেন, পরে মেনকার উক্তি বসান :

“এখন শশুর বাড়িতে অধিককাল থাকলে সকলে বিরক্ত হয়। একদা মেনকা উ॥ আমি একলা মেয়েমানুষ কদিক করবো। প্রত্যহ আর জামাই আদর কর্তে পারি না। উমাও ঘরের একখানি কাজ করবে না। কেবল দ্বুজনে খাবেন আর ঘরের ভিতর রাতদিন বসে থাকবেন, দেখে দেখে গা জ্বলে যাচ্ছে। জামাইটি মানদুষ হয় না। কেবল ভাঙ ধুংরা খাবে আর চিরকাল শশুরবাড়ি বসে থাকবে। এদের উপায় হবে কি।” ২৭

“ইতিহাসং শৃণু”, এই বললেন একজন কথক। “এখন শশুর বাড়িতে অধিককাল থাকলে সকলে বিরক্ত হয়”, এই কথা লিখলেন আরেকজন। অতীত ও বর্তমান দুটোই বলা হতে পারে, পৌরাণিক সময়ের মধ্যে ঢুকে পড়ে। বর্তমানকে মাথায় রেখে মেনকা উচ্চারণ করেন লাখ কথার এক কথা “এদের উপায় হবে কি?” উনিশ শতকের স্বতীয়ার্ধে গ্রাম বাংলার বা মফস্বলী শ্রোতার কাছে প্রশ্নটা পরিচিত, তাৎক্ষণিক। পৌরাণিক আখ্যানের মধ্যে বাস্তব উঁকি মারে।

আবার কতকগুলি আখ্যানের ঝোঁক এইরকম, যে তত্ত্বকথা আনতে হয়, না হলে মূল্যবোধের সংস্কট দেখা যাবে, পদ্রুপতান্ত্রিক সমাজে লালিত নৈতিকতা মার খাবে। ‘রাসলীলা’ কথকতার অতি জনপ্রিয় আখ্যান, বৈষ্ণবীয় তত্ত্বের কেন্দ্রবিন্দু অথচ লৌকিক ক্ষেত্রে তার তাৎপর্য “উচ্ছৃঙ্খলতার” জন্ম দিতে পারে। নানাভাবে কথকতার পদ্ধতিতে এই সমস্যাকে মোকাবিলা করতে হয় কারণ শ্রোতাদের মধ্যে মেয়েদের সংখ্যা তো আর কম নয়। তাই পদ্ধতিতে সরাসরি সমস্যা উত্থাপন করতে হয়, পূর্বপক্ষ ও সিদ্ধান্ত পক্ষের ধাঁচে তাকে নিরসনও করতে হয়। উদাহরণ দেওয়া যাক।

“এক উপপতি শেবা অতি ভয়াবহ কৰ্ম্ম। কোন গৃহস্থের গৃহে গমন করলে পর তাকে সমাদর করে না। নিকটে বশতে দেয় না। সকলের নিকট খাটো হয়ে থাকতে হয়। অধিক কি বাড়ির চাকর তাকে বলতে হয় চাকর বাবা ভাং খাও এসে। সে বলে জায় মা ঠাকরুণ তোমার স্বভাব ভালো নয় তোমার হাতের অন্ন ব্যঞ্জন ভোজনে ইচ্ছা হয় নাই। দেখোদেখি এমনি কৰ্ম্ম চাকরের নিকট খাটো হয়ে থাকতে হয়।”^{২৮}

এইরকম সামাজিক অবস্থায় গোপীদের প্রেম কেন সমর্থনীয়? যদুস্তি দেওয়া হচ্ছে:

“এক জে অমৃত তারে বিশ জ্ঞানে পান কল্লৈও অমর করে। এক অমৃতজ্ঞানে পান কল্লৈও তাতেও অমর করে। অমৃতের কার্জ যে অমরত্ব প্রদান তাই করে থাকে। তেঁয় পরমাত্মা জে হরি তাকে গপি শকল উপপতি বদ্বিক্তেও চিন্তা করেও গুণময় দেহ ত্যাগ করে নিত্য দেহ পেয়ে কৃষ্ণ নিকটে সর্বাগ্রে গমন কল্লেন। ...জে কাম নরকপ্রদ সেই কাম জদি ঈশ্বরে অপর্ণ করতে পারো তাহলে সে মুক্তি লাভ করে। জে জেভাবে চিন্তা করুগ। তা হলেও তো ঈশ্বর চিন্তা হয়।”^{২৯}

কিন্তু কৃষ্ণের তরফে যদুস্তি কী? সমস্যা প্রশ্নাকারে রাখা হল, পূর্বপক্ষ স্থাপিত হল।

“পর স্ত্রি জে গোপীসকল তাহার সহিং রাশ ক্রিড়া কল্লেন। এতে ধর্ম্মের বিরুদ্ধাচরণ হলো। জদি বলেন আপ্তকাম পুরুষের ইহা অধর্ম্ম নয়।... আমার এই জিজ্ঞাস্যো। জদি জদুপতি শ্রীকৃষ্ণ আপ্তকাম তবে কি অভিপ্রায়ে নিশ্চিত কৰ্ম্ম করলেন। এ বিষয়ে আমার সংশয় উপস্থিত হয়েছে।”^{৩০}

সংশয় নিরসন করা হল, পূর্বপক্ষের আপত্তি খণ্ডন করা গেল।

“ধর্ম্ম ব্যতিক্রমো দৃষ্ট।... জেমন শর্ব্বভুক অগ্নি সকল ভোজন করেন বিষ্ঠাও ভোজন কল্লেন এবং গো-মহিশাদি ভোজন কল্লেন। তা বলে কি তিনি অপবিত্র [sic] হন। সেই অগ্নি আবার যজ্ঞের হবি ভোজন করে থাকেন।

...জদি বলেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আপ্তকাম হয়েও ॥ তিনি এরূপ কার্জ কেনো প্রবৃত্ত হয়েন ॥ এ বিষয়ে আপনি শ্রবণ করুন। জদিও ভগবান আপ্তকাম তথাপি ভক্তজনের প্রতি অনুগ্রহ করার নিমিত্ত মনুষ্যদেহ আশ্রয় করে এইরূপ রাশিক্রিড়া করেন।”^{৩১}

আর শেষ কথা হল সব কাজ সবার সাজে না, ক্ষমতার তারতম্য আছে। দেবতা বলে কথা। ক্ষমতার ভাষাকে শেষপর্যন্ত রূপান্তরিত করা হয় যদুস্তিতে,

...“জেমন রুদ্র মহাদেব ব্যতিরেকে অন্য ব্যক্তি বিশ পান কল্লৈ তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হয় তেমনি কোন মূঢ় ব্যক্তির জদি মনে করেন ॥ জে কৃষ্ণ রাসলীলা করেচেন এবং বস্ত্রহরণ করেচেন আমরা তাই করবো অই কথা মনে করে ॥ জদি সেই কার্যে প্রবৃত্ত হয় তৎক্ষণাৎ তার মৃত্যু হবে।”^{৩২}

যদুস্তিগদালি আদৌ নতুন নয়। ভাগবতে রাসলীলা প্রসঙ্গে অনুরূপ কথা বলা হয়েছে।

পরীক্ষিৎ প্রশ্ন করেছেন, শূদ্রদেব বলেছেন; আত্মকামত্ব, অগ্নির সর্বভুকত্ব, রুদ্রের বিষপান ইত্যাদি অনুষ্ণগগন্ধুলির উল্লেখ ভাগবতসম্মত। কিন্তু ভাষার প্রয়োগে বলার ঝোঁকে তারতম্য ধরা পড়ে। শাপমনি্য নতুন করে পাঠক্রমে ঢোকানো হলে। ভূতারা যে গির্নির হাতে খেতে চায় না, ঠাকরদুনকে অমর্যাদা করে, এটা সংযোজিত। থাকবন্দী সমাজে কঠোর মর্যাদা, অধিকারভেদ যে ভক্তির পরতে পরতে জড়িয়ে থাকে, ভাগবতী আখ্যানের এই সূত্রকে বিশেষভাবে নজরে আনাটা কথকের কাজ। তত্ত্বকথা পরিবেশনের ক্ষেত্রে ভাষ্যকার ও টীকাকারের সঙ্গে কথক মিশে যাচ্ছেন।

সমাজে পাত্তিত্ব এবং গোপীদের পরকীয়া প্রেম, এর মধ্যকার বন্দন মোটাতে কথায় নানা যুক্তি আনতে হয়, উপমাকে, দৃষ্টান্তকে ব্যবহার করা হয় যুক্তি হিসাবে, শেষে শাপের ভয়ও দেখাতে হয়। কথক ধর্মবক্তাও বটে, তাকে পরম্পরাগতভাবে গম্পও বলতে হবে আবার লক্ষ্যও রাখতে হবে যে সামাজিক স্থিতি না ভেঙে যায়, তাহলে শ্রোতার সমাজই বদলে যাবে, আসরের উদ্দেশ্য মার খাবে।

সময় সময় কথাস্তরে যাবার খাতিরেও প্রশ্নোত্তর রাখা হত, যাতে করে বলাটা বেখাপা না হয়ে যায়। যেমন কালিয়দমন পালার একজায়গায়,

“রাজা উ ॥ গুরো গা এ কেমন হলো। এই আপনি পূর্বে বললেন ফানী-
এর বিশ তেজেতে জন্মনার উভয় তীরে বক্ষলতা ঔষধি তৃণ পর্জন্ত জলিত
হয়েছিলো। কিন্তু সে স্থানে কদম্ববৃক্ষ কিরূপে জীবিত ছিল। শূদেব
উ ॥ মহারাজ কি শ্রোতা ॥ আপনি ॥ আপনারে শ্রোতা পেঞ আমি
কৃতার্থ হলাম। মহারাজ শুন শুন। এই কদম্ববৃক্ষ কিরূপে জীবিত ছিল
তাহার কারণ শুন...”৩৩

এই কথার পরে অন্য কথা শূদ্র হয়, গরুড়ের অমৃত আহরণ ও কদম্ববৃক্ষে রেখে ক্রান্তি অপনোদন। প্রাসঙ্গিক ভাগবতী শ্লোকে কদম্ববৃক্ষের উল্লেখ আছে, একটানে গম্পের ফাঁকে ঘটনাটি একটি শ্লোকে বলা হয়েছে। প্রশ্নোত্তরের রীতি ভাগবতে আছে, প্রথাসিদ্ধ। কথক ঠাকুর সেই রীতি ব্যবহার করে কথাস্তরে গেলেন। ভাগবতে অনুষ্ণগ একটি শ্লোকে সারা হত, কথকতায় সেটা এক পাতা জুড়ে চলল, বেতালা মনে হল না। প্রশ্নের উত্তর হিসাবে যে আখ্যানটা বলা হয়েছে।

সংস্কৃত রসশাস্ত্রের বিচারে ‘কথা’ ও ‘আখ্যায়িকার’ বহিঃসং নিয়ে ভামহ ও দণ্ডির কুটকচালি তর্কে অপ্রাসঙ্গিক করে তুলেছিলেন বাণভট্ট। একটি নিবন্ধে এই তর্কের বিবর্তন নিয়ে মনোজ্ঞ আলোচনা করেন সুশীলকুমার দে। শেষপর্যন্ত ‘রসেই’ কথার পরিণতি। আলোচনা থেকে ‘কথার’ দুইটি নান্দনিক সূত্র পরিষ্কার।^{৩৪} মহাভাষ্যের টীকাকারেরা আলোচনায় বার বার, ‘গ্রন্থিক’ শব্দটিকে কথকের প্রতিশব্দ হিসাবে ব্যবহার করেছেন, ধারণা গ্রন্থনের, কথনের।

বাঁধনি ও ‘গাঁথনি’টা জরুরি। শ্রোতাদের মজলিশে ‘কথা’কে গেঁথে তোলা কথকের কাজ। সেইখানে কাহিনীর উৎসর্বিচার ততটা প্রাসঙ্গিক নয়। কথা জমাটি হচ্ছে

কিনা, জমাটি কথা জমায়েতকে ধরে রাখতে পারছে কিনা, সেইটা বিচার্য। এই জমাট বাঁধার গুণ আবার নির্ভর করছে কথকের বুদ্ধিতে বিষয় কীভাবে অধিগত হল, তার উপর। কথক রীতি কেবল গ্রন্থগত নয়, স্বকীয় বুদ্ধিগতও বটে।^{৩৫} তাঁর বিচারে ভামহ জানিয়েছেন যে কথা হল পুরোটা রচা কিন্তু কথায় প্রবাহ থাকতে হবে।^{৩৬} প্রবন্ধের ‘ভাবিকা’ গুণ থাকে, তার প্রসাদে অতীত ও ভবিষ্যৎ মানসচক্ষে প্রত্যক্ষ হয়। (প্রত্যক্ষা ইব দৃশ্যন্তে যদার্থা ভূতভাবিতঃ)। এই ‘ভাবিকত্ব’ বা ভাবিকা সিন্ধু হবার অন্যতম শর্ত ‘কথায়্যাঃ স্বেভিনীততা’, কথাপ্রবাহ। উদ্ভূতে ‘স্বেভিনীততার’ সুন্দর প্রতিশব্দ হল ‘রওয়ানি’। ‘বাঁধুনি’ ও ‘রওয়ানি’, এই দুটি গুণ যখন পরস্পরের প্রতি স্পর্ধা নিয়েও ‘সাম্যে’ অবস্থান করে তখন কথা হয়ে ওঠে শিল্প রসে ভরপুর। “কথায়্যাং সরসং বস্তুং গদ্যৈরৈব বর্ণিতম্।”^{৩৭}

ভামহী ধারণানুসারে সরসবস্তু গদ্যে লিখিত হলেও তাকে ‘শ্রব্য’ বা শ্রবণমনোহর হতে হবে। স্বর ও সুর সংযোগে শ্রবণীয় কথার চমৎকারিত্ব বা মনোহারিত্ব বৃদ্ধি পায়। এক্ষেত্রেও সহযোগের, ঘটকালির, চিন্তা কার্যকর। ‘সহিতের’ তত্ত্বে স্বর ও সুর সংযোগে শব্দ গ্রন্থনা ও তার পাঠ হয়ে ওঠে কথকতা।

গ. স্রবের কথা, স্রবের খেলা :

মন্দিরের পুরোহিত ও টোলের অধ্যাপকের পদ নিয়ে দুই ব্রাহ্মণ যুবকের মধ্যে জ্বর প্রতিস্বন্দিতা। লাজুক অম্বরনাথ এবং চতুর ও বাকপটু আদ্যনাথ। এই লড়াইয়ের ক্ষেত্র হল কথকতার আসর। জমিদার কন্যা বাণী সমজদার, ছেলেবেলা থেকে কথকতা শুনতে তার কান তৈরি। স্নানযাত্রা থেকে ঝুলন পর্যন্ত মাসাবধিক কাল আসর বসে, গ্রামবাসীরাও শোনার অভিজ্ঞতায় কম যান না, তাঁদের গ্রামে ভাগবতী কথকতা প্রতি বৎসরে অনর্দ্বীত হয়।

‘মুখচোরা অম্বর’, নিজের চিত্তরঞ্জনের জন্য ‘শুদ্ধ নীরবেই পাঠকার্যে’ অভ্যস্ত। ফলে কথকতার আসরে বসে তার করুণ অবস্থা হয়। পাঠকার্যে অনভ্যাসের দরুণ,

“সে থামিতে লাগিল। কথা বলিতে বলিতে মধ্যে মধ্যে সে থমকিয়া থামিয়া পড়ে, কণ্ঠ যেখানে তারায় তুলিতে হইবে, সেখানে উদারায় নামিয়া আসে, যেখানে হর্ষে উচ্ছ্বসিত হইয়া কহিতে হইবে, সেখানে কণ্ঠ বাধিয়া নবোঢ়া বধুর মত লজ্জায় অক্ষুটর হইয়া আসিয়া হয়ত শেষে থামিয়া যায়।...শ্রোতার দল প্রসন্ন হয় না, বস্তু লজ্জায় মাটি হইয়া যাইতে চাহে।”^{৩৮}

আদ্যনাথ দক্ষ কথক, তাঁর কথকতা স্বরক্ষেপণে সিন্ধু। তাঁর কথকতা শুধু থেকেই জমে ওঠে।

“স্বহীতবক্ষে টগর ফুলের মালা পরিয়া কণ্ঠস্বর কখনো পঞ্চমে কখনো ভৈরবীতে কখনো বেহাগে কখনোও বা আবার ললিত রাগিণীতে উঠাইয়া

নামাইয়া হাসাইয়া কাঁদাইয়া নদীতরঙ্গের মত অবলীলায় যে বাহিত করিয়া দিয়াছে, সে আদ্যনাথ।” ৩৮

ভূদেবের পরিবারের মেয়ে লেখিকা অনুরূপা দেবী, কথকতা তাঁর পরিচিত শিল্প। তিনি জানেন যে কথকী দক্ষতার অন্যতম উৎস হল স্বরের কুশলী নিয়ন্ত্রণ।

ভরতমুনির নাট্যশাস্ত্রে ‘কাকুশ্বরব্যঞ্জক’ অধ্যায়ে স্বর প্রয়োগের রীতিনীতি নিয়ে আলোচনা আছে। ভাব সৃষ্টির সঙ্গে স্বর প্রয়োগের যোগ নির্বিড়। ভাব অনুযায়ী, পরিস্থিতি অনুযায়ী, কণ্ঠস্বরের পরিবর্তন হয়। কোথায় তা হবে মন্দ (কণ্ঠস্থ বিলম্বিত ধ্বনি) আবার কোথায় হবে দীপ্ত। প্রযোক্তাদের প্রতি অনুপদ্ধান্ত নির্দেশ আছে। “ভাবেষ্মেতেষু নিত্যং হি নানারসসমাশ্রয়াৎ।” কণ্ঠস্বরের ওঠানামার সম গুরুত্বপূর্ণ বিরাম। বিরামের প্রবন্ধ আবশ্যিক, বিরাম অর্থসূচক। বিরামই ‘অর্থসমাপ্তি নিমিত্তং’ এই কথা অভিনবগদ্যপুত্র তাঁর টীকায় মনে করিয়ে দিয়েছেন।^{৩৯} বিরামে গোলযোগ হলে অন্য অর্থ হবে।

নাট্যশাস্ত্র একটি সংগ্রহ গ্রন্থ। এর শিকড় নিহিত আছে ব্যবহারিক ও লৌকিক অভিজ্ঞতায়। টীকায় অভিনবগদ্যপুত্র চেষ্টা করেছেন তাঁর নিজের দর্শন চাপাতে।^{৪০} লোকবৃত্তি বা লোকস্বভাবের অনুসরণে বিরামের জন্য কথকরা বলার ভঙ্গি চালু করেছিলেন, যে ভঙ্গির কথা নাট্য শাস্ত্রেও উল্লিখিত হয়েছে।^{৪১} এই ভঙ্গি প্রসঙ্গে তারাজ্ঞকরের সাক্ষ্য হল,

“নিশাপতি গম্ভীরভাবে বললে, দেবর্ষি নারদকে দেখে ব্যাস বললেন—অহো ভাগ্য! আসুন-আসুন-আসুন, দেবর্ষি নমস্কার।

নিশাপতি তখন ভাগবত কথকতার এন্টান্টটুকু আয়ত্ত করেছে। সেকালে ভাগবতের আসরে এইভাবে অনেকজন আগন্তুক কথকের সাদর সম্বর্ধনায় আপ্যায়িত হয়ে বিনয় প্রকাশ করে অপ্রস্তুত হতেন।”^{৪২}

স্বরক্ষেপণ ও স্বরভঙ্গি কথকরা অভ্যাস করতেন, আসরে সেইভাবে বলতেন। বিক্রমপুরের বাসাইলনিবাসী রাখালচন্দ্র গোস্বামী হলেন বংশগতগুরু। শিষ্যবাড়িতে তাঁকে পাঠ করতে হত, কথকতা করতে হত। গলার স্বরক্ষেপণে স্বাভাবিক নিপুণতা ছিল তাঁর বৈশিষ্ট্য। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে একজন সাক্ষ্য দিয়েছেন যে ভাওয়ালে আসরে বসে বলার ঝোঁকে বলেছেন, “তোমার বাড়ী কোথায়?” সামনে বসে থাকা শ্রোতা সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিয়েছে, “হ্যাপার পরাণ গ্রাম”^{৪২ক}

এই কৃৎ-কৌশলকে মাথায় রেখে কথকরা পুঁথি লিখতেন। পুঁথির বিন্যাসে ও ভাষায় তার ছাপ আছে। পুঁথিসংলগ্ন হরিনাম মাহাশ্যের একটি চূর্ণীতে টানা বাক্য সমাপ্তি লেখা আছে। অর্থ অনুযায়ী বিরামপূর্বক পড়া বিধেয়। যেমন,

“ভাইরে বেদেয় হরি রামায়ণেয় হরি আদ্যে হরি অন্তে হরি হরি চলো কোন ভয় নাঞ কোন শ্রম নাঞ কোন ক্লেশ নাই মদুখে হরি বললেই হয় রে অনাআশে, পরমপদ পাবে রে। ভেবে দেখো দোঁখি ছিলেই বা কথা এলেই বা কথা সেখানে কি কথা বলে এলে বিষয় পেয়ে ভুলে গেলে কিছু মনে নেই

ধনোপার্জন করো গৃহ ব্যাপার করো শ্রী পুত্রাদির লালনপালন করো তা যত
বারণ করেন নাঈও তায় করো আর থেকে ২ মূখে একাকার হরি ২ বলে ডাক
গো জন্ম সফল হবে কুল পরিহর হবে।” ৪৩

লেখায় কোনো যতিচিহ্ন নির্দেশ নেই। অথচ পড়লেই বোঝা যায় কোথায় থামতে
হবে, কোথায় বা শব্দরূপ করতে হবে। এইবার কথোপকথনের একটা নমুনা পেশ করা
যেতে পারে।

“এখানে দ্রৌ পাকগৃহে স্বারে অণ্ডল পেড়ে সন্ন। নিদ্রা। এই সময়
দুঃস্বা ছুটে গিয়ে চরণে পড়েছে। চোকবুজে উ ॥ কেয় ঠাকুর পো ?
কেন ? এঁকি। চক্ষে জল কেন। উ ॥ আমাদের সর্বনাশ হয়েছে।
এলোকেশে সোনার প্রতিমা আঃ এই দণ্ড খানিক নিদ্রা হয়েছে কেন এঁদের
সঙ্গে বিবাদ হয়েছে। না। তবে কি মৃদু স্নান কিছু খাও নাই।...

দুঃস্বা চকে হাত দিয়ে রোদন। ঘরে থেকে সাধ করে বোঁ এনেছিলাম।
বোঁরে বোঁ। তাদের কেশ ঘরে নিয়ে গেল। বোঁরে বোঁও ও। এনে দে তোর
পায়ে পড়ি। বোঁরে বোঁ। উ ॥ ভয় নাই।” ৪৪

উপযুক্ত অনুচ্ছেদে দ্রৌপদী ও দুঃশাসনের মুখোচ্চারিত বাক্য এক স্বরে পড়লে চলবে
না, তাল ও বিরামে পার্থক্য আছে, তাই দিয়ে পরিচিতি অনুযায়ী চারিত্রিক মেজাজ
বোঝা যাবে। বাক্যবন্ধ ও যতির মধ্যে পড়ার রীতিনীতি স্পষ্ট। পাঠ্যস্বর অনুযায়ী
শ্রোতাদের কাছে বিশেষ আবেদন বিজ্ঞাপিত হবে, এই কথা মনে রাখা আবশ্যিক।

বাঙালি কথকদের পাঠ রীতিতে একটি বিশেষ নজর এড়াবার নয়। সংস্কৃতবহুল
বাক্যবলী বা ‘সাঁট’ বা ‘চুণী’র প্রয়োগ বাঙালি কথকতার রীতি ছিল। অনুপ্রাস
ও সংস্কৃতবহুল শব্দ পাঠের ঝোঁকে ঝংকার তোলে, অর্থ ব্যতিরেকে শ্রোতাদের অভিভূত
করে থাকে। এই কায়দায় কথকরা নিপুণ ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়,

“আমাদের দেশের কথকরা এই তত্ত্বটি জানিতেন, সেইজন্য কথকতার মধ্যে এমন
অনেক কান-ভরাট-করা সংস্কৃত শব্দ থাকে এবং তাহার মধ্যে এমন তত্ত্বকথাও
অনেক নির্বিষ্ট হয়, যাহা শ্রোতার কখনই সুস্পষ্ট বোঝে না কিন্তু আভাসে
পায়—এই আভাসে পাওয়ার মূল্য অল্প নহে।” ৪৫

সাঁটের সব শব্দের অর্থ বোধগম্য হয় না। সময় সময় অর্থও সামান্য, পুনরুক্তিতে ভরা।
অথচ শব্দ ঝংকারে যে সৌন্দর্য আভাসে সৃষ্টি করে, তা শ্রবণ তৃপ্তিদায়ক। অর্থের
বোধ সেক্ষেত্রে ততটা প্রয়োজনীয় নয়, হয়ত রস উপভোগের বাধক। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ও
যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধির বাল্য বয়সের অভিজ্ঞতাও রবীন্দ্রনাথের রসবিচারের
অনুসারী। যোগেশচন্দ্রের জবানীতে,

“মনে পড়ে, নয় বৎসর বয়সে রামায়ণ নিয়ে কাড়াকাড়ি করেছি। বছর পাঁচ
ছয় পরে রামায়ণ কথা প্রথম শুনিনি। সে কি আনন্দ ! কথক ঠাকুরের বাক্যচ্ছটা
বুঝতে পারতাম না, কিন্তু তা-তে কিছুই এসে যেত না, খেই হারাত না।” ৪৬

উনিশ শতকে ‘কথকতার সূত্র’ বেশ চালু শব্দ। স্বরের সঙ্গে আছে সূত্র, গান বাঁধার কাজ। কিছু পালা তো সূত্রে, ছন্দে লেখা হত, তাদের শিল্পীরা হতেন গায়ের। কথকদের বানানো গান বেশিরভাগ সময়ে পৃথকভাবে লেখা হত, পদ্ধতিতেও আলাদা সংযোজিত হত। গান নানা সূত্র থেকে নেওয়া হত, টুকুে রাখা হত, প্রয়োজনে কাজে লাগতে পারে। কথক মহানন্দের হাতে লেখা গানের খাতা সবচেয়ে বড় প্রমাণ। শ্রীমঙ্গাগবতের পালায় লেখা থাকত হরি মাহাত্ম্য নিয়ে গান,

“গোড় শারং

হরে হর মম ভব যাতনাং নাশয়াসু বসুদেব বিশয় বাশনাং। অহম্মদ মন্ত
তব জ্ঞান বিহীনে দীন হীন রামধনে সদাবিষয় নিপুণে বিতর করুণাং। ১ ॥
আলিয়া ॥ ইহ মে ভবে রাঘবে কিস্তবে। অহমিহ সদামন্তো বিশয়াসবে। তব
ভজন পূজন মনাদত্য মম মনঃ ॥ মূহ্যতি সতত মহং মামতি রবে ॥ নিবাস
সংসার বনে ছিদ্রবহুল ভবনে ॥ নিত্যভয়ে কলিকাল চোর সম্ভাবে ॥ সদা মহা
মোহনিশী তেন দীনোদ্ধব দ্রাসি রাম তব তব শরনৈশি পদপল্লবে ॥ ১ ॥”
রামপদ ভট্টাচার্য গানটা লিখেছেন, ‘রাম’ কথাটি ভণিতায় আছে।^{৪৭} কিন্তু গানটা
লেখা আছে আলাদাভাবে, পালার কোনো অনুচ্ছেদের সঙ্গে যুক্ত নয়। ভাগবতী পালা।
ফলে চূর্ণীর মতো সময় বা জায়গা বদলে গানটা গাওয়া যাবে, বেমানান হবে না।
আবার সময় সময় পালার সংলাপের মধ্যে গান রাখা হত।

“কোন গরিপ রাধিকারে বলছেন শাখিরে আর কালার প্রেমে কাজ নাই। তখন
রাধিকা শাখিরে অমন কথা বলিলা নে। শখী ॥

গান ॥ শে কালো সামান্য কালো নয়। বেদাগমে কয় ॥ মহাজোগী মহাকালো
কালোভবে জোগী হয় ॥ কিবা দিবা রাত্রে কালো না ভাএ কালাকালো
সর্বদা জে ভাবি। কালো নাহি তারো কালো ভয় ॥”^{৪৮}

শ্বিজরাজ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি কথকদের আসরে বসলে মনে হয় সে আখ্যানে গানের
ভূমিকা সবসময় গম্ভীর অঙ্গ নয়, বরং অলঙ্কার। কাহিনী বলার ফাঁকে ফাঁকে বিরতির
জন্য, গান দেওয়া হয়, বৈচিত্র্য আনা হয়, তা না হলে বিবৃতি একঘেয়ে লাগতে পারে।
কথা থেকে গান, গান থেকে আবার কথায় যাওয়া যেতে পারে। হনুমান ভরম্বাজের
আশ্রমে যাচ্ছেন, যেতে তো সময় লাগবে, ওই সময়ে আকাশপথের বর্ণনা না দিয়ে,
হনুমানের মুখে শ্বিজবাবু গান বসিয়ে দিলেন,

“বিমল আনন্দে, সুললিত ছন্দে জগদানন্দে ডাকোনারে”^{৪৯}

আবার লঙ্কায় হনুমান বৃদ্ধবেশে শিবভক্ত রূপে প্রবেশ করবেন, তখন মুখে শিবস্তোত্র
স্বাভাবিক, হনুমান শিবস্তোত্র আবৃত্তি করতে লাগলেন, শ্বিজবাবুও স্তোত্র সূত্রে গেয়ে
উঠলেন,

“শঙ্কর হর পরমেশ, পতিত পাবন দীনেশ।”^{৫০}

কিন্তু কোনো কোনো সময় গানের মাধ্যমে তত্ত্বকথাও বলা হয়। কাহিনীর অন্তর্নিহিত
ভাব সূত্রেলা কথায় যত সহজে গ্রাহ্য হবে, আর অন্যরূপে হওয়া সম্ভব নয়। বাসন্তী

দেবী এই রীতিতে সিদ্ধা, স্বৈজবাবুও প্রয়োজনে গানের এইরকম ব্যবহার করেন। হনুমান তাঁর বুক চিরে রাম-সীতার যুগল মূর্তি দেখাচ্ছেন, সেটা রূপক, তার তাৎপর্য গানে ব্যাখ্যা করা হল, “জয় মহাবীর জয় ॥” কথকতায় গান এখানে যাত্রার প্রচলিত বিবেকের কণ্ঠে সংগীতের ভূমিকা পালন করেছে।^{৫১}

গান সংগ্রহ করা রীতি, একজনের লেখা গান অন্যে গাইতে পারতেন। গানও নানারকম, রামপ্রসাদী, কীর্তন, বাউলাঙ্গ, রাগপ্রধান, স্তোত্র ইত্যাদি। সব সুরই যে সহজ সরল, এই কথা মনে করার কোনো সংগত কারণ নেই। অধুনা নবরত রক্ষাচারী তাঁর ভাগবত পাঠে স্বচ্ছন্দে রজনীকান্তের গান সুযোগ মতো ব্যবহার করেন।^{৫২} মহানন্দও গান প্রয়োগে উদার মতাবলম্বী ছিলেন। দাশরথি রায়ের গান কথকরা গাইতেন কারণ ভাব ও সুরের ক্ষেত্রে তিনি অপ্রতিস্বন্দ্বী, জনপ্রিয়ও বটে।^{৫৩} পুথিতে দেখা যায় যে গান যেন শুনতে শুনতে লেখা হচ্ছে, আঁকাবাঁকা লেখা, আবার অপর পৃষ্ঠায় একই গানের পরিষ্কার অনুলিপি করা হচ্ছে। এক পাতায় এক পিঠে চুর্ণীর কয়েকটা ছত্র, “পরম-ধার্মিক স্বেদ প্রবল বল প্রতাপান্বিত, দুষ্টদমন শিষ্টপালন” ইত্যাদি বলে পরীক্ষিতের বর্ণনা, অপর পিঠে গানের কয়েকটা টুকরো ছত্র “সোনার চাঁদ গোঁড়াচাঁদকে পাগল করিলে” ইত্যাদি।^{৫৪} এইগুলি নানা জায়গা থেকে চলতি অবস্থায় নেওয়া হচ্ছে, এইটা স্পষ্ট। ষষ্ঠীর দিনে স্থানীয় কথক এসেছেন, তবুও নিয়ে প্রচলিত আগমনী গীত গাইলেন। ফরম্যাশন মতো একটি নতুন গান গাইলেন, গানটি ওই আসরের এক ১৪/১৫ বৎসরের কিশোরের লেখা, কিশোরটির নাম বস্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।^{৫৫}

গান যাই হোক না কেন, যেই শিক্ষক হোক না কেন, কথকতার আসরে গানের আবেদন সামগ্রিক। পাঠক্রমে স্বরগুলির একক প্রয়োগ বিবেচ্য। কিন্তু যখন সংগীতের মাধ্যমে রসসৃষ্টি হবে, তখন প্রযুক্ত স্বরগুলির সামগ্রিক আবেদনে ভাবটি ধরতে হবে। স্বরলিপি কাঠামো মাত্র। গায়কী, কণ্ঠ, পদ ও সুর মিলিয়ে ভাব রূপপরিগ্রহ করে, শ্রোতাকে মগ্ন করে। কথকের আসরে সংগীতের সামগ্রিকতা অনুভবের বিষয়, লেখা বা বলার মধ্যে সব ধরা যায় কিনা সন্দেহ। তবুও রসভুক্তির একটি পরিস্থিতির বর্ণনা দেওয়া যেতে পারে। অনুরূপা দেবীই আমাদের ভরসা।

“সৈদিন কথা শেষে সংগীত হইয়া সভা ভঙ্গ হইল। সেই তাল লয় যুক্ত স্বর ও সংগীতের উদ্দীপনা সংগীত শেষ হইলেও বাণীকে অনেকক্ষণ অবাধি মন্ত্রমুগ্ধ করিয়া রাখিল। প্রাত্যহিক পরিবর্তিত শ্রীভগবানের উদ্দেশ্যে সদ্য-পুত্র-শোকাভুরা সুভদ্রার গীত, গীতটির মর্ম এইরূপ—জান নাকি তোমার দেওয়া এ জীবনের সকল আলোক যদি নিবিয়া যায় তথাপি তোমার আলো এ জীবন হইতে নিমেষের তরেও নিবিবে না। তুমিই আমার অভিমন্যু, তুমিই আমার অর্জুন, তুমিই আমার বাসুদেব, তুমিই আমার সব, আমার সবই তুমি প্রভু।...সংগীতের শেষ কম্পন বৃহৎ খিলানের মধ্যে বিলীন হইয়া গেল। ইহার পরও কিছুক্ষণ কেহ বাক্যোচ্চারণ করিল না।...কথক থামিয়া গিয়াছে,

সে (বাণী) এতক্ষণ কিছুই জানিতে পারে নাই। এতক্ষণ সে মন্ত্রমোহে আচ্ছন্নবৎ হইয়া সুভদ্রার কথাই ভাবিতেছিল।” ৫৬

ঘ. কথকতায় তাৎক্ষণিকতা :

উনিশ শতকের প্রথমদিকে রাইপুত্র থেকে নীলকণ্ঠ দেবশর্মা নানদুরে জানাচ্ছেন :

“নিবেদনমিদং, শ্রীযুক্ত দাদামহাশয় ৮ রোজ এ বাটিতে পৌঁচিয়াছেন এবং ৯ রোজ পুরাণ আরম্ভ বাবুদিগ্যের বাটিতে হইয়াছে জানিবেন লাভাদির কিছু হয় নাই কথকতা উত্তম হইতেছে সকলের মনাহং হইয়াছে আর উত্তর উত্তর ভাল হইতেছে”... ৫৭

‘উত্তর উত্তর ভাল হইতেছে’, আসর জমে উঠেছে, কথকের সঙ্গে শ্রোতার ঘটকালি হয়েছে, কথক তাদের মনোমত হয়েছে। পুঁথিতে গ্রন্থনা থাকে, কাহিনী গ্রন্থনে আবদ্ধ। অথচ অনুষ্ঠান রোজ হয়, পুঁথিকে ঘিরে থাকে শ্রোতা ও পাঠক। সব শ্রোতাও সমান নয়, আসরের আবহাওয়াও সব জায়গায় এক নয়। কথকতার ভালো বা মন্দে তারতম্য ঘটে, কথককে সতর্ক থাকতে হয়, চিঠির বয়ানে তা ধরা পড়ে। তাই বাঁধা পুঁথির তারতম্য ঘটেবে ; পুঁথি মূল খুঁটি। কিন্তু আসরে কথককে পুঁথির এদিকে-ওঁদিকে যেতে হয়, হুবহু পুঁথি ধরে চললে আর ‘উত্তর উত্তর’ ভালো হবার সম্ভাবনা কম। পুঁথি দেখতে হয়, ছুঁতে হয়, এবং তার পরে বলতে হয়। দীনেন্দ্রকুমারের বর্ণনায় ছবি স্পষ্ট,

“তিনি (কথক ঠাকুর) তুলটের কাগজে লিখিত ও পাতলা কাঠের আবরণাবৃত প্রায় একহাত দীর্ঘ পুঁথিখানি সম্মুখে খুলিয়া রাখিয়া মধ্যে মধ্যে এক একটি শ্লোক দেখিয়া লইতেন, এবং তাহা আবৃত্তি করিয়া তাহার ব্যাখ্যা করিতেন ; কখন গান করিতেন, ব্যাখ্যা উপলক্ষে নানা গল্প বলিতেন ; কখনও হাসাইতেন, কখনও কাঁদাইতেন।” ৫৮

পুঁথিতে শ্লোক দেখা ও শ্রোতাদের হাসানো-কাঁদানোর মধ্যে ফাঁক অনেক। কথক গান গাইছেন, ব্যাখ্যা করছেন, গল্প বলছেন সবই মূখে, সঙ্গে সঙ্গে চলছে। শ্লোকগুলাঁ সব পুঁথিতে লেখা। শ্লোক বা মূল কাহিনী কথায় পল্লবিত হচ্ছে, গানে অলঙ্কৃত হচ্ছে, গল্পে বিস্তৃত হচ্ছে। ফলে অনুষ্ঠানের তাগিদে সফল কথকরা আসরে বসে শ্রোতার মনোভাব বুঝে গান তৈরি করেন, গল্পের রদবদল ঘটে, স্বরের পরিবর্তনে ভাবের আবেদনেও রকমফের হয়। আসরের এই তাৎক্ষণিকতা অনুযায়ী মূখে মূখে রদবদল ঘটানো তাঁর দেখা সেরা বাঙালি কথকদের গুণবিশেষ, এই কথা দীনেশচন্দ্র সেন স্পষ্ট বলে গেছেন। ৫৯

কথকদের নিজস্ব অভিজ্ঞতায় এই রীতি স্বীকৃত। শিবজরাজবাবু বলেন যে, “আসরে আসার আগে ভাবলাম এক আর আসরে বসে এমন কথা বললাম যা ভেবে আসিনি। জানি না কি করে বললাম।” ৬০ ক আরেক কথক ঠাকুর লিখেছেন,

“অনেকদিন ধরে একই ধরনের বাঁধা নিয়মের গানগুলো মাঝে মাঝে একটু

অদলবদল করে ঠাকুর গান করেন। মাঝে মাঝে নতুন গানও তিনি তৈরী করে শুনিয়ে দেন। ঠাকুরের এখন এমন একটা শক্তি হয়েছে যে কথা বলতে বলতে সদূর ধরলেন—আর সঙ্গে সঙ্গে পদযোজনা।...ঠাকুর কথা বলে গেলেই গান হয়ে যায়।”৬০

আসরে বসে সৃষ্টি করা, রদবদল করা তো শ্রোতার রুচিনিভর, শ্রোতার প্রতিক্রিয়া কথক ঠাকুরকে বক্তব্যের তারতম্য ঘটাতে প্রণোদিত করে। তাতে শ্রোতাদের রস আশ্বাদনে খিঁচ লাগতে পারে, কারুর কারুর বিরূপ মন্তব্য আসতে পারে। কথক ঠাকুরের আত্মজৈবনিক রচনায় আসরে শ্রোতার প্রতিক্রিয়া ও কথকের বাচকতার মধ্যে টানাপোড়েন ধরা পড়ে,

“এই যে মদুখুটিমশায় আসুন, আজকের কথকতা কেমন শুনলেন? দেখুন, সভায় আপনাদের মত জ্ঞানীগুণী লোক থাকলে কথার সদূরই পালটে দিতে হয়। এই ধরুন ছন্দা, সে লেখাপড়া শিখেছে। একটা কথা বললে সে বোঝে। কাজেই ওদের মত শ্রোতা যদি কাছে বসে কেমন করে আর সাধারণ গল্প বলে কথা শেষ করি? অবশ্য তাতে করে সাধারণ শ্রোতার পক্ষে একটু কিরকম মনে হয়, হলোই বা তা বলে কি রোজই একসূরে গান আর গল্প করে যেতে হবে, তবে শাস্ত্র ব্যাখ্যার ষেটুকু রহস্য সেটুকু আর কোথায় বলব? সাধুদের দল থেকে আজ আমার একজন কে বলছিল—ঠাকুর কথাগদুলি বড় শক্ত হয়ে যাচ্ছে। আজ যে একটাও গান হল না, কেবল কোথাকার কোন পণ্ডিত কি বলেছেন সে কথা, ওগদুলি শুনলে আমাদের কি হবে?

“...ঠাকুরমহাশয়, সে কথাতো ঠিকই—মুখুটি মশায় বলল; তবে কিনা সাধারণ লোকে যাতে বেশ মেতে যায়, সেভাবেই আপনাকে কথা লাগাতে হবে।”৬১

শ্রোতার শোনার ইচ্ছা, শ্রোতার প্রস্তুতি, কথকের বলার ইচ্ছা, কথকের নিজস্ব প্রস্তুতি—এর মধ্যে ব্যবধান আছে, বিয়োদ আছে, আবার যোগও আছে। দুটি মিলেই তৈরি হয় আসরের তারতম্য, তা আবার ঠিক করে দেয় বলার তারকে।

আসর সমাজস্থিত, তার বাইরে নয়। ফলে পরিস্থিতি অনুযায়ী কথকের বাচকতা আতিরিক্ত মাত্রা পেতে পারে। প্রতিমা দেবী তাঁর স্মৃতিতে এর সাক্ষ্য ধরে রেখেছেন :

“স্বদেশী যুগের আরম্ভের সঙ্গে সঙ্গেই ‘সখি কেবা শুনাইল শ্যাম নাম’ আর মৃদঙ্গের বোল, শ্রোতাদের আবেগের ধ্বনি এ’ল নীরব হয়ে। ক্ষেত্রচূড়ামণি কথক তখনো কুরুক্ষেত্রের বর্ণনা ও গীতার ব্যাখ্যা করে শ্রোতাদের চিত্তকে রুদ্রসে উত্তেজিত করে রেখেছিলেন। সেটা স্বদেশী আন্দোলনের যুগের সঙ্গে তখনো বেখাপ্পা হয়নি।”৬২

বাইরের সামগ্রিক পরিস্থিতি বদলাচ্ছে, ক্ষেত্রচূড়ামণির কথকতা নতুন মাত্রা পাচ্ছে, গীতা বা কুরুক্ষেত্রের বর্ণনার রুদ্রস তখন নতুন অর্থে মণ্ডিত হচ্ছে। স্থানীয় পরিস্থিতিতেও এইরকম প্রতিক্রিয়ার সম্ভাবনা স্বীকার করা যায়। আত্মজৈবনিক রচনাতে প্রাণকিশোর

গোস্বামীর মতো ‘পদ্রাণ-বস্তা’ এইরকম অবস্থার বিবৃতি দিয়েছেন। ‘বামন ভিক্ষা’ পালায় কথক দানের প্রশংসা করছেন, বলছেন “দানের মত আর কি আছে?” গ্রামের বারুঘো পরিবার, শীল পরিবার এদের দানের কথা বলা হল, দীঘি কাটানোর কাহিনী উল্লেখ করা হল। তাতে সভা থেকে রেগে সাধু সান্ন্যাল উঠে গেলেন। কারণ,

“এই গ্রামের সকলেই জানে সাধু সান্ন্যালের মত কৃপণ আর কেউ নেই। সেই সান্ন্যালের সামনে অত দানের কথা, তাই ঐ কথা তার ভালো লাগেনি।

তিনি আরো ভয় করছিলেন, এর পর কথক যদি সভার দিকে লক্ষ্য করে দানের কথা কিছু বলে ফেলেন তাতে বেশী করে লাগবে এই সান্ন্যালের।”^{৩৩}

এইরকম কোনো প্রত্যক্ষ অভিযুক্ততা কথক প্রাণিকশোরের ছিল কিনা বলা মর্শাকল। কিন্তু কথক ও শ্রোতার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া নিয়ে এতাবৎকাল বাংলা ভাষায় লেখা একমাত্র বইতে এই রকম পরিস্থিতিতে বাদ দেওয়া হয়নি, সেটা ভুললে চলবে না। সামাজিক মূল্যবোধের উপর গল্পের টানে কথক মতামত প্রকাশ করেন, গল্প ও কাহিনীতে মন্তব্য জুড়ে দেন। আসরের শ্রোতারা সমাজস্থ, তাতে তাদের প্রতিক্রিয়া হতে পারে, বাচকতা অভীষ্ট অর্থে না পেঁছাতেও পারে।

আসরে নানা লোকের কাছে কথকতার গল্প নানা অর্থ নিয়ে আসে, শ্রোতারাও তাদের মতো করে কথকের বয়ানের মধ্যে নিজের মানে খুঁজে পায়। শ্রোতা ও কথকের যৌথ চেষ্টার মধ্যে কথকতার বয়ান গ্রাহ্য হতে পারে। যোজিতের সঙ্গে ব্যবধান অতিক্রম করাই তো যোজকের কাজ।

লেখা থেকে বলার প্রক্রিয়া, কথার ঝোঁকে বাক্য বদলে যাওয়া, শ্রোতার দাবিতে গল্প বানিয়ে তোলা, এইসব রওয়ানির মধ্যে পড়ে। কিন্তু কোথাও এইরকম হলে চলবে না যে মূল রস বদলে যাবে, রাম হবে কাপদুরুষ্ণ ও রাবণ হবে পরম স্নেহীল, দেশরক্ষায় রত। তাহলে কথকতায় অনৌচিত্য দোষ ঘটবে, রসভাঙ্গ হবে। সীমা যেখানে টানা হয়, বাঁধুনি সেখানে রওয়ানির সঙ্গে মেলে। এই ক্ষেত্রেও লেখা ও বলার সাম্য দরকার, টানাপোড়েন সেই সাম্যকে জোরদার করার জন্য, ভেঙে দেবার জন্য নয়।

ঙ. কথকতার শৈলীতে আধুনিকতা ও ধারাবাহিকতা

কথকতা সম্পর্কিত একটি মূল্যবান প্রবন্ধে হরিপদ চক্রবর্তী মহাশয় বেশ জোরের সঙ্গে বলেছেন যে কথকতা “একটি অপরিবর্তিত শিল্পধারা।” যাত্রা, ঢপ গান বা পাঁচালিতে পরিবর্তনের তুলনায় প্রাচীন কথকতার সঙ্গে প্রচলিত আধুনিক কথকতার পার্থক্য খুব কম। কাঠামোর কোনোরকম তুলনামূলক আলোচনা তিনি করেননি। প্রবন্ধের উপসংহারে তিনি মতামত জানিয়েছেন মাত্র।^{৩৪}

হরিপদ চক্রবর্তীর মন্তব্য হয়ত তুলনামূলক বিচারে সঠিক। যাত্রা, পাঁচালির অনুষ্ঠান দলগত। অভিনয় ও মঞ্চে নানা কৌশলের প্রয়োগ আজকে সিদ্ধ। ফলে পরিবর্তনের গতিও দ্রুত। পক্ষান্তরে কথকতার ব্যবহারিক শিল্প চাতুর্য কথকের উপর নির্ভরশীল।

কণ্ঠস্বরের চড়াই-উৎরাই দিয়ে এবং সঙ্গীত ও শব্দযোজনা করে সব বোঝাতে হয়। কিন্তু কথকতাতেও বিবর্তনের ছাপ আছে। যতই ধীর গতিতে হোক, কথকতাও পরিবর্তন থেকে পুরোপুরি মুক্ত নয়। পরিবর্তনের উৎস দুটি। এক, শ্রোতার রুচি ও আধুনিক প্রচার-মাধ্যমের প্রভাব। দ্বিতীয়ত, শিল্পীর নিজস্ব বৈশিষ্ট্য।

নব্বইয়ের দশকে দেখছি যে স্বজিবাবু, বাসন্তীদেবী অথবা অবনী অধিকারী হারমোনিয়ম ব্যবহার করেন। উনিশ শতকের কথকের আসরের নানা বিবর্তনে স্বভাবত হারমোনিয়মের উল্লেখ নেই, কারণ তখনো সেটা চালু হয়নি। এটা অবশ্যই একটি পরিবর্তন। মাইক্রোফোনও কথকরা ব্যবহার করেন।

যে সব আধুনিক কথকতার আসর শুনছি বা তাদের পুঁথি দেখছি, তাতে বলা যায় যে ‘চুর্ণী’ প্রয়োগ আজকাল অনুপস্থিত। ওই জাতীয় বর্ণনা বা বিবৃতির সঙ্গে আধুনিক শ্রোতা আদৌ অভ্যস্ত নয়, তাদের কানই তৈরি হয়নি। কবে থেকে চুর্ণী প্রয়োগ কমে শুরু করল, বলা মুশকিল। কিন্তু কুমদবন্ধুর পুঁথিতে ‘সাট’ নেই। পঞ্চাশের দশকে ক্ষান্তিলতার খ্যাতি, ফলে তখন থেকে চুর্ণীর ব্যবহার কমে আসছে বলে অনুমিত হয়। হয়ত বাংলা ভাষা ও সংস্কৃত ভাষার সঙ্গে সাধারণের সামগ্রিক পরিচয় ও তার সঙ্গে সঙ্গে ভাষা প্রয়োগ প্রসঙ্গে রুচির বদল ‘চুর্ণীকে’ ধীরে ধীরে অপ্রয়োজনীয় করে তুলেছে।

প্রচার-মাধ্যমের চাপও এক-আধটু বদল আনে। স্বজিবাবু যুগলমল্লের দীক্ষিত, ‘সীতার পাতাল প্রবেশ’ পালা আসরে কোনোদিন করেননি। শুধু একবার বেতারে করেছিলেন। ধারক বা শ্রাবকও আজকাল দেখা যায় না। সবাই যে সব আসরে পুঁথি বা খাতা সামনে রেখে পড়েন, তাও নয়। সকলেরই একটি পাঠ লেখা আছে, তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু আসরে অনেকেই আজকাল স্মৃতি-নির্ভর। ধারাবাহিকতা থেকে যায় ভাব-বস্তুতে, রসবিন্যাসে। ৬৫ আধুনিক কথকদের রীতি লক্ষণীয়। স্বজিবাবু প্রথাসিদ্ধ মঙ্গলাচরণ করেন। স্বজিবাবুর মঙ্গলাচরণ এইরকম : সুদে পর পর পরিচিত সংস্কৃত শ্লোক আবৃত্তি; রামের বন্দনা স্তোত্র, বাল্মীকি বন্দনা, শিবস্তোত্র, ভগবতী স্তোত্র (স্বর্ষ-মঙ্গল মঙ্গল্যে শিবে স্বর্ষার্থ-সাধিকে ইত্যাদি), কৃষ্ণস্তোত্র (হে কৃষ্ণ করুণাসিন্ধু দীনবন্ধু জগৎপতে ইত্যাদি), মারুতি বন্দনা (নমামি অঞ্জনাসুতং বারুদপুত্রং মহাবলং ইত্যাদি), ব্রজা বন্দনা, পর পর বলা হচ্ছে। এঁদের কৃপায় মুক বাচাল হয়, পঙ্ক গিরি লঙ্ঘন করে। তারপরে বাংলা গান, “রাম নাম বল, বল, এই নাম কর সার” (কীর্তনাঙ্গ সুদ)। বাংলা গদ্যে তুলসীদাসী বচন আবৃত্তি, পরে বচনটির বিস্তৃত অনুবাদ : রামায়ণ পাঠ সর্বমঙ্গলকর ও পাপহর, বৈতরণী পারের তরণীস্বরূপ। কৈলাসে শিবের মুখে পার্বতী অপূর্ব রামকথা শ্রবণ করছেন, সেইটা যেন কৃপাপ্রাপ্ত স্বজিবাবু বলছেন। গদ্যে আবেগ মিশিয়ে স্বজিবাবু বলেন, রামকৃপাতেই তাঁর পাঠ করা সম্ভব হচ্ছে, “যন্ত্র আমি, যন্ত্রী তুমি, রথ আমি, রথী তুমি, যেমন পরিচালনা করবে তেমনিই পরিচালিত হব, যেমন বাজাবে তেমনিই বাজব।” আবার গান, “আমার হৃদয়-

মন্দির মাঝে এসো রাম ধনুধারী” ইত্যাদি। তার পরে আখ্যান শুরুর। ৬৬
পালার শেষও প্রথাগত। ‘রাম বল মন’ গানের কলি। তারপরে চিরপরিচিত,

“যে গায়, যেবা গাওয়ায় যেবা করায় শ্রবণ,

অনায়াসে হয় তাদের পাপের বিমোচন।”

চিরজীবী হনুমানকে সেইদিনের মতো বিদায় দেওয়া হয়, তিনি তো আসরে হাজির ছিলেন। (‘নিজস্থানে গমন করুন পবন নন্দন।’) কৃতিবাস পান্ডিতের জন্ম শুভক্ষণ, তাঁকে প্রণাম জানানো কর্তব্য। এরপরে আগামী দিনের পালার বিষয় বলা হয়। সবার শেষে আসরে ‘ভক্তজনের’ সম্মিলিত কণ্ঠে ‘রামধনু’ দিয়ে অনুরূপের সমাপ্তি করা হয়। “ঈশ্বর আল্লা তৌর নাম” এই ছত্রটি গাওয়া হয় না।

একভাবে বিন্যস্ত মংগলাচরণ ও সমাপ্তিকরণ-এর মাধ্যমে স্বিজবাবু প্রত্যেকটি পালার ‘ফ্রেমটি’ বেঁধে দেন। এই সরহন্দাটি প্রথাগত। ‘রামধনু’ অবশ্য সংযোজিত, বাঙালি কথকতায় এর প্রয়োগ ঊনবিংশ শতকে ছিল কিনা সন্দেহ। কিন্তু স্বিজবাবুর উদ্দেশ্য স্পষ্ট। পালার রামায়ণ, রাম-পরিকল্পনা সবাই আছেন, আছেন ভক্ত কবিরা, আদি কবি বাঙ্গালী, গোস্বামী তুলসীদাস ও পান্ডিত কৃতিবাস। এঁদের বার বার স্বিজবাবু ছুঁয়ে যান, ‘সনাতন কাব্যবীজ’-এর আধার তো এই মহাকাব্যরা।

স্বিজবাবুর কথকতা গল্পপ্রধান। আখ্যানটা বড় কথা, তবু কথা মাঝে মাঝে থাকে, গান ফাঁকে ফাঁকে আসে। কথা ভক্তিরসপ্রধান। রাম্ফস বা হনুমান চরিত্র দিয়ে প্রয়োজনমত স্বিজবাবু হাস্যরস আনেন। রামের সেতুবন্ধনে কাঠবেড়ালিকে হনুমানের তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা ও তাই নিয়ে কাঠবেড়ালির অভিযোগ, স্বিজবাবু গভীর স্বরে বলেন ও আসরে বাচারা হেসে উঠছে, এইটা আমার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা। ৬৭

স্বিজবাবুর সূত্রও বিভিন্ন, তুলসীদাসী কৃতিবাসী থেকে যোগবাশিষ্ট রামায়ণ, রামরসায়ন ইত্যাদি। কিন্তু আখ্যানে লম্বা সংস্কৃত শ্লোক তিনি বলেন না, কথায় দীর্ঘ বাক্যও নেই। রামায়ণের মধ্যে প্রয়োজনে মহাভারতের গল্প এনেছেন, শবরীর উপাখ্যানে বিদুরের কৃষ্ণ সেবার কথা সাজিয়েছেন। ৬৮

একটি দেশজ উপাখ্যানে কীভাবে অভিযোজন করা হয়েছে, দেখা যেতে পারে। তরণীসেন কৃতিবাসের নিজস্ব সৃষ্টি। রামের প্রেমের উত্তরে বিভীষণ ঠারে-ঠোরে তরণীর পরিচয় দিয়েছেন, “প্রকারেতে দিলেন প্রকৃত পরিচয়।” এর পরে যুদ্ধ। কৃতিবাসের আখ্যানের মাঝে স্বিজবাবু নিজের কথা জড়ুলেন, “এই হল ত্যাগ... ঘর-দোর নেই, বিয়ে থা হল না, সংসার ত্যাগ করে বেরিয়ে গেলাম, আর মহাপ্রভুর মত সংসারত্যাগ, বুদ্ধদেবের মত রাজ্যধন ঐশ্বর্যপূর্ণ সংসার ত্যাগ, এ দুটো সংসারত্যাগে পার্থক্য নেই? আজ একমুঠো অন্নের সংস্থান করতে পারলাম না, বহু চেষ্টা করলাম, ভাঁড়ে ভবানী, বললাম আজকে আমি আহারে সংযম করেছি আর চতুর্বিধায় [?] সামনে পড়ে আছে তবু আহারে সংযম করেছি, এ দুটোর পার্থক্য নেই?” ৬৯ স্বিজবাবু তত্ত্বের প্রসঙ্গে বেশি বাক্য ব্যয় করেন না। কিন্তু গল্পের নাটকীয়তা ও নিগূঢ়ার্থ বাড়াবার জন্য কাহিনীতে

মোচড় দেন, কৃতিবাসের রওয়ানির রদবদল করেন। বিভীষণের পরামর্শে রাম ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ করেন ও তরণী মারা যাবার পর বিভীষণ কাঁদেন, বলেন,

“প্রভু করি নিবেদন।

মরিল তরণীসেন আমার নন্দন।”

রাম সান্ত্বনা দিলেন। তখন বিভীষণ বলেন,

“বিভীষণ বলে, প্রভু, নিবেদি চরণে।

পদ্রুশোকে কাঁদি হেন না ভাবিহ মনে ॥

ধন্য ধন্য পদ্রুগবন্ত আমার সন্তান।

মরিয়া তোমার হস্তে পাইল নির্বাণ।

...

...

...

শত্রুভাব করি সবে পাইলা উদ্ধার।

শ্রীচরণ সেবা করি কি লাভ আমার ॥

যদি পারিতাম দেহ করিতে পাতন।

বৈকুণ্ঠনগরে মম হইত গমন ॥”^{৭০}

পালায় শ্বজবাবু বিভীষণের আক্ষেপকে অন্যভাবে রেখেছেন। পদ্রুগের মৃত্যুর পর সরাসরি বিভীষণ ধনুর্বাণ হস্তে রামকে যুদ্ধে আহ্বান করেছেন। “তরণীর যুদ্ধ শেষ— এবার আমার পালা। তরণী বালক, সে যুদ্ধ শেখেনি, ধরো ধনুর্বাণ, যুদ্ধ করো মোর সনে,... না তুমি আমার মিত্র নয়, তুমি আমার পদ্রুগস্তা ॥” পালায় রাম বিভীষণকে প্রতিশ্রুতি দিলেন যে তরণীকে তিনি বাঁচিয়ে দেবেন। বিভীষণ তখন জানালেন যে অন্তর্যামী হলেও রাম ভক্তহৃদয়ের মর্ম বুঝছেন না। রামের মিত্রতায় লাভ নেই, লাভ শত্রুতায় আছে, কারণ শত্রুতা করেই তো তরণী বৈকুণ্ঠে গেল। কৃতিবাসে বৈকুণ্ঠে না যাবার জন্য রাম বিভীষণকে সান্ত্বনা দেন এই বলে,

“শ্রীরাম বলেন দুখে তাজ বিভীষণ ॥

যেই তুমি সেই আমি ইথে নাই আন।

সাধুর জীবনমৃত্যু একই সমান ॥

যতদিন রবে তুমি অবনীভিতরে।

আমার সমান দয়া তোমার উপরে ॥”

শ্বজবাবুর পালায় রাম বিভীষণকে বলেন—“বৈকুণ্ঠ যে তোমার মধ্যে এসে গেছে। বিগত কুণ্ঠা যেখানে, সেখানেই তো বৈকুণ্ঠ।” তরণীসেনকেও ছাপিয়ে যান বিভীষণ।

শ্বজবাবুর তরণীসেন বধ পালা প্রকৃতপক্ষে বিভীষণের ভক্তির পরীক্ষার ইতিবৃত্ত। কৃতিবাসের মূল রসকে ব্যাহত না করে বিভীষণের ব্যবহারকে একটু বদলে দিয়ে শ্বজবাবু গল্পে প্রতিসরণ আনলেন।

শ্বজবাবুর পাঠভাষ্যের সঙ্গে বেতারে বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের মহাভারতের গল্প বলার ভাষ্যের

মিল আছে। প্রভাবের কথা বলাই না, সাধুজ্যের কথা আনাছ। শ্বিজবাবু গান করেন, বীরেন্দ্রকৃষ্ণ গল্পে আদৌ গান গাইতেন না কিন্তু উভয়ে ভাষাকে এক তারে বাঁধেন। শিশু, সাধু অথচ সহজ ভাষা। চারদ্বানুযায়ী যে ভাষার রদবদল হত তা কিন্তু নয়। স্বরে অভিনয়াংশ কম, মেয়েদের সংলাপও এক স্বরে বলেন, কোনো ‘মেয়েলি’ ভাব আনেন না। শ্বিতীয়ত ঘটনানুযায়ী ছোট ছোট ভাগে আখ্যানকে বিভক্ত করে বলা হয়। নিজের মন্তব্য, প্রশ্ন বা গান (শ্বিজবাবুর ক্ষেত্রে) এই ছোট ছোট ভাগগুলির সংযোজক। ফলে গল্পের রঙারানি তৈরি হয়, পরের ঘটনাটি শোনার জন্য কোতূহল উসকে দেওয়া হয়। বিভূতিবাবু কথকতার ও গল্প বলার এই শৈলীকে ধরতে পেরেছিলেন। বাবা হরিহরের পাঠ শোনে অপদূ,

“এদিকে আবার যখন সিন্ধু সৌবীরের রাজা রহুগন তাঁহার স্বরূপ না জানিয়া রাজর্ষি ভরতকে শিবিকাবাহক নিযুক্ত করেন—তখন হইতে কোতূহলে ও উৎকণ্ঠায় তাহার (অপদূর) বন্ধ দূর দূর করে, মনে হয় এইবার একটা কিছুর ঘটিবে, ঠিক ঘটিবে।”^{৭১}

ছোট ছোট ঘটনাগুলির নিজস্ব ভাব আছে। কোনোটা হাসির উদ্রেক করে, কোনোটা বা দুঃখের। এই সব টুকরো টুকরো ভাব মিলে গোটা পালাটার মধ্যে যখন এক সামগ্রিক রস ফুটে ওঠে, তখনই কথকতা শিল্পেপাক্তিগ্ণ হয়, গল্প বলাটা হয়ে ওঠে আর্ট। অবনীবাবুর কথকতাটা প্রধানত তবু শৈলীতে শ্বিজবাবুর ‘রামায়ণ’ সঙ্গে তাঁর পার্থক্য আছে। অবনীবাবুর পাঠ অনেকটা পাঁচালির ঢঙে, আখ্যানে গানের চাইতে পয়ারে লেখা পদ্যাংশ বেশি।^{৭২} অবনীবাবুর মূল উৎস জগন্নাথ-রামপ্রসাদী রামায়ণ, অষ্টাদশ শতকে রাঢ় অঞ্চলের বিখ্যাত সহজিয়া সাধকের লেখা। “অন্ততঃ অধ্যাত্ম মত, একত্র করিয়া যত, রচনা বিবিধ রসধাম।”^{৭৩} মঙ্গলাচরণের বিন্যাস এক, খালি সংস্কৃত পদগুলির বেশিরভাগ বাংলা পয়ারে গীত। আখ্যান ছন্দে বিধৃত, সংলাপও প্রায়শ তাই। পালার আগে একটি দীর্ঘ বন্দনাগান আছে। তাতে পরিচিত সমস্ত মার্গায় দেবতা আছেন, তদার্তিরক্তও কেউ কেউ আছেন। দীর্ঘ বন্দনাগানের শেষ অংশ তুলছি,

“পিতামাতা চরণকমলে প্রণাম জানাই।

পিতামাতার সম গুরুভাই এই জগতে আর কেহ নাই ॥

আর শিক্ষাগুরু দীক্ষাগুরু বন্দিন চরণ।

এই আসরে আসন শ্রীরাম লক্ষণ ॥

এই আসরে এসো মাগো বীণা [?] বাদিনী।

সঙ্গে করি লয়ে এসো ছয় রাগ আর ছত্রিশ রাগিণী ॥

মাগো মা, তোমার কৃপাতে মাগো রামের গদ্য গাই।

তুমি মুখ ফিরালে বাক্য নাই পাই ॥

কলিযুগের দেবতা বিন্দু দেবী বিষহরি।

পদ্মফুলের উপর জন্ম হয় যার শিবের কুমারী ॥”

কোনো পরিশীলিত আসরে, হারিসভায়, রামায়ণী বন্দনাগানে মনসার প্রবেশ অপ্ৰত্যাশিত। কিন্তু অবনী অধিকারীর বন্দনা দেখায় যে রামায়ণী পালাতে, বন্দনার বিন্যাসে আঙ্গুলিক সংস্কৃতির নানা সূত্রে, সর্বকিছু ঢুকে পড়তে পারে। গ্রামে যাদের ক্ষমতা স্বীকৃত, লৌকিক আসরের বন্দনাগানে তাদের বাদ দেওয়া বিপদজনক।

ইন্দ্র ব্রাহ্মণ নন, তাই গৌতম মূর্খনি তাঁকে সামগান শেখাননি। তখন ছন্দবেশী ইন্দ্র অহল্যার কাছে সামগান শেখেন। অবনীবাবুর পালায় শৃঙ্গার বা জৈবিক আকর্ষণ গোঁণ।

অবনীবাবুর পালায় বিন্যাসও একটু আলাদা। ছোট কথা, মূল সংলাপ গানে, আবার ছোট কথা। নমুনা দেওয়া যাক,

“এমন সময় দেবরাজ ইন্দ্র গৌতম মূর্খনির বেশ ধারণ করিয়া অহল্যার কুটিরে এসে উপস্থিত হইল। আর এখানে,

‘অহল্যা গৌতম জ্ঞানে তারে করে সম্ভাষণ।

বলে, আজি কেন প্রাতঃকালে গৃহে আগমন ॥’

দেবরাজ ইন্দ্র বলে

‘ওগো তব রূপ হইল স্মরণ।’

তোমার গানের রূপ আমার মনে পড়ল।

তাই, ‘কেমনে করি বল তপস্যা আচরণ ॥’

আমি শূন্যেছিলাম ভগবান তিনি গানে বড় সন্তুষ্ট হন। ...অভিধানে পাণ্ডিত্যগণ অর্থ করেছেন সামবেদ মানে হল গান, গানের সুরে ভগবানকে ডাকা, এর নাম সামবেদ। দেবী তুমি আমাকে একখানি গান শোনাও।

‘একদিন এ কারণে দিলেন অহল্যাদেবী তারপরে গাহিলেন গান।

গানের সুর শিখন করি দেবরাজ ইন্দ্রপুত্রে যান ॥”

অবনীবাবুর কথকতায় পাঁচালি গানের প্রভাব আছে। গান গদ্য সংলাপের অনুসারী নয়। বরং গানের মধ্যে ঘটকালির কাজ গদ্য করেছে।

ক্ষান্তিলতা দেবীর কথা গদ্যে। তাঁর কথার চলন আখ্যায়িকার ঢঙে নয়। শিবজীবাবুর কথকতায় গল্পের আধারে ব্যাখ্যা থাকে। কিন্তু তত্ত্ব ব্যাখ্যার প্রমাণ ও দৃষ্টান্ত হিসাবে ক্ষান্তিলতা দেবী গল্পের উপস্থাপনা করতেন বা কুমুদবন্ধু পালা লিখতেন। দুইজনের ভণ্ডি ও মেজাজে পার্থক্য এইখানে।

‘কুন্তীস্তুব’ পালায় ক্ষান্তিলতা দেবীর সব গুণ, কুমুদবন্ধুর লেখার সব বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায়। প্রসঙ্গ নির্দেশ, দীর্ঘ ব্যাখ্যা ও সংলাপ, শ্লোক ও নানা ভাষ্যের অংশ এবং নানা গান। পালায় আরম্ভে তিনি বলেন যে কুন্তীদেবীর শুভাবলীর মধ্য দিয়ে কুন্তীদেবীর বর প্রার্থনা প্রসঙ্গে ‘ভগবানের লীলাগুণ কথা’ বিষয়ে ‘কিছু আলোচনা’ করবেন।

এই ‘আলোচনাই’ হল তাঁর কথকতার বিন্যাস। অঙ্গুনের হাতে অশ্বখামার পরাজয় ও পরীক্ষিতের জীবনরক্ষা হল প্রেক্ষাপট। দৈবপায়ন হুদে দূষণের উদ্ভঙ্গ থেকে অশ্বখামার পাণ্ডব শিবিরে নিশি অভিযান ও পরাজয়, উত্তরার দ্রুণরক্ষা ইত্যাদি একটানা গদ্যে বলা হয়েছে, প্রসঙ্গ নির্দেশ করা হয়েছে। যখন প্রভাতে কৃষ্ণ পাণ্ডব শিবির ত্যাগ করতে উদ্যত তখন তাঁর সঙ্গে কুন্তী কথোপকথনে লিপ্ত হলেন। বিবৃতিতে বোঝানো হয়েছে যে কেন কৃষ্ণ পাণ্ডববন্ধু, কেন কৃষ্ণ পরীক্ষিতকে রক্ষা করলেন। কুন্তীর মুখে ধূম্রার মত ফিরে এসেছে, কেবল একটি বিষয় : কৃষ্ণকে দেবার মত পাণ্ডবদের দুইটি বস্তু আছে, ‘ব্যথা মাখা অশ্রুজল’ ও ‘অবনত মস্তকে প্রণাম’, এই দুইটিকে নানাভাবে নানাগানের সংযোগে ক্ষান্তিদেবী তাঁর কথায় ব্যাখ্যা করেছেন। ব্যাখ্যাতে প্রায়শই সংলাপ দীর্ঘ। কৃষ্ণের প্রতি সম্বোধনের উদাহরণ দেওয়া যাক, “হে আমার করুণানিধান, হে আমার বিপদভঞ্জন, হে আমার দীন দয়াল, হে আমার পাণ্ডবসখা, হে আমার কাঙ্গালের ঠাকুর” ইত্যাদি।^{১৪}

একই বিষয়ের নানা বিচার কথকতাকে ব্যাখ্যামূলক করে তোলে। গল্পের রঞ্জনের চেয়ে ভাবের তাৎপর্য প্রতিষ্ঠা হয়ে ওঠে লক্ষ্য। ক্ষান্তিদেবীর কথকতার শৈলী তাই। একটি কেন্দ্রীয় ভাবকে নানা ভঙ্গিতে আলাপ করার মধ্যে নিহিত আছে তাঁর পাঠের আঙ্গিক। নানা টুকরো টুকরো ভাবকে নিয়ে অন্য এক সামগ্রিক ভাবের আবেদন ফোটানো তাঁর অভীষ্ট নয়।

বাসন্তীদেবীর বৈশিষ্ট্য মঙ্গলাচরণে।^{১৫} তিনি এখানে নতুন ভঙ্গি উদ্ভাবন করেছেন। প্রথমে তিনি কোনো একটি দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা থেকে পালা আরম্ভ করেন। মালদহের এক সভায় গিয়ে আরম্ভ করেন যে তাঁর দামি জিনিস হারিয়েছে, চোরের নামও জানেন, কেউ খুঁজে দিতে পারবে কিনা। সভায় সাড়া পড়ে যায়। তখন তিনি বলেন যে তাঁর হৃদয় হারিয়েছে, চোর প্রীকৃষ্ণ স্বয়ং। আমার শোনা আসরে তিনি আরম্ভ করেন যে একজন পরিচিতের (রামবাবু) সঙ্গে তাঁর অনেকেদিন দেখা সাক্ষাৎ হয়নি, কারণ তাঁর মেয়ের বিয়ে ছিল। সেই বিয়েতে অলঙ্কার দেওয়া হয়েছে, ‘কৃষ্ণ নাম শ্রবণ কুণ্ডল’, যাতে মেয়ে সবসময় কানে দিতে পারে। সেই বিয়ের অনুবঙ্গে বলেন যে শ্রোতারাও প্রত্যেকে কন্যাদায়গ্রস্ত, তাঁদের ঘরে দুইটি বয়স্কা কন্যা আছে। রীতি ও মতি তাদের নাম, তাদেরও সুপাত্রস্থ করতে হবে। এইভাবে দৈনন্দিন অভিজ্ঞতাকে রূপক হিসাবে ব্যবহার করে তিনি পালার উপস্থাপনা করেন।

প্রণাম জানানো হয় গুরুদেব, গ্রন্থকে, গ্রন্থ প্রতিপাদ্য শ্যামসুন্দর ও রাধারাণীকে, রচয়িতা ব্যাসদেবকে, বক্তা শ্রদ্ধদেব ও শ্রোতা পরীক্ষিতকে। এবং অবশেষে অতীত ও বর্তমানের উপস্থিত ও অনুপস্থিত বৈষ্ণব ভক্ত শ্রোতাকে প্রণাম করে তিনি ভাগবতী কথা শ্রদ্ধ করেন। তাঁর এই রীতি প্রধানতঃ।

বাসন্তীদেবীর কথকতাও ব্যাখ্যামূলক। গোবিন্দ অধিকারীর গান, মহাভারতের কাহিনী, লৌকিক দৃষ্টান্ত সবই আনা হয় তত্ত্ব প্রতিবেদনের উদ্দেশ্যে। বাসন্তীদেবীর

পাঠে কিন্তু নাটকীয় সংলাপ কম। তার বর্ণনা গীতি-নাটিকার আকারে বিন্যস্ত নয়। বরং গীতি-কথিকার চণ্ডে তিনি তাঁর বক্তব্য সাজান। শৈলীতে আধুনিক কথকদের মধ্যে পারস্পরিক পার্থক্য থাকা স্বাভাবিক। ধরনীধর বা ক্ষেত্রমোহনের শৈলী কী ছিল, বলা যায় না। যারা বর্তমানে কথকতা করছেন, তাঁরা কেউ উনিশ শতকের কথক পরম্পরার লোক নন। অতএব ধারাবাহিকতার কথা জোর দিয়ে বলা যায় না। বহিঃরঙ্গে পরিবর্তন এসেছে। কিন্তু কথকতা পৌরাণিক আখ্যানমূলক, তার মূল রস ভক্তি। এই অন্তরঙ্গে বোধ হয় পরিবর্তন আসেনি। কিন্তু শ্রোতা বদলেছে, ভাষায় রুচি একরকম নেই, দৈনন্দিন অভিজ্ঞতায় নানা পরিবর্তন এসেছে। অনুষ্ণব বোঝাতে গিয়ে, ‘ঘটকালি’ করার সময়, গান, পালার সংলাপ ও বিন্যাস, উদাহরণ চয়ন যুগোপযোগী না হলে আসর জমানো অসম্ভব। আজকের কথকরা এই কথা জানেন।

□ পর্ব / ৫ □

শ্রোতার জগৎ

সদুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের পিতৃকুলের আর্থিক অবস্থা যে রকমই হোক না কেন, মামার বাড়ি বেশ সচ্ছল ছিল। মাতামহ ছিলেন হাওড়ার শিবপুরের ছোটোখাটো জমিদার, ইংরেজ সওদাগরের হউসে বড়োবাবু। এমন অবস্থায় যা হয়। উনিশ শতকীয় যৌথ পরিবারে জুটে গিয়েছিল এক গরিব পোষ্য জ্ঞাতি। সদুনীতিবাবুর মানিকাকা। এই অর্ধপোষ্য গরীব আত্মীয় সবার উপহাসের পাত্র। ফাই-ফরমায়েশ খাটা তাঁর অবশ্যকর্তব্য। যে কোনো বৃহৎ কাজ-কর্মে জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ করার দায় বর্তিত মানিকাকার উপরই। সাদামাটা গেঁয়ো মানুষ, বিদ্যার দৌড়ও সামান্য। দুপুর বেলা একপাল-বাচ্চাকে তিনি তাঁর গাঁয়ের গল্প বলতেন। জমাটি নিমন্ত্রণ রন্ধার মজাদার কাহিনী আর মাঝে মাঝে যাত্রায় দেখা, ‘কথকতায় শোনা পালা, অজামিলের কথা, রুদ্ভাগদ রাজার একাদশী, ধ্রুবের তপস্যা’ ইত্যাদি। সেই মনুহুতে ভাইপো-ভাইঝি বা ভাগনে-ভাগনিদের কাছে মানিকাকাই কথক হতেন—‘এ সব গল্প বেশ শ্রুতিরোচক আর মনোমোহন করে শোনাতেন’। কথক ঠাকুরের দৌড় কেবল আসরে সীমাবদ্ধ থাকে না, মানিকাকার মতো মানুষের মাধ্যমে একনিষ্ঠ শিশু শ্রোতাদের জমাটি আসর বসে।

মানিকাকা কথকতার আসরে হাজিরা দিতেন। কারণ ভাল ‘আক্ষেপের কথা’ শোনা তাঁর বাই ছিল। “চৌধুরি পাড়ায় কথকতার আসরে কথক ঠাকুর যখন কোন গভীর বিষয় নিয়ে বাগাডম্বর ক’রে ব’লে যেতেন, মানিকাকা নির্বিক্রম চিত্তে শুনতেন, আর অনেক সময়ে চোখ দিয়ে তাঁর ঝর ঝর করে জল পড়ত। তিনি তখন একাগ্র মনে, তাঁর

বর্ণনা অনুসারে, দুটো ‘আক্ষেপের কথা’ শুনছেন। তাঁর এই ‘আক্ষেপের কথা’ শোনার আগ্রহ আমাদের আছে একটা রসিকতার বিষয় হ’য়ে দাঁড়িয়েছিল।”^১

অবজ্ঞের মানিকাকা খুঁজে বেড়াতেন কোথায় ‘আক্ষেপের কথা’ শুনতে পাওয়া যাবে। বড়লোক আত্মীয়রা তাই নিয়ে ঠাট্টা করতেন। পরিবারের ক্ষমতা বিন্যাসের নিম্নতম বিন্দুতে অবস্থিত দ্বর্ভাগ্য বোকাসোকা মানিকাকা কিন্তু বার বার ওই রকম আসরে ছুটে যেতেন, এমনকি বাড়ির গুরুদেবকেও রেহাই দিতেন না, তাঁর কাছ থেকেও “গোটাকতক ‘আক্ষেপের কথা’” শোনবার দাবি জানাতেন। ওই রকম আসরে তিনি তাঁর মনের আশ মেটাতে পারতেন, কাঁদতেন, তাঁর ‘একাগ্রতা’ তাঁর বিদ্রূপকারীদেরও চোখ এড়াত না।

বড়লোক আত্মীয়রা হাসতেই পারেন, কিন্তু ভট্টনায়ক, আনন্দবর্ধন, অভিনবগুপ্তদের কাছে এই জাতীয় অভিজ্ঞতার মূল্যের শেষ ছিল না। রস সৃষ্টির আলোচনায় ভুক্তিবাদী, ধ্বনিবাদী বা রসধ্বনিবাদীরা সহৃদয়, সামাজিক বা রসজ্ঞকে আলোচনার কেন্দ্রে বসিয়েছেন। রসের প্রতীতি রসচর্চা বা রস আশ্বাদনে, সহৃদয় বা সামাজিক সেই রস আশ্বাদনে সক্ষম। সহৃদয়ের রসচর্চা ভিন্ন রসের অনুভব প্রকাশবেদ্য নয়।

“ধন্যালোকের” লোচন ঢাঁকায় ভরতের অনুসারী হয়ে অভিনবগুপ্ত রায় দিয়েছেন :

“যোহর্থঃ হৃদয়সংবাদী তস্য ভাবো রসোন্তবঃ।”^২ রসবিচারে সহৃদয়ের এইরূপ প্রাধান্যকে রসধ্বনিবাদীদের বৈলক্ষণ্য বলে সুশীলকুমার দে মহাশয় মনে করেছেন। ভারতীয় নন্দন-তত্ত্বের সবচেয়ে প্রভাবশালী প্রস্থানের বস্তুব্যে শিল্পী বা কবির সৃজনী প্রতিভার যথাযথ বিশ্লেষণ হয়নি, পশ্চিমী পাঠকের কাছে, এটা ছিল তাঁর ‘আক্ষেপের’ বিষয়।^৩ কবি-প্রতিভার বিশ্লেষণে ধ্বনিবাদীদের অবহেলা প্রসঙ্গে দে মহাশয়ের অনুযোগে অতিশয়োক্তি আছে। কিন্তু এতে কোনো সন্দেহ নেই যে সহৃদয় বা সামাজিকই রস আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে, কারণ তার রসাস্বাদন বা রসচর্চার মধ্য দিয়ে রসের প্রকাশ, “রসমানতাই ইহার প্রাণস্বরূপ”। তাই কাব্যরসের আধার কবিও নন, কাব্যও নয়, সহৃদয় পাঠকের মন, সংগীত ও অভিনয় প্রসঙ্গেও একই কথা প্রযোজ্য।

জ্বরদন্ত কথক নন, আলোচনার আসরে রসবোধের বিষয়ী হিসাবে অভাজন মানিকাকাই জাঁকিয়ে বসবেন। কিন্তু কীভাবে? আমাদের কথকরা কি এতটা জানতেন? রসের ধারণা কি তাঁদের আয়ত্তে ছিল? বেশির ভাগ কথকই বৈষ্ণব। ভাগবতী কথকতার বহু পূর্নথিতে শ্রীধর স্বামী ও বিশ্বনাথ কবিরাজের টীকার উল্লেখ পাওয়া যায়। বৈষ্ণব ধর্মতত্ত্ব রসতত্ত্বের নামান্তর, ভক্ত ও ভগবানের সম্পর্কে নানা রসের মাধ্যমে বর্ণিত করা হয়েছে। সুতরাং কথক ঠাকুর রসতত্ত্বের ঐতিহ্য সম্পর্কে অনবহিত থাকতেন, একথা মনে করা সঙ্গত নয়। সরাসরি প্রমাণও আছে। কথকদের রচিত ‘সংগ্রহ গ্রন্থে’ আখ্যানাংশ নির্বাচন ও ভাগ রস অনুযায়ী করা হত। যেমন :

‘রামায়ণ কথা সংগ্রহ’তে আরম্ভেই বিন্যাস এরকম: “নবরসঃ কিং। শৃংগারো-
যথা সীতাহরণ শূর্ণনখাঃ গমনাদিঃ ॥ ১ ॥ বীরো যথা রাবণ কুন্তকর্ণবধাদয়ঃ
৥ ২ ॥ করুণো যথা রামস্য বনগমনাদিঃ ॥ ৩ ॥ অম্ভুতো যথা সাগরবন্ধনাদিঃ

১৪ ॥ হাস্যোযথা দশরথগৃহে রাম জন্মঃ ॥ ৫ ॥ ভয়ানকোযথা রাবণমারীচ
সম্বাদঃ' ইত্যাদি ॥ ৪

আবার বর্ষায়ান কথক কুমুদবন্ধু বলেন যে, 'কথকতা খুব শক্তি বাবা, কথায় নবরসের
বিন্যাস করতে হবে তো।' ৫

সরাসরি ঐতিহাসিক প্রমাণসূত্র ছাড়াও বলা যেতে পারে যে কথকতা একটা বিশেষ
রকমের পাঠ। এই পাঠের মাধ্যমে কীভাবে সহৃদয় বা সামাজিক ভরতের হারিণ শিশুর
হারানোর বেদনায় আকুল হন, লঙ্কায় হনুমানের কীর্তিকলাপে হেসে খন হন?
ভরত বা হনুমান কেউ তাঁর পরিচিত নন, তাঁদের অভিজ্ঞতার তিনি সরাসরি
শরিকও নন। শ্রোতার নিজের বোধ স্বগত, ভরত বা হনুমানের ভাব পরগত। লৌকিক
ভাবে পরিমিত ছাপিয়ে যাওয়া যায় কীভাবে, কীভাবে কথকের উচ্চারিত শব্দের
জোরে, পাঠের ঘোঁকে অন্য বিষয় 'সহৃদয় হৃদয়-সংবাদী' হয়, বিষয়ের 'চমৎকৃতিতে'
সামাজিক-এর 'তন্ময়ীভবনতা' দেখা যায়, অতি সাধারণ শব্দ রসধ্বনিতে রূপান্তরিত হয়?
এই প্রশ্ন তাত্ত্বিক। নবম থেকে একাদশ শতকে, নানা প্রস্থানের নানা বিতর্কের মধ্য
দিয়ে হারিয়ে যাওয়া পুস্তক "হৃদয় দর্পণের" লেখক ভট্টনায়ক অথবা "ধ্বন্যালোকের"
অজ্ঞাতনামা কারিকাকার, বৃত্তিকার আনন্দবর্ধন এবং লোচন টীকাকার অভিনবগুপ্তরা
সদলবলে এই প্রশ্নের মোকাবিলা করেছেন। এই প্রসঙ্গে কথকরা এই তত্ত্বের সব
অনুপস্থিত সম্পর্কে পূর্ণ সচেতন ছিলেন কিনা, তা অবাস্তব। রসসৃষ্টির ক্ষেত্রে শ্রোতার
ভূমিকার সাধারণ বিচারেই রয়ে গেছে তত্ত্বের প্রাসঙ্গিকতা।

তাঁদের রচনানুসারে, শব্দের সংকেতিত করার ক্ষমতা মান্য, বলা হয়েছে "ধ্বননং শব্দস্যেব
ব্যাপারঃ" "শব্দজাঃ শব্দা" ধ্বনি বলে অভিহিত। কিন্তু শব্দের মধ্য দিয়ে অভিধা ও
লক্ষণার বা তাৎপর্ষের শক্তি ছাপিয়ে যে ব্যঞ্জনাভ্যন্তর বোধ বা ব্যঙ্গ অর্থ সৃষ্টি হয়,
ধ্বনিবাদীদের কাছে সেটাই ধ্বনির বিশেষ পারিভাষিক অর্থ। শব্দের নিজস্ব শক্তিতে
এই ব্যঙ্গনার ক্ষমতা নিহিত আছে, ব্যঙ্গনার স্বতন্ত্র বোধে রস জাগ্রত হবার সম্ভাবনা
থাকে। "শব্দনং শব্দঃ শব্দব্যাপারঃ, ন চাসাবিভাষাদিরূপঃ, অপি ত্বাভুতঃ, সোহপি
ধ্বননং ধ্বনিঃ।" বস্তুর উচ্চারিত শব্দ ব্যঞ্জনা নামক বিশিষ্ট শক্তির দ্বারা শ্রোতার বা
সহৃদয় বা সামাজিকের মনে অভিজ্ঞতাজনিত বাসনাদি সংস্কারের উদ্রেক করে, বর্ণিত
বিষয়ের সঙ্গে তন্ময়ীভবনতার প্রাপ্তিযোগ হয়। ৬

কিন্তু এই স্তরেই ভট্টনায়ক বা অভিনবগুপ্ত ব্যঙ্গনার দ্বারা রসসৃষ্টির দুইটি ধারণার
নির্দেশ করেছেন। এই তন্ময়ীভবনতা বা চিত্তবৃত্তির সঙ্গে একাত্মতা অলৌকিক, এই
অনুভবনের আত্মবাদের সঙ্গে লৌকিক সুখ-দুঃখবোধের অনুভবের পার্থক্য আছে।
রসচর্চা লৌকিক ভাবের পরিমিতত্বকে অতিক্রম করে, শব্দ ব্যঙ্গনার এতই ক্ষমতা।
বাল্মীকির আদি শ্লেোক নিয়ে আলোচনাকালে বলা হল যে "ইহা লৌকিক শোক ইহা
পৃথক (লৌকিকশোক ব্যতিরিক্ত) এবং নিজের চিত্তবৃত্তির যে বিগলিত অবস্থায় ইহা
আত্মবাদিত হইতেছে, তাহাই ইহার একমাত্র সারবস্তু। পরিপূর্ণ কুন্ত থেকে যেমন জল

উচ্ছলাইয়া পড়ে (রসপরিপূর্ণ কুম্ভোচ্ছলন) তেমনই চিত্তবৃত্তির স্বাভাবিক নিঃশব্দিতার জন্য বিলাপবাক্য ক্ষরিত হয়।^{১৭} রসের এই উচ্ছলন প্রবণতার জন্য শোক আর ক্রোধের একান্ত শোক নয়, বাস্তবিকর নিজস্ব দুঃখ নয়, শোক সহৃদয়ের চৰ্ণাযোগ্য। কিন্তু এই চৰ্ণা সম্ভব, লৌকিক অনুভবের পরগতত্ব বা আত্মগতত্ব অতিক্রম করা যায়, “রসাদি বিষয়ে ভাবকত্বের দ্বারা”। রস ভাবিত হলেই ভোগ (অনুভব) করা সম্ভব। ভট্টনাথকের মতে, “রসের সম্পর্কে যাহা বিভাবাদির সাধারণত্ব সম্পাদন করে তাহাই ভাবকত্ব।”^{১৮} এই ভাবকত্বের ধারণাকে অভিনবগদ্যপুত্র বাতিল করতে পারেননি। প্রচলিত পাঠ্যপুস্তক “সাহিত্য দর্পণে” বিশ্বনাথ কবিরাজ এই ‘ভাবকত্বের’ অপর পারিভাষিক নাম দিয়েছেন “সাধারণীকৃতিঃ”। উচ্ছলন প্রবণতা ও রসধ্বনির মাধ্যমে রসের অনুভবকে আদর্শায়িত করা ও ব্যাপ্তি দেওয়া হয়। ফলে রস সামাজিক হৃদয়সংবেদ্য হতে পারে, বহুজনীন হতে পারে। রসবোধের আলোচনায় শব্দের ব্যঞ্জনার শক্তির মাধ্যমে লৌকিক সীমা, নিছক ব্যক্তি-অভিজ্ঞতার সীমাকে অতিক্রম করার বাসনা এই তত্ত্বে বার বার স্বীকৃত হয়েছে।^{১৯}

কথক বাগাড়ম্বরের মাধ্যমে, শব্দ শক্তির মহাশ্রোতর জন্য, ধ্বনি বা রস সৃষ্টি করেন। মানিকাকার আত্মগত শোকানুভবে হৃদয় সিক্ত ছিল, মানসপ্রক্রিয়ায় তিনি রসধ্বনিজাত বিষয়ে তন্ময়ত্ব পান, রসচৰ্ণা শব্দরূপ হয়। এই অনুভবনলৌকিক নয়, “মানসপ্রক্রিয়া”; এই রস কাহিনী বা কথকে আবদ্ধ নেই, রস ব্যাপ্ত, ‘সহৃদয় হৃদয়সংবেদ্য।’ মানিকাকার মতো আসরে অনেকেই এর অংশগ্রাহী। আসর রসবোধের ক্ষেত্র হিসাবে রূপান্তরিত হয়েছে রামের অযোধ্যায়, কৃষ্ণের বৃন্দাবনে বা ভরতের তপোবনে।

কথকতার আসরে রসভোগের বা সীমা অতিক্রমের আরো নানারকম উদাহরণ হাজির করা যেতে পারে। গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সদ্য বিবাহিত বড় ছেলের অকালমৃত্যুতে সমস্ত পরিবার শোকে মোহমান। মৃদুশব্দে আসানের পথ বাতলালে দীনেশচন্দ্র সেন।^{২০}

“আমি একদিন বলিলাম, ‘আপনারা যদি সান্ত্বনা চান, তবে আমি একজন ভাল কথককে নিযুক্ত করতে পারি, তাহার কথায় আপনারা শান্তি পাইবেন।’ সমুদ্রে পতিত ব্যক্তি ঘেরূপ তৃণটিকেও আশ্রয় করিতে হাত বাড়ায়, গগনবাবু এই প্রস্তাবটির সফলতা সম্বন্ধে আশ্বাহীন হইয়াও ইহাতে রাজী হইলেন বাড়ীর মেয়েরা সাগ্রহে এই প্রস্তাবে সায় দিলেন।”

কোন পরিস্থিতিতে কথকদের ডাকা হয়, তার আভাস পাওয়া গেল। মেয়েরা এই বিষয়ে যথারীতি উৎসাহী, দীনেশবাবু তাও জানাতে ভোলেননি। কথক ক্ষেত্রনাথ চট্টার্মণিকে দেখতে আদৌ নয়নাভিরাম নয়।

“কিন্তু কথা বলিবার ইহার আশ্চর্য শক্তি! প্রথম দিনই আসর জমিয়া গেল। গগনবাবুর বাড়িতে ছেলে বড় সকলেই মৌতাত ধরিলেন, সন্ধ্যায় বড় হল-ঘরটায় ক্ষেত্রচট্টার্মণির কালোকেঠে ওজ্জ্বল্য প্রদান করিয়া ফুলের মালা দুলিতে থাকিত, এবং তিনি ধ্রুব, প্রহ্লাদ, জড়ভরত, দক্ষযজ্ঞ, রুদ্রাঙ্গনী হরণ,

বকাসদর বধ প্রভৃতি কত পালা যে বলিয়া যাইতেন, তাহার অবধি ছিল না। তিনি কথায় কথায় ছবি আঁকিয়া যাইতেন; বর্ণনার ছটায় মেঘ, বৃষ্টি, বসন্ত সমীরণ এবং পদ্মবন যেন চোখের সম্মুখে উপস্থিত করিতেন, কখনও শ্রোতৃবর্গ অশ্রুসিক্ত হইয়াছে, কখনও হাসির স্রোতে ভাসিয়া গিয়াছে। এরূপ অপরূপ বক্তাকে পাইয়া ধর্মের কথায় পৌরাণিক প্রসঙ্গে মন হইতে শোক ধীরে ধীরে মূছিয়া যাইতে লাগিল।

“...প্রায় একমাসের মধ্যে গগনবাবুর মন এরূপ লঘু হইয়া গেল যে যখন ক্ষেত্র কথক কথা বলিতেন, তখন গগনবাবু লুকাইয়া তাঁহার চেহারা ও ভঙ্গীগুণ্ডলি আঁকিতেন।”

ক্ষেত্রচূড়ামণির কথকতা হৃদয়সংবেদ্য হইয়াছিল। বলার কারুক্রটিতে, পৌরাণিক গল্পের ব্যঙ্গনায় গগনবাবুর শোকসন্তপ্ত পরিবার সবাই রসের আশ্বাদনে সমর্থ হইয়াছিলেন, যাঁদের ব্যক্তিগত শোকভার ‘লঘু’ হয়ে গিয়াছিল এমনকি ক্ষেত্র কথক নিজে গগনবাবুর শিল্পের বিষয় হয়ে গেলেন। এই ক্ষেত্রে রসচর্চার দ্বারা ব্যক্তি-শোকানুভবের সীমা অতিক্রম করা সম্ভব হইয়াছিল। এই অতিক্রম্যতা কেবল গগনবাবুর মধ্যেই সীমিত ছিল না, তা জনগ্রাহ্য হইয়াছিল, “ছেলেবুড়া সকলের মৌতাত ধরেছিল।” ক্ষেত্র কথক বলেছেন আর রস আশ্বাদনের ভাগীদার হয়েছেন বাড়ির আমজনতা।

এই আমজনতার সঙ্গে কথকের ঘটকালি কীরকম পরিস্থিতি তৈরি করতে পারে; তার ছবি অনুরূপা দেবীর লেখাতেও ধরা পড়ে। নায়িকা বাণী রসজ্ঞ, তার দৃষ্টিতে কথকের অনুষ্ঠান দেখানো হচ্ছে। শ্রোতার প্রতিক্রিয়া, কথকের নৈপুণ্য সব কিছুর বর্ণনায় ধরা পড়েছে।

“...সেদিন কথকতার বিষয় ছিল ‘অভিমন্যুবধ’। ক্ষমতাশালী বক্তা... ভাষা প্রাণপশরী, স্বর অননসাধারণ। বীর বালকের অতুল সাহস, অমিত পরাক্রম, শ্রোতৃদলকে উত্তেজিত করিয়া যেন রণক্ষেত্রে টানিতোঁছিল। তারপর সে কি উৎকণ্ঠা, কি বিপুল উন্মেষ। শ্বাস বৃষ্টি কণ্ঠের মধ্যে চাপিয়া আসে। সপ্তরথী আসিয়া একা অসহায় বালককে একসঙ্গে ঘিরিল। পিশাচ, পিশাচ! দন্তে দন্ত নিষ্পেষিত ও হস্ত দৃঢ় মূর্ছিবদ্ধ হইয়া গেল। প্রতিকার নাই! ইহার কি প্রতিকার নাই! ধিক! যদি না অন্যায়কারী শত্রুপক্ষকে দলিত করিয়া সপ্তরথীর লৌহ-নিগড়-মধ্য হইতে সোনার হরিণটিকে উদ্ধার করিয়া আনিতে পারা যায়, তবে শতধিক এই জীবনে। কিন্তু হায়! কোন উপায় রইল না, অন্যায় সমরে ভারতের ভবিষ্যতের অকালে অন্তিমিত হইল। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মাতুল, পিতা সবাসাচী, পিতৃব্য মহাবল ভীম যাহার সহায়, সে আজ অসহায় অনাথভাবে সপ্তরথীর সপ্তশরে শোণিতরঞ্জিত বিক্ষতাবে বসুধা আলিঙ্গন করিল।...

“দশকগণ নীরবে অশ্রুমোচন করিতেছিল। কোন কোন পুরুশোকাতুরা

জননী হৃদয়ের আবেগ সংবরণ করিতে না পারিয়া ডুকরিয়া কাঁদিয়া উঠিতে-
ছিলেন। বাণী নীরবে চক্ষু মূর্ছিয়া কথকের মুখে চাহিল। সে মুখে কোন
পরিবর্তন লক্ষ্য হইল না। চিত্রকরের তুলি যেমন চিত্রের ভাবপ্রদান করে,
বর্ণ সমাবেশে ইন্দ্রিয় নন্দনকানন রচনা করে, নিজে সে ভাবসম্পদের ধারও
ধারে না, যে এতগুলি লোকের বক্ষতলে শোকস্মৃতি জাগ্রত করিতেছিল, সে
নিজে যেন তাহার মধ্যে ধরা ছোয়াও দেয় নাই।” ১০ক

এই উদ্ধৃতিতে ফুটে উঠেছে বৈপরীত্য, পালার ধাপেধাপে, কী করে শ্রোতা তন্ময়তা পায়
ও কীভাবে কথক নিরাসক্ত থাকে, ফলে কীভাবে আসর স্নাসৌভীর্ণ হয়।

উনিশ শতকের শেষের দিকে কথকতার বড় পৃষ্ঠপোষক ছিল কলকাতায় গড়ে ওঠা
হরিসভা। আসর বসত সেখানে। বেহালার প্রাচীন হরিভক্তি প্রদায়িনী সভার পুরাতন
কার্যবিবরণীর পাতা থেকে টুকরো খবর তোলা যাক। ১১

“সভার উদযোগে বিগত মাঘমাস হইতে বৈশাখের শেষ পর্যন্ত শ্রীযুক্ত
গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য কথক মহাশয় শ্রীমদ্ভাগবতীয় কথা কহিয়াছিলেন।
ইহাতে প্রত্যহ শ্রোতৃসংখ্যায় সভাগৃহ পরিপূর্ণ হইত। দূরপাল্লী হইতে অসংখ্য
স্ট্রীলোক এই কথা শ্রবণ করিতে প্রত্যহ উপস্থিত হইতেন।”

পরের বছরের প্রতিবেদনও একই রকমের :

“গত মাঘ মাসের ও ফাল্গুনের কিয়দ্দিন পর্যন্ত খিদিরপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত
ক্ষীরোদচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কথক মহাশয় মাসাধিককাল শ্রীমদ্ভাগবতীয় কথা
কহিয়াছিলেন। ইহাতে প্রত্যহ শ্রোতৃসংখ্যায় সভাগৃহ পূর্ণ হইত। বলা
বাহুল্য শ্রোতৃগণের মধ্যে স্ট্রীলোকের সংখ্যাই অধিক হইত।”

(নজরটান আমার)

গত বছরে (১৯৯২) চালতাবাগান গোড়ীয় বৈষ্ণব সন্মিলনীর আসরেও একই দৃশ্য দেখা
যায়। ১২ রাধারাণীর কাছে কথক শ্বিজরাজবাবুর মানসিক করা আছে। পৌষ বা
মাঘ মাসে একমাস ধরে রামায়ণী কথকতা করেন তিনি।

শ্রোতাদের শতকরা ৯৫ ভাগ পাড়ার বৃদ্ধা বা বয়স্কা মহিলা, তিন-চার ভাগ বৃদ্ধ।
তাঁরা নিয়মিত আসতেন, দু-চার পয়সা প্যালাও দিতেন। আসরে জোকার দেওয়া,
কান্না, ভাবে অভিভূত হওয়া, সবই তাঁদের মধ্যে দেখা যেত। ষাটবছর আগেকার
বেহালার হরিসভা বা এখনকার চালতাবাগানের হরিসভার আসরে শ্রোতার চরিত্রে বা
পরিবেশে পার্থক্য খুব আছে বলে মনে হয় না।

আসরে বেমানান একমাত্র আমি। ফলে অনেকের প্রশ্নের জবাব দিতে হত, আলাপও
জমে গিয়েছিল। বছরের পর বছর শ্বিজবাবুর কথকতা শুনছেন, শুনতে শুনতে গান
মুখস্থ হয়ে গেছে, এমন একজন বললেন, ‘নাটনি কোন স্কুলে পড়ে খোঁজ রাখি না।
ওর পড়াও বুঝতে পারি না। রামকথা বুঝি, তাই আসি। আরেকজন আগে আসতে
পারতেন না। সংসারে কাজ ছিল। এখন সবাই বড় হয়েছে, কাজ কম, ফাঁক পেলে

চলে আসেন। এখনো কাজ থাকলে আটকে থাকতে হয়। তখন মন খারাপ করে। মন ভার হলে কথকতা শোনে, মন হাল্কা হয়ে যায়।

আবার একজন বাল্যবিধবা। কণ্ঠেস্ফুটে ছেলে মানুষ করেছেন, বিয়ে দিয়েছেন। তা অনেক হয়েছে। রান্নাঘরে আর ঢুকবেন না। শেষ কয়েকটা দিন, ধর্মকর্ম নিয়ে থাকবেন।

আবার কেউ বললেন যে, বাড়ির ছেলের কথা বলার সময় হয় না, সবাই সবসময় ব্যস্ত। এখানে আসেন। অনেক লোকের সঙ্গে কথাবার্তা হয়। সময় কাটে। আবার কথকতায় মনও শান্ত হয়, ভালো ভালো কথা শোনে।

সবাই বৃদ্ধা, সবাই মহিলা, বৃহৎ পরিবারের সকলের দায়িত্ব ছিল। আজ সেই ভার নেই, নাতনি ও ছেলেদের সঙ্গে আড়ো-আড়ো ভাব, আগের বাঁধন শিথিল হয়েছে। সময়ও আসন্ন, শেষ পারাণির কাড়ি চাই, জীবনের দায়বোধের কৈফিয়ৎ হয়ত দিতে হবে। কথকতায় বর্ণিত মূল্যবোধের জগতে তার উত্তর পাওয়া যেতে পারে। আবার কথকতার রস আশ্বাদন অনেকে মিলে করেন, আলাপ আলোচনায়, আদানপ্রদানে সেখানে সমাজ গড়ে ওঠে, এককত্ব কেটে যায়। রস আশ্বাদনের প্রক্রিয়ায় যোগ দিতে এসে এখানে শ্রোতা হয়ে ওঠেন সামাজিক, সমূহে বা গোষ্ঠীতে তিনি স্থিত হন।

আবার কোনো না কোনো ভাবে এঁরা নিজেদের বর্ণিত ভাবেন। এঁদের এই বণ্ডনা রসের 'সাধারণীকৃতির' জন্য, শব্দের বাঞ্ছন শক্তির প্রভাবে, কোনোদিন মিলে যায় শবরীর সার্বিক দৃষ্টিতে, তার প্রাপ্ত সামাজিক তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যে। আবার পরম ভক্তিতে শবরীর যখন চরম প্রাপ্ত হয়, এঁরা মাটিতে কেঁদে লুটুটিয়ে পড়েন, বার বার হরিধ্বনি করেন। শ্বিজরাজ বাবুর বলা আখ্যানের শবরী তখন আদর্শায়িত হয়ে সর্বজনগ্রাহ্য হয়েছে।

লক্ষণীয় যে ভট্টনায়ক বা অভিনবগুপ্তদের রচনায় সহৃদয় ও সামাজিক সমর্থক, একটির পরিবর্তে অপরটি ব্যবহৃত হয়। সহৃদয়-এর সঙ্গে সামাজিকের এই যোগ তাৎপর্যপূর্ণ, একজন জরন্মীমাংসক যোগী সহৃদয় হতে পারেন না, বাসনার সংস্কার তাঁর নেই, শৃংগার রসের আশ্বাদন তার পক্ষে কী করে সম্ভব? রসাস্বাদন অলৌকিক কিন্তু যে বাসনাখ্য সংস্কার চিত্তবৃত্তিতে বিভাবাদিরূপে থাকে, যা রসবোধে অভিব্যক্ত হয় তা সামাজিক অভিজ্ঞতাপ্রসূত। অভিজ্ঞতা একক নয়, তা সমাজস্থ। সহৃদয়কে বার বার 'সামাজিক' নামাখ্যায় ভূষিত করে, তার নিজস্ব অভিজ্ঞতাকে যেন বাস্তবের মধ্যে বেঁধে রেখে দেওয়া হয়।^{১৩}

এই বাস্তবতা ক্ষমতা বিন্যাসের দ্বারা আবদ্ধ। মানিকাকা সামাজিক বা সহৃদয় কিন্তু বাস্তবে তিনি পরান্নভোজী, বড়লোক আত্মীয়ের গলগ্রহ। হরিভক্তি প্রদায়িনী সভা বা চালতাবাগানের হরিসভার অধিকাংশ শ্রোতাই পুরুষ শাসিত সমাজে মেয়ে; নানা দৈনন্দিন বণ্ডনার অবশ্যম্ভাবী শিকার। চালতাবাগানের বৃদ্ধারা আবার নানা অর্থ সংসারের প্রান্তবাসী। সম্পন্ন গগন ঠাকুররাও শোকে বিপর্যস্ত। নানাভাবে লৌকিক অভিজ্ঞতা এঁদের আহত করেছে, নানাভাবে এঁরা পষুদন্ত।

নিষ্পেষণের, হতাশার তাড়নায় এরা কথক ঠাকুরের কাছে যায়, দাবি জানায়,

“আমরা চাই একটু প্রাণ জুড়ানো হরিকথা যাতে চোখে জল আসে, **প্রাণে ভরসা জাগে**। এইসব তত্ত্বকথায় যে শব্দ প্রাণ শব্দকিয়ে যায়, কোন ভরসা পাই না। মনে হয় আমরা ভগবানের কাছ থেকে অনেক দূরে পড়ে আছি।”^{১৩৮}

(নজরটান আমার)

রসের উচ্ছলন ক্ষমতা ও সাধারণীকৃতি এই লৌকিক ক্ষেত্রে মানসক্রিয়ায় অতিক্রম করায়, শ্রোতার রসভুক্তির মাধ্যমে একক বোধকে সাধারণ বোধে রূপান্তরিত করেন। সাধারণীকৃতির ধারণার মধ্যে আছে একদিকে আদর্শীয়ত করার বোঝা অন্যদিকে আছে ব্যাপ্ত করার বৃত্তি। উচ্ছলনের মধ্য দিয়ে, ব্যাপ্ত হবার মধ্য দিয়ে সীমা অতিক্রম করা যায়। ক্ষমতা বিন্যাসের নানা সীমা একক শ্রোতাকে লোকজীবনে নানা নিষেধের মধ্যে আবদ্ধ করে, তার সত্তা বা বোধকে খণ্ডিত করে। রসধর্মানির মাধ্যমে, শব্দশক্তির মাধ্যমে রাম বা শবরীর কাহিনীতে শ্রোতা একাত্ম হয়, লৌকিক বোধের উত্তরণে, অলৌকিক জগতে তার সাধুজ্য ঘটে। অলৌকিক জগতে এই সাধুজাতার মাধ্যমে, আশ্বাদনের মাধ্যমে, তার ‘চিং সন্স্বত’ হয়। সাংখ্য মতাবলম্বী ভট্টনায়ক বর্ণিত ‘সন্স্বতের অর্থ ‘চৈতন্য’। নিম্নকোটের প্রতিনিধি মানিকাকার চৈতন্য দৈনন্দিন জীবনে নিয়মিত খণ্ডিত হয়, ক্ষমতার চাপে তাঁকে অস্বীকার করা হয়, ঠাট্টা করা হয়। রসধর্মানির ভোগে সেই চৈতন্য ফিরে পাওয়া যায়, তা স্ফুটিত হয়। চৈতন্যের প্রাপ্তি, অভিব্যক্তি, রসভোগের সাধারণীকরণের মাধ্যমেই সম্ভব। সংসারের অন্য সব ক্ষেত্র মানিকাকার কাছে, বুদ্ধিদের কাছে সংকুচিত, প্রবেশাধিকার সেখানে সীমিত, কিন্তু রসভোগের এই ক্ষেত্র খোলা রয়েছে। আসরে তারা স্বরাট, কারণ তারা সামাজিক, রসের অনুভব সেখানে ‘সহদয় হৃদয় দর্পণমধ্যাস্তে।’ শব্দময় ধর্মানময় কথকতার আসরে তাই দেখা যায় তাদের ভিড়।

আশির কোঠায় নৃতত্ত্ববিদ ভিক্টর টার্নারের (Victor Turner) ‘সীমা অতিক্রমের’ (Liminality) তত্ত্ব অনেক সমাজবিজ্ঞানীকে নাড়া দিয়েছিল। দৈনন্দিন ক্রিয়াকলাপের মধ্যে এমন আচার অনুষ্ঠান আছে, নানা শিষ্টপকর্মের মধ্য দিয়ে এমন ক্ষেত্র খুঁজে পাওয়া সম্ভব যেখানে গ্রাহ্য কাঠামো মূহূর্তের মধ্যে নাকচ হয়ে যায়, সমূহের অবস্থিতি বড় হয়ে ওঠে, মূর্তির অনন্ত সম্ভাবনা দেখা যায়। মূহূর্তগর্ভালি হয়ত ক্ষণস্থায়ী কিন্তু সেইগর্ভালির পুনরাবৃত্তি হয়, নানা আচারে, আন্দোলনে, উৎসবে, তীর্থযাত্রায় কাঠামো থেকে বাইরে যাবার পথ খুঁজে পাওয়া যায়, এমনকি কাঠামো নাকচ হতেও পারে। মানসিক ও ব্যবহারিক, উভয়ক্ষেত্রে, এই প্রক্রিয়া কার্যকর হয়।^{১৪}

ভারতীয় রসতত্ত্বের ব্যাখ্যায় এই প্রক্রিয়ার অন্যতর মাত্রা দেখা যায়। রসের আলোচনায় আছে ‘চমৎকারিত্ব’, ও এই চমৎকারিত্ব নিহিত আছে বিস্মৃতির ধারণায়। ভরত নাট্যশাস্ত্রে স্পষ্ট বলা হচ্ছে,

“যোহর্থো হৃদয় সংবাদী তস্য ভাবো রসোন্মবঃ।

শরীরং ব্যাপ্যতে তেন শব্দংকণ্ঠমবারিণা ॥”

আগেই দেখেছি, অভিনবগল্প এই রসব্যাপ্তির তত্ত্বে কীভাবে সায় দিয়েছেন। বিশ্বনাথ কবিরাজ লিখেছেন, “চমৎকারশ্চির্ভাবস্তাররূপো বিস্ময়াপন্ন পর্যায়ঃ।” (চমৎকার শব্দের অপর নাম হচ্ছে চিত্ত বিস্তাররূপ বিস্ময়।)^{১৫}

রসপ্রস্থানের ব্যতিক্রমী চরিত্র কুন্তকও রসের এই সামান্য গুণকে স্বীকার করেছেন। তাঁর ভাষায় “চমৎকারো বিতন্যতে, চমৎকৃতির্ভাবস্তার্যতে।” ফলে মূহুর্তে মূহুর্তে রসাস্বাদন হয়, সেই আস্বাদন ক্ষণকালের নয়।^{১৬} কবি-হৃদয় থেকে রস ক্ষরিত হয়, উচ্ছলিত হয়। আবার রসাস্বাদনে সহৃদয় চিন্তের বিস্তার হয়। এই তত্ত্বে কাঠামোর মধ্যে থেকেও মানসপ্রক্রিয়ায় কাঠামোকে অতিক্রম করার কথা থাকে; সামাজিক সংস্কারে আবদ্ধ হয়ে। লৌকিকভাবে তটস্থ থেকেও রসাস্বাদনে অলৌকিকভাবে রূপান্তরিত হওয়া যায়। ভ্যান জেনেপ (VAN GENNEP) বা টার্নার বার বার কাঠামোর বাইরে যাওয়ার ক্ষেত্রে নানা পর্ব বা ভাগের কথা বলেছেন, সীমা অতিক্রমের মূহুর্ত-গুলিকে সেই পর্বান্তরের মধ্যে প্রার্থিত করার চেষ্টা করেছেন।

রসানুভূতির ভারতীয় ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে এইরকম পর্বভাগের বা মূহুর্তের অনুসন্ধানের প্রয়োজন উপলব্ধ হয় না। রসব্যাপ্তির বা উচ্ছলনের মধ্যে সহৃদয় ডুবে যান, চমৎকৃত হন, তটস্থের সীমা অতিক্রান্ত হয়, মূহুর্ত ও ক্ষণকে আলাদা করে চেনার সুযোগ থাকে না, কাঠামোর বাইরে তার বিরোধী রূপ দাঁড়িয়ে থাকে না, কাঠামোর মধ্যে হাজির ও গায়েব অনুযোগী-প্রতিযোগী রূপে আবদ্ধ, একটার সঙ্গে অন্যটা সমবায় সম্বন্ধে থাকে, মূহুর্তের মধ্য দিয়ে সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা যায় না। সহৃদয়ের রসাস্বাদনের সামগ্রিকতার রূপ তাই এই তত্ত্বে ধরা পড়ে।

□ পর্ব/৬ □

কথকতা, যাত্রাপালা ও ঢপ কীর্তন : সমানতন্ত্রের সাধনা

ক. কথকতা ও যাত্রাপালা

১৭৭২ নাগাদ সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মন্তব্য করেছিলেন, কথকতার সমাদর কমে এসেছে, বিনোদন ও লোকশিক্ষার আসরে যাত্রার রমরমা শূন্য হয়েছে।^{১৭}

ফলে পেশাতেও বদল ঘটেছে। কথক বা পাঠকদের কেউ কেউ যাত্রার পালা রচনায় ঝুঁকে পড়ছেন। পূর্ববাংলার অপ্রতিষন্দনী যাত্রাপালা লেখক কৃষ্ণকমল গোস্বামী (১৮১০-১৮৮৮) পেশায় কথক ছিলেন এবং অন্যপক্ষে আধুনিক এক গবেষক দাবি করেছেন যে উনিশ শতকের দ্বিতীয় ভাগে মতিলাল রায় (১৮৪৩-১৯০৮) যাত্রাপালা

রচনায় যে নতুন ধারা সঞ্চার করলেন তার পিছনে ছিল কথকতার জোর।^২ অষ্টাদশ শতক থেকে কৃষ্ণের মানভঞ্জন ইত্যাদি পালা চালু ছিল। ‘মাকপদ্ম’ নৃত্যপালা সমরসিক পৌত্তলিকতা ও সুন্দরীর খাতিরে ওয়ার্ড ও রামমোহন উভয়েই এই জাতীয় যাত্রার প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করেছিলেন।^৩ কিন্তু বর্তমান প্রসঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে, এই প্রথম দিককার যাত্রাপালার কাঠামো। যাত্রাতে সংলাপের বাহার ছিল না। পাত্র-পাত্রী কথা বলত গানে; পরিস্থিতি ও ভাবও ব্যাখ্যা করা হত গানে। কৃষ্ণকমলের যাত্রা পালার বিন্যাসে এর ছাপ সুস্পষ্ট। প্রথমদিকে কৃষ্ণকমল পালা (স্বপ্নবিলাস, ১৮৪২) বাঁধতেন এইভাবে :

“যশোদা : যত কাঁদে বাছা বলে ‘সর সর’

আমি অভাগিনী বলি ‘সর সর’

(বল্লম) নাহি অবসর, কেবা দিবে সর

অর্নি সর সর বলে ঠেলিলাম ফেলে।”

বা দুটো গানের মাঝে এক ছত্র,

“সেত যা হবার তা হয়েছে, এখন, অথবা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে,

বিশাখা (সুরে), ওগো শ্রীরাধিকে, তুই যে আমাদের প্রাণাধিকে, ধনি।

ব’ধুর সর্বার্থ সাধিকে; তাই বলি রাই বিনয় করে চরণ ধরে, কিছুদিন দেখ

ধৈর্য ধরে,—সেই ব’ধুর তরে।”

বা, “রাধিকা সখি, কি সম্পদ?

ললিতা—শ্যামপদ। (সুরে) ওগো রাধে, ওগো চন্দ্রবদনে...”

শেষ জীবনে তিনি যে পালা লেখেন তার নাম হল ভরৎ মিলন। গান বেশ কিছু আছে কিন্তু বড় বড় গদ্য সংলাপ এবং দৃশ্য নির্দেশ আছে। যেমন, ২য় দৃশ্য, চিত্রকূটগারি—নিম্নদেশ :

“বশিষ্ঠ (স্বগতঃ) আহা! কি সুন্দর! কেমন রমণীয় শান্তিময় স্থান চিত্রকূট! বোধহয় যেন যোগীগণের ধ্যান সমাহিত চিত্তের লয় স্থান অচল সূনির্মল চিদাকাশধাম এই চিত্রকূটচালের উপমাস্থল, এবং যেন বোধ হইতেছে সেই বিমল সত্ত্বাশ্রিত চিত্তে ভাসমান প্রপঞ্চাতীত, শুদ্ধ বোধগম্য কূটস্থ চৈতন্যচ্ছবি প্রপঞ্চলোচনের গোচর করস্থ হে বিশ্বাত্মন রাম, তুমি এই চিত্রকূটস্থ রামরূপ সন্দর্শন কর” ইত্যাদি।^৪

‘ভরৎ মিলনে’ এইরকম গদ্যাংশের ছড়াছড়ি। দৃশ্যের প্রারম্ভে ঋষি বা মূর্খি এইরকম বাক্যাবলী বলেন। এই বাক্যাবলীর উদ্দেশ্য ঘটনাপ্রবাহ বজায় রাখা নয়, কথার পিঠে শুদ্ধ কথা জুড়িয়ে যাওয়াও নয় বরং তত্ত্ব ব্যাখ্যা করা। নাটকীয় সংলাপের কাজ সাধিত হচ্ছে গানে কিন্তু তত্ত্বের ব্যাখ্যা গভীরভাবে শ্রোতাদের দিগে যাচ্ছেন বশিষ্ঠ বা সুমন্ত্র। বিচিত্র বিলাস (১৮৫৬) পালার ভূমিকায় কৃষ্ণকমলের কয়েকটি উক্তি প্রাধান্যযোগ্য :

“যদিও প্রচলিত অভিনয় (যাত্রা) অনায়াস দৃশ্য কিন্তু তাহা সহৃদয় ব্যক্তির-
গণের নিদারুণ বিরক্তিকর। কারণ অনভিজ্ঞ অভিনেতৃগণ সামান্য লোকের
প্রীতিপদ রহস্য সাধনের উদ্দেশ্যে প্রবন্ধগত প্রকৃতভাব পরিত্যাগ পূর্বক
অসাময়িক অশ্লীল বাক্য প্রয়োগ, নানা প্রকার কদর্ব রঙ্গভঙ্গী ও নিতান্ত
অবিধেয় বেশ বিন্যাস করিয়া থাকে। প্রায় চতুর্দশ বৎসর গত হইল আমি
সাধারণের নির্দোষ প্রীতিশীল মানসে প্রকৃত প্রবন্ধের অনুগত হইয়া প্রথমতঃ
স্বপ্নবিলাস তৎপর দিব্যোন্মাদ নামে ব্রজলীলায়ক দুইখানি সঙ্গীতবহুল
নাটক রচনা করি।” ১৫ (নজরটান আমার)

‘প্রকৃত প্রবন্ধের’ ভাব অক্ষুণ্ণ রাখতে হবে, রসাতাস ঘটতে দেওয়া চলবে না, বৈষ্ণবপ্রবর
কথক কৃষ্ণকমল একথা ভোলেননি। গেষ সংলাপে তিনি সেই রস বজায় রেখেছেন,
তাঁর কাছে, সেই রচনা ‘সঙ্গীত প্রধান’। আবার অন্য পালায় বিশেষ চরিত্রের মূখে লম্বা
বক্তৃতার মাধ্যমে তত্ত্ব ব্যাখ্যা করাতেও তিনি বিরত হননি। তখন বোধহয় রুচি ও
লেখার কায়দাও কিছুটা বদলেছে।

কিন্তু তবুও চাহিদা ছিল গানেরই। গোবিন্দ অধিকারীর (১৭৯৮/৯৯-১৮৭০/৭১?)
যে পালা প্রথমে মৃদু হিচু তাতে একেবারে গদ্য সংলাপ নেই, সবটা গান।

গোবিন্দ অধিকারীর ভাগিনেয় প্রসন্নকুমার দাস বৈরাগী মহাশয়ের কাছ থেকে বাণেশ্বর
ঘোষ গোবিন্দের ‘স্বহস্ত লিখিত খাতা’ সংগ্রহ করেন এবং “শ্রীযুক্ত রাখাল দাস কবিরত্ন
ও কবির শ্রীযুক্ত তিনকড়ি বিশ্বাস বারা সংশোধনপূর্বক” জনসমাজে প্রচার করেন।
পদাবলীগুলো সাজানো হয়েছে নানা পালার মধ্যে, মানভঞ্জন, সুবলসংবাদ, মাথুর
ইত্যাদি। গানগুলোর উপরে আছে এই ধরনের শিরোনাম, ‘বৃন্দে উক্তিপদ’, ‘শ্রীকৃষ্ণ
উক্তিপদ’ ইত্যাদি। কিন্তু কোনো গদ্য সংলাপ নেই, নেই কোনো বক্তৃতা। পালায়
গানই সব, প্রয়োজনে গদ্য সংলাপ থাকতেও পারে কিন্তু গান বাঁধাই পালা লেখকের
বৈশিষ্ট্য। বাণেশ্বরবাবু ব্যবসা করছেন, খাতার স্বত্ব তাঁর। বটতলার রীতি অনুযায়ী
পণ্ডিতদের সাহায্যও তিনি নিয়েছেন। কিন্তু লক্ষণীয়, তিনি কোনো সংলাপ
টোকাননি বা খাতাতেও পাননি। উক্তি সমস্তই সুদূর, খাতায় সেই কথা ও সুদূর
লিপিবদ্ধ থাকে। ১৬

পাঁচালির অবস্থাও তথৈবচ। অভিনয়ের দিক থেকে পাঁচালি ও যাত্রায় অনেক প্রভেদ।
কিন্তু পাঁচালিতে আখ্যান ব্যাখ্যা করা হয় ছড়ায়। কথার স্থানে ছড়া কেটে আখ্যায়িকার
প্রবাহ রক্ষা করার মধ্যে পাঁচালিকারের কৃতিত্ব নিহিত থাকে। পাঁচালিও গানে বাঁধা
হত। দাশরথি রায় (১৮০৬-১৮৫৭) নানা বাঁঝালো ছড়া ও সরস বাকযুদ্ধের মাধ্যমে
পাঁচালিতে সমসাময়িক ঘটনার উপর টিপনী কাটতে লাগলেন, পাঁচালিকে এক
ধরনের সঙ্গীতময় নকশায় রূপান্তরিত করলেন। কিন্তু সেখানে অনুঘটকের কাজ করত
টুকরো টুকরো ছড়া; পারস্পর্য বদলাতে, সংযোজন করতে বা বিষয়ান্তরে যেতে
ছড়াকে মোক্ষম উপায় হিসাবে ব্যবহার করতে দাশরথি রায়ের জুড়ি মেলা ভার। ১৭

যাত্রাপালা রচনায় সুদূরের এই একচেটে আধিপত্য শেষ হয় উনিশ শতকের শেষভাগে। যখন গদ্য সংলাপের প্রাধান্য এল, কথকতার বিন্যাস তখন পালা লেখকদের কাছে সহজলভ্য ছিল। আখ্যান বলতে হবে, আখ্যান ব্যাখ্যা করতে হবে, কাহিনী-প্রবাহ অক্ষুণ্ণ রাখতে হবে। উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে নানা যাত্রার দল জাঁকিয়ে বসেছে, প্রতিযোগিতা বেশ তীব্র। দল ভাঙাভাঙির ‘নোংরামি’ শূন্য হয়েছে, শূন্য হয়েছে পালা চুরি করার প্রবণতা। বটতলার প্রেস নানা ধরনের পালা ছাপাচ্ছে, কবিবর অঘোরচন্দ্র কাব্যতীর্থ রচিত পালার বিজ্ঞাপন দেওয়া হচ্ছে, “সরমা বা বীরমাতা (তরগীর যুদ্ধ), ইহাতে সেই রাম-লক্ষ্মণ, তরগী, মেঘনাদ, মকরাঙ্ক, কুন্ত, নিকুন্ত, রসমানিক, সীতা, সরমা, সুপর্ণখা আর সেই কুন্তীলক, সুব্রজার পাষণাভেদী শোকোচ্ছ্বাস, সবই আছে।”^৮ পালাকার মতি রায়ের দলের খাই অনেক। তাই গোবিন্দপুর অঞ্চলে কৈবর্ত বৈকুণ্ঠ অধিকারী শীতলা ষষ্ঠীর দিন নতুন পালা নামাবে। মতি রায়ের দল থেকে একজন মদ্যপ ‘জুড়ি’ পালিয়ে এসে তার দলে ভিড়েছে। এ প্রসঙ্গে দীনেন্দ্র-কুমার রায়ের বর্ণনা শোনা যাক :

“জুড়ি প্রবর অপমান বোধ করিয়া মতিরায়ের দল পরিত্যাগ করে ; সঙ্গে সঙ্গে সে অন্নদাতা মতিরায়ের ‘ভীষ্মের শর শয্যা গীতাভিনয়’ নামক গ্রন্থখানির নকল চুরি করিয়া লইয়া যায়।... বৈকুণ্ঠ দেখিল, একটি ভাল দলের একজন খ্যাতনামা জুড়ি ও একখানি ভাল পুস্তক একত্র হইতেছে, ইহাতে ব্যবসায়ের বেশ সুবিধা হইতে পারিবে। সুতরাং সে মাসিক পনের টাকা বেতন ও খোরাক পোষাক অঙ্গীকার করিয়া লোকটিকে নিজের দলে ভর্তি করিয়া লইল।

“বৈকুণ্ঠ ‘ভীষ্মের শরশয্যা’র নাম পরিবর্তন পূর্ব্বক এই নবজর্জিত গ্রন্থখানির নাম রাখিল ‘ভীষ্মের ইচ্ছামৃত্যু—গীতাভিনয়।’ সে খুব ধূমধামে এই গ্রন্থের তালিম দিতে লাগিল এবং নিজের বাহাদুরী প্রকাশের জন্য দুই একটা দৃশ্যের সামান্য পরিবর্তন করিল ; গান, সুর, ভাষা, সমস্তই অবিকল রইল”^৯ (নজরটান আমার)।

ভালো পালার চাহিদা যে কী হতে পারে, বিশেষ করে মতি রায়ের পালার, তার অজস্র সাক্ষ্য আছে।^{১০} এবং পালার চাহিদার অন্যতম কারণ হল মতি রায়ের বক্তৃতার এক ধরনের মাদকতা। ধরনটা কিন্তু জেনে বদুখে ‘কথকতা’ থেকে নেওয়া। পালা অভিনয়-কালে মতি রায় অনেক সময় নিজে কথক চরিত্র হিসাবে নামতেন।^{১১} কিন্তু তাঁর অভিনবত্ব হল পালা বিন্যাসে কথকতার ঢঙ অনুসরণ করা। মতিলাল রায় বিরচিত ‘দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ’ গীতাভিনয়ের কতগুলি সংলাপের টুকরো অংশ লক্ষ করা যাক,

“প্রাতিকামী। মা দ্রুপদ রাজকুমারী ! সে ব্রজসম বাক্য কি আপনার কমলতুল্য কোমল প্রাণে সহ্য হবে ? বলতে যে আমার বক্ষস্থল বিদীর্ণ হয়ে যাচ্ছে।

...“ওমা ধর্মরাজ পত্নী ! আমি কোন দোষে দোষী নই মা, দুঃখের দাসত্ব

শৃঙ্খলে আবদ্ধ হয়ে এই কার্য করতে প্রবৃত্ত হয়েছি, তারা যা আমাকে বলেছে আপনার শ্রীচরণে নিবেদন করলাম, আপনি যেমন অনুমতি করবেন, তাই করব।”

আবার দ্রোপদীর বিলাপ,

“(দ্রুত পদে গমন ও গান্ধারীর পদধারণ করিয়া) ওমা গান্ধারী! মা আমাকে রক্ষা কর, ওমা আমাকে রক্ষা কর! মা তুমি ভিন্ন আর আমার কেউ নাই।

গীত

আমি ধরি পদে এ বিপদে রাখ মা গান্ধারী।

আমায় ধরিতে আসে দংশনান পাপরূপ ধারী।

আর কার কাছে দংশননিবারী

(আমার তোমা বিনা আর কেউ নাই মা)

আমি ভয়ে কেঁপে মলাম মা

রাখ জননী জগতে যশ দাসীরে উদ্ধারি ॥

আমি ধৈর্য যে ধরিতে নারি,

(দাসীর প্রতি কি তোর দয়া হবে)

(আজ আমি বড় দংশনিনী গো)

ওমা নিবাত আমার মনের আগুন দিয়ে কৃপাবারি ॥

গান্ধারী। ওমা অসিতরূপে, তুমি যেরূপে আমার কাছে এসেছ, এতে বোধ হচ্ছে প্রলয়কালীন মেঘ যেমন দুঃখলধারে বারিবর্ষণ করে ধরাকে জলমগ্ন করে, তুমি তোমার ঐ দেহরূপ মেঘের আবির্ভাব করে নয়নবারি বর্ষণস্বারা আজ কুরুকুলকে ডোবালে।” ১২

এই ছন্দ ও মেজাজ কথকতার পুথিতে লভ্য। বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে সংরক্ষিত সমবিষয়ের উপর লিখিত একটি পুথির ভাষার বিন্যাস লক্ষ করা যেতে পারে। কথক রামগোপাল শর্মা এইভাবে বিন্যাস করেছেন :

“প্রাতিকামী কি বলবো রে। আমি জে কুলবধু। কেমন করে সভায় জাবো। প্রাতি উ ॥ কি কবো। মন্যে ধুবো কৌরবানাং বিনাশ। মা জানলেম কৌরবকুলের বিনাশ এতদিনে হল।

আবার দ্রোপদীর বিলাপের বিন্যাস এই,

“দংশন শোকে রোসে ভয়ে কাতরা কম্পিতা। নিশ্বসন্তি। কি হবে কে রক্ষা করে। এলোচল কোমলাঙ্গি। ছুটে গিয়ে গান্ধারির চরণে ধরে বলেন মা আমায় রাখ গো। একবস্ত্রা গুরুজনসভায় কেমন করে জাব। ব্যাধিমন্দিরে জেমন মগ কাঁপে। ললাটে বক্ষস্থলে করাঘাত। হায় কি হবে প্রাণ জায়। শ্রীলোকের লজ্জাত জান গো। হেরেচেন। তা এইখানে থাকবো। তোমার

সেবা করিবো। আজ অবধি দাসি হলেম। উ। অমা কেন ২। দ্বঃশ্বাসন বাউ বেগে পশ্চাৎ আগমন করে। দাসি হয়েছে একবার সভায় আসবে। গান্ধারী উ রবে। দ্রৌপদী উ। ঠাকুরপো অদ্য রজঃস্বলাস্মি।... নীলকুণ্ডিত কেশে ধরে জখন সভা মধ্যে আকর্ষণ করেন যে জায়। একে ক্ষীণ বালা অবলা বালা। উ। অরে মন্দবুদ্ধি লয়ে যাসনেরে দন্তে তৃণ ধরে বলি। অদ্য রজঃস্বলাস্মি। দ্রৌপদী কেঁদে বলেন কোথা জাবরে। কোথা রৈল ঘোড়া দাসীগণ। কোথা চামর, কোথা সুখ ঐশ্বর্য, কি হবে রে।”^{১৩...}

কথকতার ভাষা বিন্যাসে টুকরো টুকরো সংস্কৃত শ্লোকাংশ ছাড়া সবই সংলাপধর্মী। সংলাপের মাধ্যমে দ্রৌপদীর হেনস্তা বর্ণনা করা হয়েছে, কথোপকথনের চঙে নাট্যগুণ অব্যাহত রাখা হয়েছে। মতি রায়ের পালায় গীতাংশের মাঝে মাঝে আবার সংলাপ আছে, সংলাপ আবার সুরে ফিরেছে। কথকতার ভাষা পড়লেও পরিষ্কার হয় যে কিছুর বাক্য টেনে সুরে পড়তে হবে। জল্পগায় জল্পগায় সংস্কৃত বাক্যাংশ ছেদ এনেছে। সংস্কৃত-বহুল শব্দ রসের গান্ধীর্ষ রাখার প্রয়োজনে মতিলাল রায়ও ব্যবহার করেছেন। প্রাতিকামীর কুণ্ঠা বা গান্ধারীর কাছে দ্রৌপদীর ছুটে যাওয়া, আতীর বিন্যাস একগোষ্ঠীয়।

চরিত্রানুযায়ী বিন্যাসে দুলকি বা হালকা অথবা খেলো মেজাজের সঙ্গে সংগতি রেখে শব্দ বিন্যাস মতি রায়ও করেছেন, কথক ঠাকুরও করেন। যেমন, উপযুক্ত যাত্রাপালায় আছে, “দ্বঃশ্বাসন, (স্বগত) তা পাঁচটি বর আছে, আরও যত দেবেন তা না বলবে না, ‘ক্ষিপী ভাত খাবি না পাত পাড়বো কথা।’” বা “দ্বঃশ্বাসন (বগল বাজাইতে বাজাইতে) যায়।”^{১৪}

আবার কথকতার পদ্ধতিতেও গন্ধর্বের হাতে কৌরবদের দুর্গতিতে ভীম একভাবে ‘বগল বাজায়’ ওঠেন, গ্রাম্য ভাষা প্রয়োগ করেন “একি বন্ধুগে [যুদ্ধার্থীঠরকে] পেয়েছ, ঘণ্টার গড়ুর হয়ে বসে থাকবে।”^{১৫}

উপযুক্ত উদাহরণ ও পারস্পর্য থেকে যে অনুমিত হতে আসা যায় তা হল যাত্রার পালা রচনার বিবর্তনে গান প্রথমে একাধিপত্য বজায় রেখেছিল। গান বাঁধার জোরে ছিল পালাকারের খ্যাতি। গদ্য সংলাপ গোঁণ, উক্তি-প্রত্যুক্তি সব গানে। শূক-শারী বা চুঁড়া বাঁশির ঝগড়া সব সুরে, ছড়ার। কৃষ্ণকমলের পালায় স্বিধামনস্কতা আছে, কিছুর পালায় প্রায় সবই গান আবার কিছুর পালায় দীর্ঘ সংলাপ, তাকে একটানা বক্তৃতা বলাই ভাল। কথকতার টুকরো টুকরো ভাঙ্গা কথা, মাঝে মাঝে তাক বুঝে ‘চুণী’ লাগানোর কায়দা সেখানে নেই। ঠিক যে সময়ে যাত্রা কথকতাকে জনপ্রিয়তায় মেয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে, সেই সময় মতিলাল রায় বা নীলকণ্ঠের উত্থান। এবং মতিলাল রায় পালাতে কথকতাকে আত্মসাৎ করেছেন, সংলাপ বিন্যাস করেছেন কথকতার চঙে। কথক যেরকম রামায়ণ ও মহাভারত থেকে ঘটনা নিয়ে পর্ব বিন্যাস করেন, আখ্যান

রচনা করেন, মতিলাল রায়ের পালা রচনার অন্যতম উদ্দেশ্য তাই। তিনি নিজে লিখেছেন :

“মহাভারতের ন্যায় গ্রন্থ পৃথিবীর আর কুদ্রাপি দৃষ্ট হয় না। ইহা রত্নের ভাণ্ডার বিশেষ। আমি সেই ভারত ভাণ্ডারে প্রবেশ করিয়া রত্ন চয়ন করিতে আরম্ভ করিয়াছি। ইচ্ছা আছে ক্রমে ক্রমে মহার্ষি রত্নগুণি সংগৃহীত হইলে একগাছি রত্নহার প্রস্তুত করিয়া বঙ্গমাতাকে উপহার প্রদান করিব।”^{১৬}

আমরা আগেই দেখেছি যে ঠিক একই ভাবে ভাগবতের বা রামায়ণের ভিন্ন পর্ব থেকে সংগ্রহ করে পর্বানুযায়ী কথকতার পুঁথি সাজানো হয়। বিন্যাসের ধারায়, গদ্য সংলাপের গ্রন্থনে ও ভূমিকায় যাত্রা এবং কথকতার অন্তর্লীন সম্পর্ক গড়ে উঠল। পালাকাররা অবশ্য কথকতার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন, কেউ কেউ স্বয়ং কথকও বটে। আবার যাত্রাপালার সংলাপ সংশোধনে এই জাতীয় পণ্ডিতদের সাহায্য অবলীলায় নেওয়া হত। মতিলাল রায় স্পষ্ট লিখেছেন :

“কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের সাহিত্য শাস্ত্রাধ্যাপক নবম্বীপ নিবাসী পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত শিবনারায়ণ বাচস্পতি ও জেলা ফরিদপুরের অন্তঃপাতী হাসামদীয়া গ্রামনিবাসী, সপ্রতি বাগবাজারবাসী জ্যোতিঃশাস্ত্র বিশারদ শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার সিদ্ধান্তরত্ন মদুখোপাধ্যায় মহাশয়স্বয়ং এই গ্রন্থখানি আদ্যোপান্ত পরিদর্শন করতঃ সংশোধন করিয়া দিয়া আমাকে চিরকৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন।”^{১৭}

কবিবর অঘোররত্ন কাব্যতীর্থ নিজে যাত্রাপালা লিখতেন। ফলে কথকতার ঢঙে সংলাপ লেখায় পালাকারদের পক্ষে বিশেষ অসুবিধা ছিল না।

তখনকার দর্শকদের কাছে এই জাতীয় নানা স্তরের সংলাপ, গদ্য ও পদ্যের চলাচল আকর্ষক হিচ্ছিল। একঘেয়ে পদনরত্ন সংলাপ যে যাত্রার দুর্বল দিক, এই কথা বলে সঞ্জীবচন্দ্র তাঁর বিখ্যাত প্রবন্ধ শেষ করেছেন। ঠিক সেই সময়েই মতিলাল রায়ের সমসাময়িক অনুজ পালাকাররা উনিশ শতকের শেষ পাদে কথকতার ভাঙাতে সংলাপ লেখাকে রীতি বলে মানলেন। রাজকৃষ্ণ রায় (১৮৪৯-১৯০৪), ব্রজমোহন রায় (১২-?-১২৮৩) প্রভৃতি পালাকাররা সংলাপের পাশে নির্দেশনা দিতে শুরু করলেন এই বলে ‘কথকতার সুরে’। চাহিদা বৃদ্ধি নীলকান্ত মদুখোপাধ্যায়ও কৃষ্ণাচার্য পালায় ব্যাখ্যা সম্বলিত লম্বা লম্বা সংলাপ জুড়ে দিলেন।^{১৮} বাজারের তাগিদে, রুচির পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে, শিল্প আঙ্গিক গড়ে তোলার দাবিতে ভিন্ন ভিন্ন রীতির অন্তর্লীন সম্পর্ক কী করে গড়ে ওঠে, তার নিদর্শন এই দুই রীতির লেনদেন। যাত্রার কাছে কথকতা পিছন হটেও যাত্রা পালার কাঠামোতে তার নিজের ছাপ রেখে গেল।

খ. কথকতার পালা ও ঢপকীর্তন

আরেক ধরনের হারিয়ে যাওয়া ইতিবৃত্তে বার বার আমরা কথকতার অনুবৃত্তি পাই। তা হল ঢপ কীর্তন। ঢপ কীর্তন যে কীভাবে গায়, তা একজন বর্ষায়ান সঙ্গীত

বিশারদ অনেক অনুসন্ধান করণে শুনতে পারেননি।^{১৯} কীর্তনের সামাজিক ইতিহাসে ঢপ কীর্তন রাত্রি, বিবৃতি মাত্র।^{২০} অথচ ঊনবিংশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে এর জনপ্রিয়তা ছিল অসাধারণ, বিশেষত মহিলা গায়কীরা এই রীতিতে আসর একেবারে মাত করে দিতেন। শাস্ত্রীয় কীর্তনের মধ্যে বিন্যস্ত করা, ব্যাখ্যা করার সুযোগ আছে। পালাকীর্তন নানা বিখ্যাত পদকর্তার পদাবলী নিয়ে সাজাতে হয়, কোনো একটি রসকে ঘিরে গ্রন্থন করতে হয়। এই গ্রন্থন করার মধ্যে গায়কের রসবোধ, শিল্প ধারণা ও বৈষ্ণব সাহিত্যে তাঁর পার্শ্বে প্রকাশিত হয়। এবং অনুক্রম বজায় রাখার জন্য নানা গানের মধ্যে যে সংযোগ করা হয় তাকে বলা হয় ঘটকালি বা ভিমান, এবং এই সংযোগটি হয় কথার। আখরের মত ঘটকালিও গায়কের স্বকীয়। কীর্তন আসরে গায়কী রীতির মতো ঘটকালি বৃত্তির নাম আছে। বাড়ুজ্যে মশায়ের ঘটকালি অর্থ অবধূত বন্দোপাধ্যায় রচিত ঘটকালি, মুনুজ্যে মহাশয়ের ঘটকালি অর্থ যামিনী মুখোপাধ্যায়ের ঘটকালি বা রাসিক পালের ঘটকালি।^{২১} ঊনিশ শতকে বা বিংশ শতকের দ্বিতীয় পাদেও গায়কী শৈলীর সঙ্গে সঙ্গে এই ঘটকালির রীতিও আসর জমাবার ক্ষেত্রে কম প্রয়োজনীয় ছিল না। কীর্তনের সমজদার শ্রোতা খগেন্দ্রনাথ মিত্র প্রত্যক্ষদর্শী হিসাবে লিখেছেন, পাবনার অধিবাসী রামকমল ভট্টাচার্যের আসরে নাকি “কখনো দশ হাজার লোক মন্ত্রমুগ্ধবৎ তাঁহার কীর্তন শুনিয়েছে। কীর্তনগানে এরূপ লোক সমাগম বোধহয় আর কখনো দেখা যায় নাই। তাহার বিশেষ একটি কারণ বোধহয় তিনি নাচিয়া গাহিয়া কথকতার পদ্য দিয়া কীর্তন প্রচার করিয়াছেন যাহাতে সর্ব সাধারণে কীর্তনগানের মর্ম সহজে বুঝিতে পারে।”^{২২} (নজরটান আমার)

‘কথকতার পদ্য’ বা ‘ভিমান’ দেওয়া সুন্দর শব্দ; পালা কীর্তনে কথার ভূমিকা বলার জন্য লিখে আর কিছু বলা যায় না, কানে শোনবার দরকার পড়ে।

এবং ঢপের ক্ষেত্রে সেরকম হবার আর কোনো উপায় নেই অথচ কথার স্থান প্রচলিত কীর্তন অপেক্ষা এই রীতিতে অনেক বেশি। বিক্ষিপ্ত লিখিত সাক্ষ্যের সীমিত সাধের মধ্যে থেকে দুয়েকটা ইঙ্গিত মাত্র দেওয়া যেতে পারে। বৈশিষ্ট্য বোঝাতে গেলে বিস্তৃত উদ্ধৃতি দেওয়া ছাড়া গতাস্তর নেই। ঢপ কীর্তনের জন্মদাতা মুর্শিদাবাদের রূপচাঁদ চট্টোপাধ্যায় (১১২৯ বঙ্গাব্দে জন্ম) নিজে ছিলেন কথক।^{২৩} ঢপের একটি বৈশিষ্ট্য হল যে কীর্তনে দল থাকে কিন্তু ঢপ সাধারণতঃ একজন গায়। পাঁচকাড়ি দে লিখেছেন, “ঢপকীর্তনে গায়ককে একাই সর্বচারিত্রের অভিনয় করিতে হয়।...সে জন্য গায়ক কে কি বলিতেছে উক্তির পূর্বে তাহা উল্লেখ করিবেন। যে স্থলে ছোট উক্তি বা প্রশ্নোত্তর, তাহা স্বরের ভিন্নতা এবং হস্তমুখের তদনুযায়ী ভঙ্গি দ্বারা বক্তৃতা করিলে শ্রোতাদের বুঝিবার কোনো অসুবিধা হবে না।”^{২৪}

কথকতায় একক অভিনয় ও গান এবং ঢপেও একক অভিনয় ও গান; সাধুজ্ঞাতার শেষ কিন্তু এখানে নয়। ঢপে বাক্যাংশ দ্বারা গ্রন্থনা খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করত। ঢপের কীর্তনে কৃষ্ণলীলাঘটিত প্রস্তাবটি গদ্যে ব্যাখ্যা করতে হয়। আবার প্রতি

বক্তৃতার শেষে একটি ক্ষুদ্র গদ্যবন্ধ ‘তাল-লয়-সুর সংযোগে’ গেয়ে শেষ করা রীতি। বক্তৃতার বাক্যবন্ধ ও সুরবন্ধ গদ্যবন্ধের মধ্যে মিল রাখতে হবে, তা না হলে রসাতাস ঘটবে। এই জাতীয় ‘গীতি কথিকা’ বাঁধতে মোহনদাস বৈরাগী, অঘোরদাস, শ্বারিকাদাস প্রমুখ নামজাদা ওস্তাদ ছিলেন। কিন্তু যার পালা অপেক্ষাকৃত সহজলভ্য, তিনি ছিলেন প্রায় নিরক্ষর, যশোহরের মধুকান বা মধুসূদন কিল্লর (বঙ্গাব্দ ১২২৫-১২৭৫)।

চপের বাক্যাংশের বিন্যাসে আবার টুকরো টুকরো সংস্কৃত শ্লোকও থাকত। জগন্মোহিনী নিজে জল অচল কান জাতীয় রমণী। কিন্তু তিনি চপের মধ্যে চৈতন্যের নমস্কার সূত্র পাঠ করার রীতি চালু করেন। মধ্যে মধ্যে সেই সুযোগে সংস্কৃত শ্লোক আবৃত্তি করে তিনি গ্রন্থনাকে কারুকার্য মণ্ডিত করে তুলতেন। সংস্কৃত শ্লোকের লাগসই উদ্ধৃতি প্রয়োগও গ্রন্থনার অন্যতম লক্ষণ। এখানে কথকতার গ্রন্থনার সঙ্গে যোগসাজস স্পষ্ট।

বামা, শ্যামা, গুরুদাসী, ঠাকুরদাসী প্রভৃতি অনেকে চপ গানে সুখ্যাতি অর্জন করেছিলেন। চপের জনপ্রিয়তায় তখন অনেকে বীতশ্রদ্ধ কারণ তা নাকি “এখনকার বেশ্যাদিগের অর্থগমের অবাস্তর উপায় হইয়া উঠিয়াছে।” ২৫ শাস্ত্র যখন ভেঙেচুরে সমাজের অন্তঃসারীদের হাতে রূপান্তরিত হয়, তখন শিক্ষাবোদ্ধারা আঁতকে ওঠেন। কীর্তন ও কথকতার মিশ্রণের ক্ষেত্রে প্রায়োগিক দিক থেকে এগিয়ে এসেছিলেন অভ্যাজ, নিরক্ষর কান, মহিলা গায়িকা ও গণিকারা। এই বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করে বইয়ের বিজ্ঞাপনেও লেখা হয়েছিল, “৩ মধুসূদন কিল্লরের গীত ও বক্তৃতা অনুযায়ী শ্রী তিনকড়ি বিশ্বাস প্রণীত, যাহা অনেকানেক বার ললনাপ্রণীত কীর্তন করিয়া সকলের মনোরঞ্জন করিয়াছে।” (নজরটান আমার)

‘প্রভাস তীর্থ’ সংগীত পালায় বা “উদ্ধব সংবাদে” প্রেক্ষাপট এক, মধুসূদন পরীক্ষণ শ্রদ্ধদেবের কাছ থেকে কথা শুনছেন। আরম্ভের ঢঙ ও বিন্যাস এইরকম :

“অনন্তর রাজাধিরাজ মহারাজ পাণ্ডুবংশাবতংস শৌর্য ধৈর্য গুণাগুণ রাশীকৃত দিগবিদগি অবস্থিত অনবরত ভূপতিমন্ডল বেষ্টিত সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় বীরাগ্রগণ্য যে রাজা তেঁহ ব্রাহ্মণকণ্ঠে মৃত সর্পার্পণ করে দারুণ অভিশাপ ভয়ে ভীতান্ধ হয়ে মাহেন্দ্রসম ঐশ্বর্য সকল বন্ধুবান্ধব কলহাদি পরিত্যাগ করে সুরধরুনি তরঙ্গিনী হরিপদরজ বিহারিণী ত্রিলোক তারিণী গঙ্গে তৎতীরে তুলসী কাননে উপবেশনপূর্বক অঙ্গে হরিনামাঙ্কিত হরিপদাঙ্কিত কটিতটে ডোরকপিন আচ্ছাদিত পরমভাগবত তিলকোজ্জ্বল ললাটে সংশোভিতমান প্রেমকরি পরিপূরিত লোচনে গদগদ বিধানে শ্রী শ্রদ্ধদেব স্থানে জিজ্ঞাসা করিলেন। বলে গুরুগো আমার গতি কি হবে।

চেয়ে দেখ গুরু, আমি পোড়ে আছি ভবকূপে এবার তরাও কোনরূপে অতি তুচ্ছ জলপিপাসু পরি-পীড়িতাত্তঃ করণে করণে মহানুভব শমীকমুনির করেছি

অপমান, না জানি সেই অপরাধে কোন ঘোর নরকে জেতে হবে, তাই বলি গুরো অন্য কথা বলো না, আর সময় নাই, এখন বিষ্ণু গাথা হরিকথা কও।” একই অনুচ্ছেদে উপমাবহুল বর্ণনা, সুরে কথা ও কথোপকথন টানা সন্নিবেশ করার চণ্ড একেবারে কথকতার রীতিতে গোছানো হয়েছে। নারদের রূপ বর্ণনায় ‘অনুস্কার’ যোগ করে সংস্কৃতগন্ধী করা হল। এক ধরনের পড়ার তাল গড়ে উঠল :

“কিবা প্রতিবিশ্বিত রবিমণ্ডল কুণ্ডাক্ত শোভা পদার্থ পশ্ম অধর এবং সংশোভিত মলয় শূরুবরণ তনু পিঙ্গল জটিলং উরে পিঙ্গ যদু মলকা কুটিলং সুললিত রাজিত চন্দন তিলকং তেজময় রবিমণ্ডল সদৃশ ভুরদ যদুগল রতিপতিকাম মৃদকতং প্রেমজেনোবলি মৃদিত নেত্রং করকমলে সদাবাজিত জয়ং রসনায় ব্রজপতি ভাগবতত্বয়ং জাসনদতভব সত্যাবতসা কলিতে কুচকুচ বোদিত সহসা হরিনামাঙ্কিত সর্বশরীরং সিঞ্চিতলোচনে পদুস্করনীরং প্রবন্তুতা নারদমুনি বীণামন্ত্র হস্তে ন্যস্ত করি শ্রীবৃন্দাবনধাম গমন করিতেছেন, সে বীণায় কি গান করেন,

“রাগিনী ভৈরব, তাল কাওয়ালি।

বৃথা দিন গেলরে বীণে মজ কৃষ্ণ গুণাগুনে,” বলার জন্য লেখা হয়েছে, বর্ণনা, তাল ও সুর সেভাবে সাজানো। আবার ‘চূর্ণী’ বা ‘সাতে’র চণ্ডে যজ্ঞস্থলের বিবরণ লেখা হয়, যেমন :

“কিবা সে পদুরীর আশ্চর্য শোভা,—কত শত স্থানে অঙ্গস্কান্ত মণি, পিতরাস মণিকারণে চাকচক্য শোভা করিতেছে, আর কিবা স্থানে ২ রত্নপতাকা নীলপতাকা শ্বেতপতাকা পতো পতো শব্দে গগনপথ প্রতীরমান হইতেছে আর কিবা স্থানে স্থানে নানাবিধ বাদ্যোদ দম করিতেছে, কিবা রণকেকা, জয় কেকা কাড়া টিং টিং টীকারা দগড় দামামা ধ্বনি করিতেছে কিবা ভেরী, তুরি ধুধুরি রামসিঙ্গা রণসিঙ্গা কাংস্য করতাল মধুর মৃদঙ্গ খম্বক খাম্বাক ইত্যাদি রূপ নানাবিধ বাদ্য উদ্গম হইতেছে, কিবা স্থানে স্থানে ধূপাবলী দীপমালা স্থানে ২ কদলীবৃক্ষ রোপণ তদতলে পূর্ণ কুন্ত তদোপরি আশ্র-শাখা তদোপরি নারিকেল ফল এবোমপ্রকারে পদুরী সুশোভিতমানা।”...২৬

বাদ্যযন্ত্র ও সাজসজ্জার বর্ণনায় শোভাবস্তুর ব্যবহার, শব্দানুপ্রাসের প্রয়োগ যে কোনো চলিত সাটের মত। পার্থক্য ক্রিয়াপদ ব্যবহার করে ছেদ আনা হয়েছে, বর্ণনাময় শব্দ ও সংস্কৃত বিশেষণ পর পর একভাবে বসানো হয়নি। চপের বর্ণনাতেও আধুনিক বাংলা গদ্যের ছাপ পড়েছে। রসসৃষ্টি, চরিত্র ও পরিস্থিতি রচনায় কথকতা ও চপের পালায় কোনো মৌলিক পার্থক্য আছে বলে মনে হয় না। ‘উদ্ধব সংবাদ’ পালা বিচার করা যেতে পারে।^{২৭} চপ পালায় শূরুতে কংস চিন্তায় মগ্ন। সর্বত্র কৃষ্ণরূপ দেখছেন অথচ সব বীরেরা কৃষ্ণহাতে নিহত। এমন সময় নারদের আগমন, ছলে কৃষ্ণকে মথুরায় আনতে হবে, কংস বধের কাল আসন্ন। চিন্তাকুল কংসকে নারদের পরামর্শ :

শ্লোক

“যশোদায়াভবং কন্যা দেবক্যা বসুদেবজঃ ॥

রোহিণ্যা বলরামশ্চ ভাদ্রেহ সিতাশ্চমীনিশি ॥”

কথা

শূন্য মহারাজ যশোদার কেবল একটি কন্যা হয় আর দেবকীর অষ্টম গর্ভে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম হয়, রোহিণীর গর্ভে বলরাম জন্মে।

তান

“যেই দিন ভূমিষ্ট হলেন নারায়ণ।

কি কহিব সেদিনের দুঃখের কখন ॥

ভাদ্রেতে অসিতাশ্চমী মহা অন্ধকার।

মেঘের গর্জন তাহে পড়ে চারিধার ॥

আপনি আপন অঙ্গ পায়, না দেখিতে।

বসুদেব লয়ে কৃষ্ণ গেল গোকুলেতে ॥”

সদর

মহারাজ তব ভরে

কৃষ্ণ রেখে এল নন্দের ঘরে।

কথা

তখন রাজা কংস কহেন, এত বড় কর্ম বসুদেব করেছে? আমার অরিকে রেখে এসেছে বৃন্দাবনে? এখনি তার শিরশ্ছেদন করব।

দেবর্ষি এই বাক্য শ্রবণ করে মনে ভাবিলেন ও কথা বলা ভাল হয় নাই।

[প্রকাশ্যে] মহারাজ আপনার জ্ঞান নাই। যদি এখন বসুদেব ও দেবকীকে বধ করেন তাহলে শত্রু বধ হয় না। বধের কথা শূনে কৃষ্ণ বলরাম অন্যদেশে পলায়ন করিবে।

কংস এখন উপায় কি?

নারদ।

তান-পন্ন্যার

এক ধনুর্ময় যজ্ঞ কর আরম্ভন।

রামকৃষ্ণ দুই জনে কর নিমন্ত্রণ ॥

রথে যবে আসিবেক ভাই দুই জনে।

স্বহস্তে ধরিয়ে দৌহে বধিও পরাণে ॥”

“গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধি ও পুনরুজ্জ্বল” আশঙ্কায় ভাষাকে “নাটকীয়ভাবে” সাজানো হয়েছে, একথা সংকলক আগেভাগে জানিয়েছেন। চারিত্র ভাগ, নাম নির্দেশ, শিরোনাম ইত্যাদি “আবশ্যকতানুসারে ভাষার সংগতি ও সৌন্দর্যরক্ষাকল্পে”, সম্পাদক সংযোজিত

করেছেন। কিন্তু পরিস্থিতি তৈরি ও চরিত্র এক থেকে গেছে। এবার সমতুল্য কথকতার পদ্ধতির উদাহরণ বিচার করা যাক।^{১৮}

“নারদ উবাচ। শুন মহারাজ তবে তোমায় বিশেষ করে বলি। উ। যশোদায়াঃ স্নাতাং কন্যাং দেবক্যাঃ কৃষ্ণমেবং ॥ রামঞ্চ রোহিণীপুত্রং বসুদেবেন বিজ্ঞতা। ন্যস্তো স্বমিত্রে নন্দে বৈয়াভ্যাং তে পদ্রুমাভ্যাং ॥ দেবকীপুত্র কৃষ্ণ রোহিণীপুত্র রাম বসুদেব এ [?] য যুক্ত হয়ে স্বকীয় মৈত্র জে রাম [sic] তার গৃহে রক্ষা করে এসেছেন। আর যশোদার কন্যাটিকে আনয়ন করে তোমাকে ভুলিয়েছেন। এই তোমাকে বিশেষ বললেম। এই কথা শ্রবণ করে ক্রোধে পরিপূর্ণ কংস বলে বসুদেব ভণ্ড তপস্বী এত বড় সাধ্য। নিপাতর্মসি মাদও বসুদেব জিঘাংসয়া। শ্যাণিত খজা নিয়ে বিনাশোদ্যত। বসুদেব দেবকীকে এই ক্ষণেই বিনাশ করিব। নারদ মনে করেন এক কণ্ঠে আবার আর হলো। অগ্নি হাস্য। কং উ। কেন হাসলেন জে। নারদ উ। মহারাজ তোমার বুদ্ধি-হাস হয়েচে। বুদ্ধিমান মস্ত্রিয় নাই। শেষে বিবেচনা কর দেখি। আজ জেমন তুমি বসুদেবকে বিনাস করলে। এই শুনেন কৃষ্ণ বলরাম পালাবে। পরে বলবান হয়ে সৈন্য সঞ্চয় করে এসে দাঁড়াবে। তখন পারা জাবে কি করে। বরং বসুদেবকে কারাগারে বদ্ধ কর। পরামর্শ [sic] বলি শুন। ধনুর্যুক্ত আরম্ভ কর। আর নিমন্ত্রণ করে রামকৃষ্ণকে বাড়ী আন। স্থান ভ্রষ্ট হলে সে তেজটা যাবে। এখানে অনেক অসুদূর আছে না হয় তুমি আছ আমি আছি ধরাধরি করে জা হয় এরকম করা জাবে। না হলে আর নিস্তার নাই।”^{১৯}

সাধর্ম্য খুব স্পষ্ট, চোখে লাগার মতো। ঢপের পালাতেও তড়ু আলোচনা প্রশ্নোত্তরের ঢঙে, পরীক্ষিৎ জিজ্ঞাসু আর শূদ্রকদেব নিরসনকর্তা।^{২০} মূল কাহিনী দুয়েকটি স্লোকে বলা আছে, উৎস একই শ্রীমদ্ভাগবত। কিন্তু নারদীয় ছলচাতুরি, বাকপটুতা সব পালাকারের অভিযোজন। কৃষ্ণকাহিনীর নানা কাব্য, পালা কীর্তন মিলে মিশে কতকগুলি ছকের জন্ম দিয়েছে, দেশজ চৈতন্যে সেইগুলো গেড়ে বসেছে। চরিত্রের সেইরূপ রসময় আচরণ প্রত্যাশিত। এই উৎসে রদবদল হয় কিন্তু রসগত ধারণার আবৃত্তি অক্ষুণ্ণ থাকে। সংযোজন, বাক্যাংশ রসচৈতন্যকে পরিপুষ্ট করে, শ্রোতার প্রত্যাশাকে তাকে স্বীকার করতে হয়, রসসৃষ্টির ক্ষেত্রে তাকে পরিপূর্ণ অস্বীকার করে যাওয়া যায় না। ফলে কথকতা, ঢপ, যাত্রাপালা একই কাহিনী কাঠামোয় আবদ্ধ, একটা থেকে অন্যটায় যাতায়াত সহজসাধ্য। এবং রস সৃষ্টির আবহ সৃষ্টিতেও এদের মিল লক্ষণীয়। ঢপ কীর্তনের গায়কী প্রভাব মজলিসে কীভাবে কাজ করত, তার এক বর্ণনা দীনেন্দ্রকুমার রায় দিয়েছেন। কার্তিক জন্মের আখ্যান নিয়ে পালা, এক বয়স্কা ঢপ গায়িকা পালা গাইছেন।^{২১}

“বৃদ্ধা গায়িকা কখন কথায়, কখন দ্রুত ছড়ায়, কখন তানলয়-বদ্ধ অনুপ্রাস ঝঞ্ঝারিত দীর্ঘ সুরে অলৌকিক গাথা গাহিতে লাগিল,—বলদংশু দন্দান্ত্র অসুরগণের নিদারণ অত্যাচারে ত্রিদিব ধাম বিনষ্ট।... মন্দাকিনীর আর সে শোভা নাই; পারিজাতে আর তেমন গন্ধ নাই।... দেবগণ দৃগুখে স্তম্ভমাণ, অপমানে নতশির।... বৃদ্ধার কোমলকণ্ঠ নিঃসৃত দেবগণের দৃগুখদৈন্য প্লাবিত সুররুণ সংগীতধারা শ্রোতৃবর্গের শ্রবণবিবরে প্রবেশ করিয়া সমবেদনায় তাহাদের হৃদয় আপন্নত করিয়া তুলিল; সকলে স্থান কাল ভুলিয়া বহু প্রাচীন যুগের একটি সঙ্কটময় পৌরাণিক দৃশ্যের মধ্যে আত্মহারা হইয়া পড়িল; সেই বিষাদসংগীত শুনিতে শুনিতে ও দৃশ্যের পর দৃশ্য অতিক্রম করিতে করিতে, দর্শকের নয়নসমক্ষে শূন্য তুষার কিরীটি কৈলাসের পদ প্রান্তবাহিনী সুর-তরঙ্গিণী মন্দাকিনীর ফেনোর্মিমালা বিজন শরবন, হরমনোমোহিনী নগেন্দ্র নন্দিনী পার্শ্বতীর মাতুরূপ ও রজতগিরিনিভ দেবাদিদেব মহাদেবের দিব্যমূর্তি মায়াচিত্রের ন্যায় উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল; অবশেষে সকল চিত্র নিঃপ্রভ করিয়া একটি অনিন্দ্যসুন্দর, পক্ষজলোচন, গৌরকান্তি, অমরবৃন্দবন্দনীয় শিশু দেবতার মূর্তি তাহাদের চিত্রপটে প্রতিফলিত হইল। তখনও সেজের উজ্জ্বল আলোক চণ্ডীমণ্ডপ মধ্যবর্তী ময়ূরাসন কাটিকের সুন্দর মূখের উপর বিম্বত হইতছিল, সকলে ভক্তি পরিপ্লুত হৃদয়ে সেই দেবমূর্তির প্রতি দৃষ্টিপাত করিল।” ৩০

চিত্রময়তা, কালের প্রসারণ, পৌরাণিক সময়ে প্রবেশ, এ সমস্ত কথকতার কাজ, আবার ঢপেরও কাজ। এই পালায় সাহিত্য ও শিল্প মিলে মিশে তৈরি করেছিল অষ্টাদশ ও উনিশ শতকে দেশজ সংস্কৃতি, এক রস আশ্বাদনের জগৎ। ‘আধুনিকতার’ সমান্তরালে এই গোত্রের রসবোধ ক্রিয়াশীল ছিল। তার স্বীকৃতি বিষ্ণুর উপন্যাসে, রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পে রয়ে গিয়েছে।

এই রকম জগতে শিল্প মাধ্যমগুলো প্রতিযোগিতায় রত থেকেও একটা অপরটাকে অনুবদ্ধ করতে সক্ষম হয়েছিল, একজন আরেকজনের কাছ থেকে নিতে কুণ্ঠিত হয়নি। দেশজ সংস্কৃতি তৈরি হতে যাতায়াত শব্দ খাড়াখাড়ি হয় না, আড়াআড়িও হয়, এই কথা মনে রাখা দরকার। এই আড়াআড়িটুকু দিয়েছিল বটলার ছাপাখানার অর্থনীতি, পৌরাণিক আখ্যানের আবৃত্তি ও অনুবৃত্তিতে দর্শকদের রুচি। বৈষ্ণবীয়, শাক্ত বা মহাকাব্যীয় প্রসঙ্গ ও বোধের যে বিপুল সম্ভার প্রাক-ইংরেজ যুগ থেকে তৈরি হয়েছিল, তাতে এক ধরনের নৈতিকতা, শিক্ষা ও রস প্রত্যাশায় অবশ্য টানা পোড়েন ছিল। যেমন শাক্ত বনাম বৈষ্ণব; আবার বৃন্দকে মেলানোও হত কৃষ্ণকালী যাত্রার মধ্যে। কিন্তু এই রস প্রত্যাশার জগতে বৃন্দ ও মেলানোর সম্ভাবনা থাকার ফলে, কথকতা, পালাকীর্তন ও ঢপের আবেদন নানা বয়সের লোকের কাছে ছিল। রস সৃষ্টির প্রক্রিয়ায় লোকেরাও উৎসাহে অংশগ্রহণ করত। উনিশ শতকীয় একটি আসরের বিবরণ এই সজীবতাকে ছুঁয়ে যায়,

“বৃদ্ধেরা মস্তকে চাদর জড়াইয়া আসরে বসিল। যুবকেরা একটু দূরে বসিয়া সেকালের ও একালের ঢপের সমালোচনা করিতে লাগিল। ক্রমে ঢপ, কবি, কীর্তন, পাঁচালী—সকল রকম গানের আলোচনা আসিয়া পড়িল। তর্ককোলাহল ক্রমে সমুচ্চ হইয়া উঠিল। মেয়েরা চিকের আড়ালে বসিয়া কেহ ঢুলিতে লাগিল, কাহারও বা হাই উঠিতে লাগিল, কেহ বা অধীর হইয়া ঢপওয়ালীর প্রতি অভিসম্পাত বর্ষণ করিতে লাগিল। ছোট ছোট ছেলেদের এ সকলদিকে কিছু মাত্র খেয়াল নেই। তাহারা সতীরঞ্জন প্রান্ত-ভাগে বসিয়া বিষম জটলা বাঁধাইয়া দিয়াছে!...

“এমন সময় গান আরম্ভ, সূচনা স্বরূপ বাদ্যযন্ত্রে দুই একটি মৃদু আঘাত হইল, ক্ষণকালের মধ্যে সভাস্থলের কোলাহল মন্দীভূত হইল...

বৃদ্ধেরা তামাক টানিতে টানিতে ভক্তি গদগদ চিন্তে সেই গান শুনিতে লাগিল। যুবকগণের তর্কস্রোতে অকস্মাৎ ভাঁটা পড়িল; বালক দিগের মৃদুস্বর ধামিয়া গেল।”^{৩১}

এইভাবে ঢপের মজলিশে, কথকতার আসরে তন্ময়ীভবনতার মাধ্যমে আবালবৃদ্ধ বনিতা রূপান্তরিত হয় সহৃদয়ে, এবং ফলে শিল্প হয়ে ওঠে রস-সংবেদ্য।

□ পর্ব / ৭ □

কথকতার সামাজিকতা

ক. লোকশিক্ষার চরিত্র বিচার :

বাঁক্ষমচন্দ্র বা সঞ্জীবচন্দ্র, দীনেশচন্দ্র সেন বা হরেকৃষ্ণ মদুখোপাধ্যায়, সবাই ঐতিহ্যানুসারী সমাজে কথকদের শ্রেষ্ঠ লোকশিক্ষক বলেছেন। কথকের সম্বল কথা। মজলিশে সেই কথার মাধ্যমে শ্রোতার নানা নীতি উপাখ্যান শুনতেন, আখ্যানের বয়ানে, গানের কথার পরতে পরতে থাকত জীবনচর্যার নানা মূল্যবোধের ইঙ্গিত, কী করলে ভালো হয়, কী করলেই বা মন্দ হয়, এইসবের নির্দেশ। এই ভালোমন্দ দ্বিকালব্যাপ্ত। কথকের বয়ানে ভূত, ভবিষ্যত, বর্তমান সমভাবে বিরাজ করে। অথচ শ্রোতার তো সাম্প্রতিক। দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা ও জীবনচর্যার মধ্যেই তাদের নীতিবোধ স্থিত। তাই ঘটকালি করার সময় কথকও দৈনন্দিনকে ভুলতে পারেন না, পৌরাণিক চরিত্রে বাস্তবের মিশেল দিতে হয়; কথা যত ‘অসম্ভব’ হোক না কেন, তাকে ‘সহজের’ সমে, সমাজের পথে, ফিরতে হবে। বার বার শ্রোতার কাঙ্ক্ষনিক আখ্যানে খুঁজে বের করেন নীতি প্রাসঙ্গিকতা, প্রাত্যহিক জগতের তুলনা বা প্রতিতুলনায় পৌরাণিক চরিত্রগুলো ফিরে আসে, ঢুকে পড়ে প্রবাদ ও প্রবচনে, ধারণা হয়ে ওঠে লোকগ্রাহ্য, ‘বিদুরের ক্ষুদ্র’ বা

‘রাবণের চিতা’, ‘কংস মামা’ বা “দৈত্যকুলে প্রহ্লাদ”; পৌরাণিক কথা জন্ম দেয় ধারণার, ধারণা রূপ পায় লৌকিক ছড়ায়, সামাজিক মস্তব্যে,

“ভীম, দ্রোণ, কর্ণ গেল, শল্য হল রথী,
চন্দ্র সূর্য অস্ত গেল জোনাকি ধরে বাতী।”

উনিশ শতকের দ্বিতীয় পাদে, লোকবৃত্তের বাইরে দাঁড়িয়ে, ইংরাজের পিঠ চাপড়ানোর কাঙাল, ইংরাজি নবীশ, ‘নদের ফটিকচাঁদ’দের বিরুদ্ধে বীক্ষম প্রায়ই গালমন্দ করতেন। সমাজে ‘শিক্ষিত’ ও ‘রামাদের’ মধ্যকার দূরত্ব ক্রমশ যোজন-প্রমাণ হচ্ছে। বীক্ষম চিন্তিত। এই ব্যবধান কমানোর জন্য যে ‘সুদীক্ষিতের’ উদ্যোগ কামা। লোকশিক্ষার প্রকল্পে তাঁর অগাধ আস্থা। স্বভাবত তাঁর আলোচনার অনুষণে হাজির হন আশৈশব পরিচিত কথক ঠাকুর,

“গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে, বেদী পিঁড়ির উপর বসিয়া, ছেঁড়া তুলট, না দেখিবার মানসে সম্মুখে পাতিয়া, সুগন্ধি মল্লিকামালা শিরোপরে বেঁধিত করিয়া নাদসুনদুদুস্ কালো কথক সীতার সতীত্ব, অজ্ঞানের বীরধর্ম, লক্ষণের সত্যব্রত, ভীষ্মের হিন্দ্রয়জয়, রাক্ষসীর প্রেমপ্রবাহ, দধীচির আত্ম-সমর্পণবিষয়ক সুসংস্কৃতির সম্বাখ্যা সুকণ্ঠে সদলঙ্কার সংযুক্ত করিয়া আপামর সাধারণ সমক্ষে বিবৃত করিতেন। যে লাগল চষে, যে তুলা পেঁজে, যে কাটনা কাটে, যে ভাত পায় না পায়—সেও শিখিত যে ধর্ম নিত্য, যে ধর্ম দৈব, যে আত্মান্বেষণ অগ্রদ্বৈয়, যে পরের জন্য জীবন, যে ঈশ্বর আছেন, যে বিশ্ব সৃজন করিতেছেন, বিশ্ব পালন করিতেছেন, বিশ্ব ধ্বংস করিতেছেন, যে পাপ পুণ্য আছে, পাপের দণ্ড, পুণ্যের পুরস্কার আছে, যে জন্ম আপনার জন্য নহে, পরের জন্য, যে অহিংসা পরমধর্ম, যে লোকহিত পরম কার্য,—সে শিক্ষা কোথায়? সে কথক কোথায়?”^১ (নজরটান আমার)

ইংরাজ শিক্ষিত নব্য যুবকের লোকশিক্ষার প্রতি অনীহার বিপরীতে কথকের সামাজিক ভূমিকাকে বীক্ষম ব্যাখ্যা করেছেন। সংস্কৃতির যোজক হলেন কথক; তাঁর যোজনার ফলে সমাজে মূল্যবোধের সৃষ্টি হয়, চিন্তাবৃত্তির প্রসার ঘটে।

মূল্যবোধের আবৃত্তি নিঃসন্দেহে কথকের কাজ। কিন্তু সেটা এক বিশেষ প্রকারের মূল্যবোধ। তাঁর আলোচনায় দীনেশচন্দ্র সেন বলেছেন যে লোকগাথার প্রেমকাহিনীকে ব্রাহ্মণরা বাতিল করলেন এবং কথকদের মাধ্যমে দেবলীলার কথা চালু করলেন।^২ এক হাতে নিলেন, আরেক হাতে দিলেন। মনোরঞ্জনর ক্ষেত্রটি ‘নিম্নশ্রেণীর’ হাত থেকে চলে গেল পৈতা ঝোলানো কথক ঠাকুরের খপ্পরে। ভালো মন্দের তর্ক-বিচার দীনেশচন্দ্র সেন স্পষ্টত এড়িয়ে গেলেও এই পরিবর্তনের কথা বলেছেন।

ঐতিহাসিক কালক্রম, নৃতাত্ত্বিক তত্ত্ব, এই সবার ফাঁকিরে দীনেশচন্দ্র সেনের বক্তব্যে ফাঁক পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু কথকদের বর্ণিত পালার খুঁটি ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতিতে প্রোথিত ছিল। কথকরা সমাজরক্ষণে ব্রতী ছিলেন, সমাজ পরিবর্তনে নয়।

অধুনা প্রয়াত দার্শনিক দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় চার্বাক দর্শনের অবলুপ্তির পিছনে কথকদের ভূমিকাকে বেশ বড় করে দেখিয়েছেন।^৩ মহাভারতের শান্তিপর্বের একটি আখ্যানে ইন্দ্ররূপী শৈয়াল নাস্তিকধর্মে বিশ্বাসের ভয়াবহ পরিণতি হাতেনাতে দেখিয়েছে, তক'বিদ্যার প্রতি তার অনুরক্তির কর্মফল নিজমুখে বলেছে। কর্মফল কী? আগের জন্মে বামন কিন্তু পরের জন্মে শৈয়াল। আর এই গল্পটি নিপুণভাবে কথকঠাকুর 'নিরঙ্কর' চাষাভুষোদের কাছে বলে কী মারাত্মক 'প্রোপাগান্ডা'ই না করেছেন। কথকরা এইরকম প্রচারক, সাবেক কালের শাসকশ্রেণীর হাতের প্রচারমাধ্যম; অক্ষর-জ্ঞানহীন 'চাষাভুষোদের' চেতনায় 'নাস্তিক্যবুদ্ধির বিভীষিকাটা' 'কথকঠাকুর মারফৎ' শাসকরা গেঁথে দিতেন। গল্পকারদের ও কথকদের প্রসঙ্গে দেবীপ্রসাদের শেষ প্রাসঙ্গিক মন্তব্য হল "আজকের দিনে এরকম কুশলী প্রোপাগান্ডিস্ট-এর খবর পেলো শাসক সম্প্রদায় পুরস্কারের ঝড়ি উপড়ু করে দেবেন।

শ্রদ্ধেয় দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের যে কোনো মন্তব্য অনুধাবনযোগ্য। উনিশ শতকে বিষ্ণুমী মূল্যায়নের সঙ্গে তাঁর বিবৃতির অনেক ফারাক, এমনকি দীনেশ সেনের লেখার মেজাজের সঙ্গেও তাঁর চিন্তা স্বভাবত খাপ খায় না। বিষ্ণুমের কাছে যা লোকশিক্ষা, দেবীবাবুর কাছে সেটা শাসকশ্রেণীর প্রোপাগান্ডা। বিষ্ণুমের ধারণা যে নদের ফটিকচাঁদদের দাপটে কথকদের ভবিষ্যৎ অন্ধকার। হালকাভাবে হলেও দেবীবাবুর মনে হয়েছে যে জানা নেই, তাই। নতুবা কথকদের ভবিষ্যত উজ্জ্বল, খবর পাওয়া মাত্র শাসকদের দয়া তাদের উপর ঝরে পড়বে।

শ্রদ্ধেয় দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের বিচারের সঙ্গে বৈমত্যের সন্যোগ আছে। ঐতিহাসিক-গত ভাবে কথকরা লোকায়তিকদের বিরুদ্ধে কতটা লড়েছিলেন বা ব্যবহৃত হয়েছিলেন, সেটা আলোচ্য নয়। মহাভারত বা রামায়ণের সব আখ্যান কথকরা ব্যবহার করতেন না, সংগ্রহের মাধ্যম দিয়ে কিছু আখ্যানমাত্র নির্বাচিত করতেন, সেই ভিত্তিতে পুঁথি নিজেদের মতো করে লিখতেন। কোনো কথকতার পুঁথিতে 'শান্তিপর্বে' লেখা ইন্দ্ররূপী শৈয়ালের আখ্যান উল্লিখিত করার কোনো ঐতিহাসিক নিদর্শন আছে কিনা, সেই তথ্য বিচারও গৌণ। আপত্তি আছে অন্যথানে, সমস্যাটাকে যেভাবে সাজানো হয়েছে—সেইখানে।

যে কোনো যুগে শাসক শ্রেণীর চিন্তাধারা সামগ্রিকভাবে সমাজে নিয়ন্ত্রকের ভূমিকা পালন করে, মার্কসের এই উক্তি মান্য। আমাদের আজকের সমাজেও ডাক্তার, আইন-জীবী, বিজ্ঞানী ও কবিরা বুদ্ধোজ্জ্বলদের বৈতনভুক, এই দামি কথাটাও মার্কস বলে গেছেন। বেশিরভাগ ব্রাহ্মণ ব্রহ্মোত্তর, দেবোত্তর জমি ভোগ করেন। জমিদার বাড়ির ডাকা আসরে তাঁরা কথক। পালার অন্যতম উৎস ব্রাহ্মণদের লেখা পৌরাণিক আখ্যান। বৌদ্ধিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থের নিগড় কোথায় বাঁধা, সেইটা বুঝতে কোনো অসুবিধা নেই।

অথচ সীমা অতিক্রান্ত হয়, অন্তত হবার সম্ভাবনা থাকে। কথা বলার আর্ট হল

কথকতা। আসন্ন সামাজিক অনুষ্ঠান, বস্তা ও নানা রকমের শ্রোতা উভয়ে উপস্থিত থাকে। শ্রোতার মান্য বান্দন, 'নিরক্ষর চাষাভূষা' 'গোলা মেয়েমানুষ' সবরকম হতে পারে। কিন্তু আসন্ন রসভোগের প্রক্রিয়ায় তাদের সাধ্যানুযায়ী শ্রোতারও সক্রিয়ভাবে অংশ নেয়। নানা শ্রোতার সংবেদনশীলতাকে কথক তার পাঠক্রেমে মোকাবিলা করেন, তা না হলে আসন্ন মাটি হবে। এই মোকাবিলার নানা সাক্ষ্য প্রভুপাদ প্রাণকিশোর গোস্বামীর আত্মজৈবনিক রচনায় লক্ষ্য।

ফলে ইচ্ছানুসারে বক্তব্যকে চেতনায় গেঁথে দেওয়া যায় না; তেমন তেমন শ্রোতার মান পাঠের কথকের দাড়ি মরা পোষা ছাগলের দাড়ির কথা মনে করিয়ে দেয়, তার শোক উছলে ওঠে, এই কথাও গল্পে শোনা যায়।^{৩৯} সব মতের কথক থাকতে পারে। নাস্তিক বৌদ্ধ ও জৈনদেরও 'কথা' ছিল, তাই কথকও ছিল। কিন্তু 'রক্ষণশীল আনন্দিক' কথকরাও মজলিশের চাহিদার তাগিদে, শিল্পের নীতিতে, এমনকি পেশার খ্যাতিতে সবসময় বান্ধাধরা পথে চলবেন, তা নিশ্চিত করে বলা যায় না। অভিযোজন চলছে, তাৎক্ষণিকতা বয়ানের অভিমুখ বদলাচ্ছে, এই সবেয় কিছু কিছু উদাহরণ প্রসঙ্গান্তরে আলোচিত হয়েছে। পুরুষ শাসিত সমাজের ভ্রুকুটি অবহেলা করে কুমুদবন্ধু তাঁর পালা 'রিগুনলীলার' মধ্যে মহিলা শিক্ষার পক্ষে জোর সওয়াল শব্দ করেন, এইরকম নজিরও আছে।

স্বার্থ যাই থাকুক না কেন, অভীষ্ট যে ভাবে ছকা হোক না কেন, কথকদের সত্তা আছে, শ্রোতাদের বোধ আছে, আছে সামাজিক অভিজ্ঞতা। যোজক ও যোজিতের পারস্পরিক সংঘাতে (স্ববিধ অর্থে) রসভোগের ক্ষেত্র তৈরি হয়, সেই ক্ষেত্রে টানাপোড়েন আছে, প্রতিসরণ হয় আখ্যানবিন্যাসে ও ভাববোধে। শাসকশ্রেণীর হাতে কথকদের ক্রীড়নক—তাদের আদর্শ প্রচারের 'মাধ্যম' মাত্র মনে করা, অন্যদিকে 'নিরক্ষর' (দেবীবাণু বার বার কেন জানিনা এই বিশেষণটা গ্রামবাসী ও চাষীদের আগে ব্যবহার করেছেন: যেন অক্ষর জ্ঞানটা বুদ্ধি-বিবেচনা ও যুক্তিবোধের সমার্থক) চাষীদের চৈতন্যকে আঁক টানার স্লেট হিসাবে দেখানোর মধ্যে আদর্শ ও মূল্যবোধ গড়ে ওঠার পথে বৈপরীত্যের নানা মূহূর্তকে অবহেলা করা হয়, যোজনার আদান-প্রদানের প্রক্রিয়াকে বাদ দেওয়া হয়। আসন্ন পাঠের ও শোনার নানা স্তরে যে ভিন্ন বয়ান তৈরি হতে পারে, মূল্যবোধের রঙে তারতম্য ঘটতে পারে—এইরকম কোন সম্ভাবনা এই জাতীয় আলোচনায় আমল পায় না।

খ. কথক ঠাকুর ও সামুহিক চৈতন্য

এই মূল্যবোধ নির্মাণ-প্রক্রিয়া সমূহের স্থান কোথায়? কী করে বা যোজিতের অবস্থান পরিবর্তন যোজকের ঘটকালি রীতিতে পরিবর্তন আনে, উভয়ের টানাপোড়েন আখ্যানের বিন্যাস, রসভোগকে করে তোলে ভিন্নতর? তুলনা, প্রতি তুলনার মাধ্যমে সমস্যা বিচারে প্রবৃত্ত হওয়া যেতে পারে? সমূহের উপস্থিতি কথকতার আসন্ন পরিমণ্ডল

কীভাবে নির্ধারিত করে, সেই বিষয়ে যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধির প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ছিল। তাঁর সাক্ষ্য থেকে বিস্তৃত উদ্ধৃতি দেওয়া আবশ্যিক : “আশী বৎসর পূর্বে মাতাঠাকুরাণী রামায়ণ পাঠ করাইয়াছিলেন। তখন ইংকুলে পড়ি। সমুদয় ঘটনা এখনও প্রত্যক্ষ প্রতীয়মান হইতেছে। তিনি গৃহদেবতা রঘুনাথজীউর সম্মুখে সঙ্কল্প করিলেন, তিনি সমস্ত বৈশাখমাস রামায়ণ পাঠ করাইবেন। আটচালায় বেদী নির্মিত হইল, গ্রামস্থ সকলকে রামায়ণ পাঠ শ্রবণ করিতে আহ্বান করা হইল। মা পাঠক ঠাকুরকে ধুতি, উড়ানী আর কি কি দিয়া বরণ করিলেন। অপরাহ্নে পাঠক বেদীতে বসিয়া রামায়ণের পুথি খুলিলেন। গ্রাম ছোটো, ইতোমধ্যে পঞ্চাশ ষাটজন পুরুষ এবং ত্রিশ চা্লিশ জন নারী যথাস্থানে উপবিষ্ট হইয়াছিলেন। পাঠক রামায়ণ হইতে দুইটি, তিনটি, চারটি শ্লোক পাঠ করিলেন, তারপরে ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। কত প্রকারে তাৎপৰ্য বদ্বাইতে লাগিলেন, কখন তিনি অভিনয় করেন, কখন পুরুষোচিত ভাষা ব্যবহার করেন, কখন নারীসুলভ কণ্ঠে খেদ করেন ইত্যাদি প্রায় দেড় ঘণ্টা এইরূপ চলিতে থাকে। শ্রোতৃবর্গ নিবিষ্ট চিত্তে শ্রুতিতে থাকে। প্রতিদিন যে একই লোক আসিত তাহাও নয়। রাতের গ্রামে বর্ষাঋসী বিশেষতঃ গ্রামের ঝিউড়ি, এ পাড়ায় সে পাড়ায় স্বচ্ছন্দ আসে। শ্রোতাদিগের মধ্যে অনেকেই অতল্প লেখাপড়া জানিতেন, তাহাও পাঠশালায় সমাপ্ত। কিন্তু পাঠকের ভাষা সংস্কৃত শব্দ বহুল হইলেও ভাবার্থ গ্রহণ করিতে পারিতেন। এইরূপে বৈশাখ মাস অভিবাহিত হইল। সমাপ্তি দিবসে দ্বিতীয় উদযাপিত হইল, পাঠক দক্ষিণান্ত হইলেন।...পরদিন স্বাক্ষর ভোজন। মায়ের সংকল্প সিদ্ধ হইল। শ্রোতারা দুই কারণে আসিত—রামায়ণ পাঠ শ্রবণ করিলে পুণ্য হয়, তাহারা পুণ্য অর্জন করিতে আসিত। আর দ্বিতীয় কারণ, তাহারা না আসিলে মায়ের সংকল্প ভঙ্গ হইত। তাঁহার পাপ হইত। তাঁহারা তাঁকে পাপের ভাগী করিতে পারিত না। এই কারণেও তাঁহারা না আসিয়া পারিত না। তাহাদের আসাতে মাকৃতার্থ বোধ করিতেন। রামায়ণ শ্রবণ করিলে পুণ্য হয়, ইহা কি অন্ধ বিশ্বাস? যিনি একথা বলেন তিনি রামায়ণ পড়েন নাই, শ্রদ্ধা সহকারে পড়েন নাই। রামাদির চরিত্র ধ্যান করেন নাই। আর, তিনি পুণ্য শব্দের অর্থও জানেন না।”^৪

(নজরটান আমার)

কথকতা ইতিহাসে, সমাজে বিবর্তিত। আসরের উদ্যোক্তা ও শ্রোতারা পাপ ও পুণ্যে বিশ্বাসী। পাপ-পুণ্য একার নয়, তার ছোঁয়াচ সবার লাগে, সবার তাতে অংশ আছে। সংকল্প করেন একজন, ডাকেন একজন কিন্তু আসতে হয় সবাইকে, আসরে হাজির থাকা হল সামাজিক দায়। যোগেশচন্দ্র রায়ের ধর্মকান্টা তাৎপৰ্যপূর্ণ। রস উপভোগ-এর শর্ত আছে, শ্রদ্ধা থাকতে হবে, পুণ্যে আস্থা রাখতে হবে। শ্রদ্ধার

আভিধানিক অর্থ তো বিশ্বাস, প্রত্যয়, স্পৃহা, আকাঙ্ক্ষা ইত্যাদি। পুণ্য অর্থ শুভকর্ম, পবিত্র ধর্ম। এই সব গুণের শর্তাধীনে যোজক-যোজিতের মোকাবিলা হয়, তা না হলে রসভোগের সম্ভাবনাই নাকচ হয়ে যায়। “কাশীরাম দাস ভনে, শুনেনে পুণ্যবান।” শ্রোতার পুণ্যবান, তাই তো তাঁরা কথা শুনছেন।

যখন সমূহ বদলে যায়, শর্ত পালটে যায়, তখন কথকও বাতিল হয়ে যান। যোগেশ-চন্দ্রের সমসাময়িক কলকাতার এক বাসিন্দা লিখছেন,

“বৃদ্ধ ও বৃদ্ধারা তাহাদের কথকতা ও পালাগান শুনিতেন যাইতেন। অন্যান্য ভদ্রলোকেরা কখনো যাইতেন না। কথাবার্তার প্রচলিত মাত্রাই ছিল—এ যেন ‘কথকের কথা’, অর্থাৎ বিশ্বাসযোগ্য নয়।”^৫

প্রতিতুলনা আনা যেতে পারে। ‘কথার’ একটি রূপ কথকতা। আরো অনেক প্রজাতি আছে—রূপকথা, গীতকথা, কিস্যু, ইত্যাদি, সেইগদ্যলিও বাচ্য। এই বাচনীয় প্রজাতি ছাপার অক্ষরে এল, বঙ্গ শিশুসাহিত্যে শোরগোল পড়ে গেল।

বিংশ শতকের গোড়ায় ডিকটাফোন নিয়ে দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার একশ বছরের বৃদ্ধার কাছ থেকে গীতকথা সংগ্রহ করেছেন, যেমন শুনছেন তেমন লিখেছেন, সেইমতো ছাপিয়েছেন। পরে সমালোচকদের চাপে, “গল্পভুক সামান্য শিক্ষিত পাঠকবর্গের” চাহিদা মেটাতে ঠাকুরদাদার ঝুলির প্রথম সংস্করণ (১৯০৮) পুনর্লিখিত হল, সেই মার্জিত সংস্করণেরই বাজারে কাটতি হল। পুনর্লিখনে মূল গল্প বদলায়নি।^৬ কিন্তু অপ্রচলিত শব্দ পাটানো বা ভাষার মার্জিতকরণে দক্ষিণারঞ্জনের কলম সীমাবদ্ধ থাকেনি। কথ্য গল্পের সংহত লেখ্য রূপ দেওয়া হয়েছে, রকমফের ঘটে গেছে গল্প আশ্বাদনের তারে।

মনে রাখতে হবে ঠাকুরদাদার ঝুলির গল্প গীতকথার সংকলন। বিশেষ আয়োজন ও সমাবেশে সমূহের সামনে কথাগদ্যলি বলা হত। আঁতুড়ঘর গল্প বলার অন্যতম জায়গা। আসন্নপ্রসবা জননী যোদিন থেকে আঁতুড়ে যান সেই দিন থেকে গীতকথা-অভিজ্ঞরা প্রতি রাতে মজলিশ বসাতেন।

রাত্রি স্বপ্রহরে আসর শেষ হত। কথকদের মধ্যে কেউ সন্দ্রান্ত বিধবা, অনেকে কৃষক। ‘রোজের রাত যোগান’ তারা কড়ায়-গন্ডায় বুদ্ধে নিত। ষষ্ঠীর দিন ঘটা বেশি হত, সারারাত ধরে পালা বলা চলত। অন্য গায়ক-গায়িকা “মূল কথকের” সঙ্গে যোগ দিত, কথার সঙ্গে সঙ্গে গান চলত। ছেলে, মেয়ে, বড়ো, আসরে সবাইয়ের অবাধ প্রবেশাধিকার।^৭

বৈলক্ষণ্যগদ্যলিও স্পষ্ট। কথকতা মার্গ থেকে জন-অভিমুখী, ব্রাহ্মণের পুত্র থেকে প্রাকৃতজনের আসরে তার যাত্রা। লোককথার কথ্য রূপকে দক্ষিণারঞ্জন মার্জনা করেছেন, আঁতুড়ঘর থেকে গল্পকে তুলে আনছেন ব্যক্তি পাঠকদের শহুরে বৈঠকখানায়; কথকতার আখ্যানের যোজনার অভিমুখের বিপরীতে ঠাকুরদাদার ঝুলির গল্পের যাত্রা, কথার রওয়ানি হয়ে ওঠে অন্যরকম।

বর্তমান প্রসঙ্গে একটি উদাহরণ যথেষ্ট। দীনেশচন্দ্র সেনের সাক্ষ্যানুযায়ী, প্রথম সংস্করণে ‘মালগুম্বালা’ গল্পটি শব্দে হুবহু লেখা হয়েছিল, তাই ওই গল্পটি থেকে একটি অনুচ্ছেদ উদ্ধৃত করা হল :

প্রথম পাঠ : ১৯০৮

“কোটালিনী ছিল ঘরে, কোটালিনী আসিয়া কয়,—কি বারোদিনের আয়ু তারি কাছে দিব কন্যা আমার,—যুগ জন্ম হবিষ্য।— মা গেলেও না, ছা গেলেও না ! কপাল আমার,—বারোবছরের তিনবছর গেল রোগে, চারবছর গেল শোকে,—আরও যে বছর আছে তা যদি না যায় ভোগে, তো মেয়ের জন্ম কি ? হাঁড়ীর মাছ হাঁড়ীতে জিয়াই, শাখা সিঁদুরের বাড়ি খোয়াইতে একবেলা খাই একবেলা না খাই,—এক কোলের কন্যা—তাই দিব শিশুপুত্রের কাছে।—সেও পুত্র বাঁচে কি না বাঁচে ?—‘কুঁড়ে বাঁধি, কুঁড়ের থাকি তার তলেও রাজার হাঁচি !’ রাজাকে গিয়া কও, কন্যা যে আমি দিব না ‘আহা, কিবা আমার পাড়লেন গিয়া ফল, তারি জন্য দেখি আমি কন্যার চক্ষের জল !’ কোটালিনী পোটলা পুটলী বাঁধিয়া কন্যাকে ডাকে,— ‘মালগুম্বা লো মালগুম্বা ! আয় মা, আমরা এ জনমের মত রাজ্য ছেড়ে যাই।’”

মার্জিত পাঠ : ১৯০৯

“কোটালিনী বলে,—কুঁড়ে বাঁধি কুঁড়ের আছি, তার তলেও রাজার হাঁচি।’ বারো দিনের আয়ু শিশুর কাছে কন্যা দিব ? রাজাকে গিয়া বল কন্যা আমি দিব না।”

দুইটিতেই কোটালিনীর আপত্তির কথা অক্ষুণ্ণ আছে, বদলে গেছে শুধু ঢঙ; বাঞ্জনের তার হয়ে গেছে পানসে। [একান্ত আমার পাঠ, সামূহিক নয়] প্রথম বয়ানে আছে আশা ও আশঙ্কা, বণ্ডনা ও সাধ, রাজার প্রতি ছুঁড়ে দেওয়া ব্যঙ্গ, সংসারে দৈনন্দিন লড়াই, অত্যাচার থেকে মেয়েকে বাঁচাবার জন্য পথে বেরিয়ে পড়বার তাগিদ। রাজার অন্যায় আবদারের বিরুদ্ধে, জোর জবরদস্তির বিরুদ্ধে এইসব অনুভূতির মিশ্রণে গড়ে উঠেছে কোটালিনীর আপত্তি। মার্জিত পাঠে শব্দ বদলায়, গান বাদ দেওয়া হয়, বলার রওয়ানিকে সংক্ষিপ্ত করা হয় সরাসরি নৈতিবাচক বাক্যে; লৌকিক স্বাদের আভাস দেবার জন্য বজায় রাখা হয় একটা প্রবাদ। ফলে কোটালিনীর আপত্তি একমাত্রিক ঘোষণার মতো শোনায়। বাগর্থ্য যে সম্পূর্ণ, আলাদা করা মর্শ্বাকল।

নতুন গড়ে ওঠা ‘শিশু সাহিত্যের’ অন্যতম রূপকার দক্ষিণারঞ্জন। জোর তর্ক চলছে, কোনটা পাঠ্য কোনটা অপাঠ্য, কোনটা বোধগম্য, কোনটা বা দুর্বোধ্য। এই গোষ্ঠীতে দক্ষিণারঞ্জনও আছেন, লিখছেন দেশগঠনের বই, চারু ও হারু, লাণ্টবয়, ফাণ্টবয়। তার চেয়ে বড় কথা বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ উদ্যোগ নিয়েছে, খাঁটি দেশজ বস্তুর উদ্ধার করতে হবে, স্বদেশী রূতে নিজস্ব সম্পদের অনুসন্ধান লিপ্ত হতে হবে, ‘ভারতীয়

প্রাণধারা', 'বাঙালীর জাতীয় চিত্তরসের' সঙ্গে শিক্ষিতের পরিচয় করানো কতব্য। এই প্রকল্পের তিনি পুরোপুরি শরিক, এই কথা দক্ষিণারঞ্জন ভূমিকায় বার বার স্বীকার করেছেন। 'আমার দেশ', 'বাঙালীর আপন প্রাণ', 'বাংলা ভাষার প্রকৃত আকৃতি' (নজরটান মিশ্র মহাশয়ের) সব কিছু ঠাকুরদাদার ঝুলিতে পাওয়া যাবে, এই বিশ্বাসে তিনি কাহিনী সংগ্রহ করে প্রকাশ করেছেন।

এর অর্থ এই নয় যে দাবিগদুলি যথার্থ নয়, মিশ্র মহাশয়ের বানানো। কিন্তু মনে রাখা দরকার যে 'কথার' বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করা হচ্ছে নতুনভাবে। বোধের এই রূপান্তর স্মর্তব্য। সমালোচনা দরকার। 'পাশ্চাত্য শিক্ষা', 'পাশ্চাত্য আদর্শ' ও 'উপন্যাস' জাঁকিয়ে বসেছে, তার তুলনীয় কিছু 'আমার দেশ' দিয়েছিল, যেমন 'শিশুসাহিত্য (রূপকথা)' মেয়েলি সাহিত্য (ব্রতকথা) ইত্যাদি। জিনিস খাঁটি হওয়া চাই, মেকি হলে চলবে না। জড়িত আছে 'জাতির বেদনা উল্লাসের মর্মমর্যাদা', 'দেশে ও বিশ্বে' প্রতিষ্ঠা কামনা, প্রমাণ করার উদগ্র ইচ্ছা "ভারতেরই মধুচক্রের মোম, অপর দেশ হইতে ক্যান্ডেলরূপে আসিয়া, আলো জ্বালাইতেছিল।" ফলে জিনিস আমাদের, কিন্তু প্রতি পদক্ষেপে তুলনা দিতে হবে বিদেশের, তা না হলে স্বদেশ প্রতিষ্ঠিত হবে কী করে? ১০

এই আদিকল্প যে রাজনৈতিক ও সামাজিক বাতাবরণে গড়ে উঠেছে, তা সুপরিচিত। ফলে যোজনার ক্ষেত্রে প্রতীকরণ ঘটেছে। সমসাময়িক অনেকের মতো দক্ষিণাবাবুও মনে করছেন খাঁটি আছে পল্লীতে, বঙ্গজননী হচ্ছেন পল্লী নিবাসী। পল্লী ও শহরের ব্যবধান-এর ধারণা প্রধান হয়ে উঠেছে। পল্লী 'খাঁটি স্বদেশী' শহর মেকি বিদেশী। পল্লীর আঁতুড়ঘর গল্পের উৎস, ভূমিকার ওনং পাদটীকায় আঁতুড়ঘরকে জায়গাও দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু উদ্দেশ্য হচ্ছেন শহরের আধুনিক পাঠকরা। দক্ষিণাবাবুও 'ঘটকালী' করছেন, শহরে পাঠকদের পড়াচ্ছেন 'পল্লীর শ্রুতিসাহিত্য।' রবীন্দ্রনাথ প্রস্তাব দিচ্ছেন যে "আধুনিক দিদিমাদের জন্য অবিলম্বে স্কুল খোলা হউক"। সেইখানে দক্ষিণাবাবুর বই হবে পাঠ্য। ১১

কথকের উদ্দেশ্য একেবারে আলাদা। শহর বা পল্লীর স্বেধতা তাঁর পালার কেন্দ্রীয় ভাব নয়, মথুরা ও বৃন্দাবন, রাখাল রাজা ও স্মারকর রাজা এক লীলাময়ের প্রকার মাত্র। আসরে শ্রোতার পরিচয় বাঙালি নয়, ভক্ত; বিপরীতাচারীরা হল পাষণ্ড। আজও পাঠের শেষে স্বিজবাবু ভক্তমণ্ডলীর নামে জোকায় দেন, পাঠের প্রারম্ভে বাসন্তী দেবী উপস্থিত ও অনুপস্থিত, গত ও বর্তমান ভক্তবৃন্দের চরণে কোটি কোটি প্রণাম জানান। গোপবামী কবিরাজের অনুসরণে সপ্তদশ শতকে যদুনন্দন তো বলে দিয়েছেন পাঠের সার্থকতা, পাঠকের কামনার কথা:

"মোর মুখ মরুস্থল, বাণীখিল্লরূপচর গোকুলা উন্মুখা বাক্যগণ।

বৈষ্ণবের কণা নদী, প্রবেশ করয়ে যদি, পুষ্ট স্নিগ্ধ হইবে তখন।" ১২
বাচ্য থেকে পঠনীয়, কথ্য থেকে লেখ্য, শ্রুতি থেকে মূদ্রণ। তাই যোজিতের পড়ার সুবিধের জন্য সংস্করণকে মার্জিত করা হল। পল্লী "গীতকথা" হয়ে যাচ্ছে, তাকে

হতে হচ্ছে ‘বংগোপন্যাস’। আধুনিক শিশু সাহিত্যের তালিকায় সেইটা অবশ্য পাঠ্য, ১৯৮৬ সালে প্রকাশিত হল ‘বংগোপন্যাস’-এর ষোড়শ সংস্করণ। আর কথকতার আখ্যান খুঁজে পাওয়া যাবে শুধু পুঁথিতে। ওই গল্পের অমার্জিত পাঠ তো এককের নয়, পাপ পুণ্যে বিশ্বাসী ভক্তসমূহের, যে সমূহ আজ ‘জাতিতে’ পর্যবসিত, যার সন্তা আজ ‘এককে’ বিভক্ত, স্বগত পাঠে যে অভ্যস্ত। □

...

আসরে ঝাঁপ পড়ে গেছে, ধীরে ধীরে পুঁথি পাতড়া গুঁটিয়ে ফেলছেন, লাল বনাত গায়ে চাঁই বড়ো, উঠে যাবার সময় হল তাঁর, কোনোদিন আর ডাক আসবে কিনা, কে জানে। সেই কবে খবর পেয়েছি কাশীতে মারা গেছেন হরু ঠাকুর, নিশ্চিন্দিপুত্রের হরিহর রায়। আর কে পালা বাঁধবে তাঁর মতো? মনটা কি একটু আনচান করে? জানি ‘দুর্ভাবনাময় জটিল সাম্প্রতিকের’^{১৩} মুখোমুখি আমরা, লোকে ধমক দেবে। এইসব ক্ষেত্রে বিষয়তাকে প্রশ্ন দেওয়া কাজের কথা নয়, সেইটা রোমান্টিকতা, অলস ‘নস্টালজিয়া’। ইতিহাসের আধুনিকতার, অনিবার্যতার বিরোধিতা। যা অবস্থা আজ-কাল, এই অতীতবিলাস বিপদজনক ও হতে পারে, ব্রাহ্মণ্যবাদকে প্রশ্ন দেবে, হয়তো বা দুর্বল করে তুলবে ধর্মনিরপেক্ষতার লড়াইকে। কিন্তু এও তো মনে হয় যে সমূহের রসভুক্তির ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতাকে যথাযথ সামাজিক ও নান্দনিক মর্যাদা না দেওয়াটা কৃতঘ্নতা। আরো শুনছি যে অপু আজও স্বপ্ন দেখে, এই দরিদ্র, নিষ্পেষিত দেশে, নিষ্কল্প সময়ে প্রতিদিন তার কানে ভেসে আসে তার বাবার, কথক হরিহরের, আশীর্বাচনের রেশ ;

“কালে বস’তু পজ্জ’ন্যং পৃথিবী শস্যশালিনী...”

লোকাঃ সন্তু নিরাময়া :...”

কৃতজ্ঞতা স্বীকার—জীবিত কথক ও কথকীদের কাছে আমার ঋণ অপরিসীম। তাঁদের সাহায্য ও আসর ছাড়া এই রচনা কোনোদিন সম্ভব হত না। অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্য তাঁদের কাছে মার্জনা ভিক্ষা করছি।

বরাহনগর শ্রীপাঠবাড়ির গ্রন্থাগারিকের অকুণ্ঠ সাহায্যকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি।

দেবাশিস বসু ও মৃদুলকান্তি বসু নিঃস্বার্থভাবে নানা সূত্রের হৃদিস দিয়েছেন। বাবু ইন্দ্রনাথ মজুমদার এবং বন্ধু অরুণ নাগ ও বন্ধুপত্নী মধুশ্রী নাগের সহযোগিতা ও উৎসাহ অনেক সময় গবেষণাকে সুগম করেছে। নানাভাবে সাহায্য করেছেন অর্দিতনাথ সরকার, অমর সূ, নীলমণি মুখোপাধ্যায়, অরুণ দাশগুপ্ত, শ্রুভেন্দ্র দাশগুপ্ত, সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রদ্ধেয় বিশ্ববন্ধু ভট্টাচার্য, ছাত্র প্রদীপ্ত রায় এবং অগ্রজপ্রতিম সম্পাদক অনিল আচার্য।

জাতীয় গ্রন্থাগার, সাহিত্য পরিষদ গ্রন্থাগারের কর্মচারীদের ও বেহালা হরিসভার কতৃপক্ষের সহযোগিতার কথাতো বলাই বাহুল্য।

সবার শেষে ধন্যবাদার্থ বন্ধুবর রাঘব বন্দ্যোপাধ্যায় ও যোগসূত্রের ত্রুণ উদ্যোক্তারা।

টীকা ও সূত্র নির্দেশ

- সংকেত সূচী :—বিশ্ব— পুঁথিশালা, বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়।
 ক. বি.— পুঁথি সংগ্রহ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।
 পাঠবাড়ি— শ্রীগোরাঙ্গ গ্রন্থমন্দির, পাঠবাড়ি, বরাহনগর।
 এশিয়া— পুঁথি সংগ্রহ, এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল কলিকাতা।
 তালিকার ক্রমিক সংখ্যা ও ফোলিও সংখ্যা দ্বারা নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

□ পর্ব / ১ □

- ১। রামগতি ন্যায়রত্ন, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব, হুগলী বুদ্ধোদয় যন্ত্রে মুদ্রিত, ১৮৭২-১৮৭৩, ১৩৪ ও ৮১।
- ২। গঙ্গাচরণ সরকার, বঙ্গভাষা ও বঙ্গসাহিত্য বিষয়ক পত্রিকা, ঢাকা কলেজ ভবনে প্রীত, ১২৮৬ আষাঢ় মাস, চুঁচুড়া সাধারণী যন্ত্র, ১৮৮০, ২৬।
- ৩। MAHAMAHOPADHYAY Hara Prasad Sastri Ed. & Revised by Jogendra Nath Gupta, *A Descriptive Catalogue of the Vernacular Manuscripts in the Collections of the Royal Asiatic Society of Bengal*, Vol IX Bengali Manuscripts, Calcutta, 1949, 48।
- ৪। ঐ, 60,268,182।
- ৫। গঙ্গাচরণ সরকার, প্রাগদুস্ত।
- ৬। রাধাগোবিন্দ নাথ সম্পাদিত, শ্রীচৈতন্য ভাগবত, মধ্য, ১ম, কলিকাতা, ১৯৮১, ১ম অধ্যায়, ৫২-৫৪।
- ৭। ঐ, মধ্য, ২য়, ২১শ অধ্যায়, ১৮১-১৮৪।
- ৮। ঐ, অন্ত্য, ৫ম অধ্যায়, ১৯৮।
- ৯। হরিদাস দাস সম্পাদিত, গুণলেশসূচকম, শ্রীশ্রীনিবাসাচার্য গ্রন্থমালা, হরিবোল-কুটীর, নবম্বীপ, প্রকাশন তারিখ অনুজ্ঞেখিত, ৬৭ নং শ্লোক। Rama Kanta Chakraborty, *Vaisnavism in Bengal*, Cal, 1984, 214।
- ১০। গুণলেশসূচকম, ঐ, ৮৭-৮৮ নং শ্লোক। শ্রীল নরহরি চক্রবর্তী ঠাকুর বিরাচিত, শ্রীশ্রীভক্তিরত্নাকর, গোড়ীয় মিশন সংস্করণ, বাগবাজার, ১৯৮৭, সপ্তম তরঙ্গ, ৩৪৪-৩৪৫।
- ১১। শ্রীশ্রীভক্তিরত্নাকর, ঐ, নবম তরঙ্গ, ৩৯৮-৪০০।
- ১২। William Ward, *View of the History, Literature, Religion of*

the Hindus including a minute description of their manners & customs and Translations from their principal works, 2nd ed. Vol 1, Section IV, 70, Serampore, 1815.

- ১৩। ঐ, Vol II, 220.
- ১৪। কুলদানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীশ্রীসদগুরু সঙ্গ, ২য় খণ্ড, কলিকাতা, ১৩৭৮, ১৫৪।
- ১৫। শান্তিকুমার দাশগুপ্ত সম্পাদিত, আমার জীবন, প্রথম খণ্ড, নবীনচন্দ্র রচনাবলী, প্রথম খণ্ড, কলিকাতা, ১৩৮১, ১৭৮।
- ১৬। ঐ, ১৭৭।
- ১৭। “সমাজচিত্র (পূর্ব ও বর্তমান) অথবা কেঁড়েলের জীবন”, সুনীল দাস সম্পাদিত মনোমোহন বসু অপ্রকাশিত ডায়েরী, কলিকাতা, ১৯৮১, ১০৩। উদ্ধৃতিতে নজরটান বাদ পড়েছে। শেষ বাক্যটি লক্ষ করুন।
- ১৮। বিনয়চন্দ্র মিত্র, রাজারামপুর শ্রীকৃষ্ণপুর মিত্রবংশ, বর্ধমান, বর্ধমান সাহিত্য সভা, ১৯৪২, ১১৬-১১৭, ১৬৩।
- ১৯। তারাক্ষর বন্দ্যোপাধ্যায়, আমার কালের কথা, কলিকাতা, ১৩৫৮, ৯৩-৯৪, ৯৯, ১০৫, ১০৭।
- ২০। অতুলকৃষ্ণ দত্ত চৌধুরী, আমার গ্রামের কথা, কলিকাতা, ১৯৪৪, ৩৮।
- ২১। *Reports on Publications issued and Registered in the several Provinces of British India during the year 1878*, Cal, 1879, *Selections from the Records of the Govt. of India, Home Revenue and Agricultural Dept.*
- ২২। তারাক্ষর বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, ৩৭।
- ২৩। রামসুন্দরী দেবী, ‘আমার জীবন’, আত্মকথা, নরেশচন্দ্র জানা প্রমুখ সম্পাদিত, প্রথম খণ্ড, কলিকাতা, ১৯৮১, ৩৭।
- ২৪। কুন্তক, বক্রোক্তিজীবিত, প্রথমোন্মেষ, ১৭ নং কারিকা। রবিশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত ও অনূদিত, কলিকাতা, ১৩৯৩, ৭০-৭৩, ১৭। S. K. De. ed. *The Vakrokti-Jivitam*, Calcutta, 1961, 17.
- ২৫। ভট্টহরি, বাক্যপদীয় : ব্রহ্মকান্ত, ১ম খণ্ড, বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য সম্পাদিত, কলিকাতা, ১৯৮৫, ৮১নং কারিকা। ১৯৩-১৯৬।
- ২৬। প্রাসঙ্গিক আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য, S. K. De, *History of Sanskrit Poetics*, Calcutta, 1976, 142-144
- ২৭। ধন্যলোক ও লোচন, সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত ও কালীপদ ভট্টাচার্য অনূদিত ও সম্পাদিত, প্রথম উদ্দেত, কলিকাতা, ১৯৮৬, ৪৪-৪৫।
- ২৮। তৃতীয় উদ্দেত, ৩ ও ৪ নং কারিকা ও লোচন টীকা, ১২৭-১২৮।
- ২৯। ঐ। ছাপায় ভুল আছে। হবে : শ্রোত্রৈক গ্রাহ্যোহপি

- ৩০। কুন্তক, প্রাগদুস্ত।
- ৩১। পশ্চিমঘাটের ডায়েরী, রবীন্দ্র রচনাবলী, বিশ্বভারতী সংস্করণ, উনবিংশ খণ্ড, ৪১৪-৪১৫।
- ৩২। রাসসুন্দরী দেবী, আমার জীবন, প্রাগদুস্ত, ২৯-৩১, ৩৬-৩৭।
- ৩৩। 'জীবনস্মৃতি', রবীন্দ্ররচনাবলী, সপ্তদশ খণ্ড, বিশ্বভারতী সংস্করণ, ৩০৮। শিলাইদহে ১৮৯০ সালে প্রমথ চৌধুরিকে লেখা চিঠি, চিঠিপত্র, পঞ্চম সংকলন, ১৩৯, বিশ্বভারতী, ১৩৫২। শান্তিনিকেতনে কথক হিসাবে রবীন্দ্রনাথ নিজে ১৬ দিন ধরে মহাভারতের আখ্যান বলেন। খুব জমাটি আসর হয়েছিল। Manoranjan Bandyopadhyay Santiniketan Reminiscence, চিঠিপত্র, দ্বয়োদশ খণ্ড, বিশ্বভারতী, ১৯৯২, ১৯৭।
- ৩৪। মনোমোহন বসুর অপ্রকাশিত ডায়েরী, প্রাগদুস্ত, ১০১-১০২
- ৩৫। বুদ্ধদেব বসু, মহাভারতের কথা, কলিকাতা, ১৩৯২, ১১৪।
বৃহদ্রম-পুরাণ পণ্ডানন তর্করত্ন সম্পাদিত, নবভারত সংস্করণ, কলিকাতা, ১৩৯৬, পূর্বখণ্ড, অধ্যায় ২৭-২৯, ১০৯-১১৬। ১ অধ্যায়, ১-২, ১৩ অধ্যায়, ৫৬, পুরাণটি পশ্চিমবঙ্গে দ্বয়োদশ শতকের শেষভাগে লেখা হয়। বিস্তৃত আলোচনা, R. C. Hazra, *Studies in the Upapuranas*, Vol. II Cal, 1963, 396-466. প্রত্যেক পুরাণেই বস্তুর পরম্পরা নির্দিষ্ট উক্ত আছে, তার দ্বারা পুরাণের মাহাত্ম্য ও প্রামাণিকতা নির্ধারিত হয়। পুরাণের কাঠামো প্রসঙ্গে সাধারণ আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য, Mahamahopadhyay Hara Prasad Sastri. *A Descriptive Catalogue of Sanskrit manuscripts in the Collections of the Asiatic of Society Bengal*, Vol V, Purana Manuscripts, Preface, LXXIII—CCXXV. গিরীন্দ্র শেখর বসু, পুরাণ প্রবেশ, কলিকাতা, ১৩৪১। G. Bonazzoli, 'Puranic Parampara', Purana, Vol 22, 1980, No 1
- ৩৬। তথ্যাদি সংগৃহীত হয়েছে, G. Bonazzoli, 'Composition, Transmission and Recitation of the Purans' (A few remarks), *Purana*. Vol. XXV, No 2, July, 1983
- ৩৭। বৃহদ্রম পুরাণ, প্রাগদুস্ত, পূর্বখণ্ড ২৯শ অধ্যায়, ১১৬।
- ৩৮। 'পারায়ণ' বিশ্বকোষ, নগেন্দ্র নাথ বসু সম্পাদিত ১১শ খণ্ড ১৮৮৬-১৯১১, পুনর্মুদ্রণ, নিউ দিল্লী, ১৯৮৮।
বাঁকুড়া থেকে প্রাপ্ত একটি রামায়ণী পুঁথিতে পাঠক ও কথকের পার্থক্য স্পষ্ট বলা হয়েছে।
"পাঠক পৌঁথা পড়ে কথক বাথানে।" দ্রষ্টব্য অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ সম্পাদিত, বাঙ্গালা প্রাচীন পুঁথির বিবরণ, [পরিষৎ পুঁথিশালায় সংগৃহীত], তৃতীয় খণ্ড, দ্বিতীয় সংখ্যা, কলিকাতা, ১৩৩৩, ৩৭।

- ৩৯। রামগতি ন্যায়রত্ন, প্রাগ্ভুক্ত, ৮২-৮৩।
- ৪০। পদ্মপদ্মরাণ পাতাল খণ্ড, পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত বঙ্গবাসী, কলিকাতা, ১৩১৮, ৬৯ অধ্যায়—৭০ অধ্যায়। ৬২৪-৬২৫, ৬৩৪-৬৩৫, ৬৩৮-৬৩৯ Bonazzoli (1983), প্রাগ্ভুক্ত, 274-276।
- ৪১। রামকমল বিদ্যালঙ্কার, সচিব প্রকৃতিবাদ অভিধান, কলিকাতা, ১৯১১, ৯৮২।
- ৪২। ভূমিকা, পদ্মপদ্মরাণম স্বর্গখণ্ডম, পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত, নবভারত সংস্করণ, বৈশাখ, ১৩৯৬।
- ৪৩। কুস্তক, প্রাগ্ভুক্ত, কারিকা ৫, ৩০-৩৩।
- ৪৪। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, মারুতির পুঁথি, কলিকাতা, ১৩৮৮, ৪৮।

□ পর্ব / ২ □

- ১। দীনবন্ধু মিত্র, রচনা সংগ্রহ, সাক্ষরতা প্রকাশন, কলিকাতা ১৯৭৩, ৪৮৪, ৪৯০।
- ২। ‘ব্রজবিলাস’, দ্বিতীয় সংস্করণের বিজ্ঞাপন, বিদ্যাসাগর রচনা সংগ্রহ, সাক্ষরতা প্রকাশন, দ্বিতীয় খণ্ড, কলিকাতা, ১৯৭২, ৪৫৪-৪৫৫।
- ৩। রাধাগোবিন্দ বসাক সম্পাদিত ও অনূদিত, কোঁটিলীয় অর্থশাস্ত্র, ২/২৭, কলিকাতা ১৯৬৪, ১ম খণ্ড, ১৯০-১৯১। প্রাচীনকালে কথকদের প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য, সুকুমার সেনের নিবন্ধ, ‘কথকতা’, ভারতকোষ, দ্বিতীয় খণ্ড, ১৫০-১৫১।
- ৪। ‘কথকতা’, বিশ্বকোষ, তৃতীয় ভাগ, নগেন্দ্রনাথ বসু, ১৮৮৬, ১৯১ পদ্যমুদ্রণ, দিল্লী, ১৯৮৮।
- ৫। W. Ward প্রাগ্ভুক্ত, 2nd Ed. Vol. II, ২৪৪-২৯০।
- ৬। হরিপদ চক্রবর্তী, ‘কথকতার পুঁথি’, সুবর্ণলেখা, আশুদত্তোষ ভট্টাচার্য ও অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৭৪, ৫৮০-৫৯২।
- ৭। ভোলানাথ চক্রবর্তী, সেই একদিন আর এই একদিন, অর্থাৎ বঙ্গের পূর্ব ও বর্তমান অবস্থা, সুদ্রাপান নিবারণীসভায় বক্তৃতা, ৯ই শ্রাবণ, আদি ব্রাহ্ম-সমাজ যন্ত্রে মুদ্রিত, ১৮৭৫ সন, ১৩-১৪। রাজ নারায়ণ বসু দ্বারা অভিযুক্ত, বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক বক্তৃতা, সারদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক বাঙ্গালা যন্ত্রে মুদ্রিত, শোভাবাজার গ্রেণ্ট্রীট, ১৮০০ শকাব্দ (১৮৭৮) ৬২-৬৪। কথক ঠাকুরের নাম পুঁথিকার্টিতে ভ্রমবশত লেখা হয়েছে গঙ্গাধর শিরোমণি।
- ৮। দুর্গাদাস লাহিড়ী, বাঙ্গালীর গান, কলিকাতা, ১৩১২, ২৭৭-২৭৯।
- ৯। বিপিনবিহারি চক্রবর্তী প্রণীত, খাঁটুরা ইতিহাস ও কুশদীপের কাহিনী, কলিকাতা, ১৩০৮, দুর্গাচরণ রক্ষিত্রে যন্ত্রে সংগৃহীত, অননুদলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রকাশিত, ১৬৪-২০৭।

- ১০। 'বঙ্কিমচন্দ্র কাঁটালপাড়ায়', হরপ্রসাদ রচনা সংগ্রহ, দ্বিতীয় খণ্ড, সত্যজিৎ চৌধুরী ও অন্যান্য সম্পাদিত, কলিকাতা, ১৯৮১, ১৫।
- ১১। হরিশ্রর শেঠ, 'চন্দননগরের কথক, কবিওয়ালা ও যাত্রা', প্রবাসী, মাঘ, ১৩৩১, ২৪শ ভাগ, ২য় খণ্ড, ৪র্থ সংখ্যা, ৫০৬-৫০৭।
- ১২। শশিভূষণ বিদ্যালঙ্কার, জীবনীকোষ, ভারতীয়, ঐতিহাসিক, ২য় খণ্ড, কলিকাতা, ১৩৪৫, ৫১, ১৫১-১৫২। কিশোরীভজন সম্প্রদায়ের জন্য দৃষ্টব্য, অক্ষয়কুমার দত্ত, ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়, বিনয় ঘোষ সম্পাদিত, কলিকাতা, ১৩৭৬, ৩২৪-৩২৬।
- ১২ক। 'আমাদের গৃহে অন্তঃপুর শিক্ষা ও সংস্কার', প্রদীপ, ভাদ্র, ১৩০৫, উদ্ধৃত সাহিত্য সাধক চরিতমালা, ২য় খণ্ড, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৬।
- ১২খ। বিপিনচন্দ্র পাল, সত্তর বৎসর। আত্মজীবনী, কলিকাতা ১৩৬২, ৩২-৩৩। গোপালচন্দ্র রায়, জীবনস্মৃতি, ১৯৯২, ৬। রামধনের কন্যা বিদুষী ছিলেন, পুঁথিও লিখতেন। কিন্তু কথকতা করতেন তার কোনো প্রমাণ নেই।
- ১৩। Dinesh Chandra Sen, *History of Bengali Language & Literature*, Calcutta, 1911, 590
- ১৪। ঈশানচন্দ্র বসু সম্পাদিত, গোবিন্দমঙ্গল, দুর্গেশী শ্যামদাস বিরাচিত দ্বিতীয় সংস্করণ, বঙ্গবাসী, কলিকাতা, ১৩১৭। কালিদাস রায়, প্রাচীন বঙ্গসাহিত্য, ১ম খণ্ড, নিউ প্রেস, তারিখ অনুল্লিখিত, ৩১৩-৩১৪, ৩৩১। অধিকারী বংশ মোদীনীপুত্রে আজও কথকতা করেন। তমলুকের অনাথবন্ধু দাস অধিকারী নামজাদা কথক। শ্রীমতী বিদ্যুৎলতা সামন্তের নামও এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য। আমরা এই কথক-কথকীদের সঙ্গে এখনো যোগাযোগ করতে পারিনি।
- ১৫। অবনী অধিকারীর সহিত সাক্ষাৎকার, রতনপল্লী, ২৬শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৩।
- ১৬। বসন্তকুমার পাল, স্মৃতির অর্ঘ্য, শিবপুর, ১৩৪৬, ২৩৫-২৩৬।
- ১৬ক। সটীক হুতোম প্যাঁচার নকশা, সম্পাদনা অরুণ নাগ, কলিকাতা ১৩৯৮, ৮১।
- ১৭। উনিশ শতকের শেষ প্রান্তে ও বিংশ শতকের গোড়ায় বৈষ্ণবসমাজে প্রভুপাদ অতুলকৃষ্ণ গোস্বামীর দোদণ্ডপ্রতাপ ও ভূমিকার কথা আজও অনালোচিত। অতুলকৃষ্ণের জীবনের উপরে ভিত্তি করে প্রাণিকশোর রচিত অতুলকৃষ্ণের জীবনী একটি প্রাসঙ্গিক উৎস। হরিশ্র আন্দোলনের ইতিহাসও অনালোচিত রয়েছে। উদ্দেশ্য ও কার্যক্রমের জন্য দৃষ্টব্য, প্রভুপাদ শ্রীপ্রাণিকশোর গোস্বামী, 'গোড়ীয় বৈষ্ণব সম্মিলনী' (১৩৩৭ সন, পৌষ, ঢাকায় প্রদত্ত ভাষণ) আদর জানাই, সম্পাদনা, ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, কলিকাতা, প্রকাশন তারিখ অনুল্লিখিত, ১২৫-১৩৪। বিমানবিহারী মজুমদারের ভূমিকার জন্য দৃষ্টব্য, 'শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান', কলিকাতা ১৯৫৯, ৫৩৮।

- ১৮। দীনেশ চন্দ্র সেন, 'বাঙালার বিলুপ্ত সম্পদ কথকতা', প্রবর্তক, ২২ বর্ষ, ১ম খণ্ড ৪র্থ সংখ্যা, শ্রাবণ, ১৩৪৪।
- ১৯। প্রভুপাদ প্রাণকিশোরের জীবনী ও কার্যাবলীর জন্য দ্রষ্টব্য, আদর জানাই, প্রাগদুস্ত; গুরুদ্বারাজকিশোর গোস্বামী সম্পাদিত আচার্য প্রভু প্রাণকিশোর, কলিকাতা, ১৩৮৮।
- ২০। প্রাণকিশোর গোস্বামী, প্রভু অতুলকৃষ্ণ, কলিকাতা, ১৩৫৮, ৪৬-৪৭। পাঠক ও ব্যাখ্যাকার অতুলকৃষ্ণ সম্পর্কিত তথ্যাদি এই পদ্যস্তক থেকে সংগৃহীত।
- ২১। ঐ, ১০৮-১০৯
- ২২। প্রাণকিশোর গোস্বামী, কথকতার কথা, কলিকাতা, ১৩৭৫, ১৩৪।
- ২৩। অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা গদ্যে শ্রীযুক্ত প্রাণকিশোর গোস্বামী, আদর জানাই, প্রাগদুস্ত, ২৪৯-২৫২।
- ২৪। 'ষাদশ ভাষণ, সঙ্কলনিতা, ড. বাসন্তী চৌধুরী ও কথাসেবিকা, কোমলগর, ১৩৯০, ১০০।
- ২৫। বিপিনবিহারি চক্রবর্তী, প্রাগদুস্ত, ১৭০-১৭২।

□ পর্ব / ৩ □

- ১। সদ্ধীরঞ্জন দাস, যা দেখেছি, যা পেয়েছি, কলিকাতা, ১৯৬৯, ১২৩। নির্মল কুমার রায়, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ তীর্থপরিভ্রম, প্রথম খণ্ড, কলিকাতা, ১৯৮৫, ১৭০। কথক ঠাকুরদার উল্লেখ আছে, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, চতুর্থ ভাগ, কথামৃত ভবন, ১৩৭৭, ষাদশ খণ্ডের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে, ৮২।
- ২। দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী, স্মৃতিরেখা, ১৩৪০, ৩০-৩২, ৫১।
- ২ক। দীনেশচন্দ্র সেন, বহুং বঙ্গ, ১ম খণ্ড, ১৯৩৫, পদ্যমুদ্রণ, ১৯৯৩, ৩৮৬।
- ৩। রাজ্যেশ্বর মিত্র, 'নিধুবাবুর গানের উৎস', প্রসঙ্গ বাংলা গান, কলিকাতা, ১৯৮৯, ২৩।
- ৪। 'বঙ্গের শ্রেষ্ঠ পুরাণবক্তা (কথক) মদীয় ঔপিত্বে কৃষ্ণমোহন শিরোমণির কথা', (১) বামাবোধিনী পত্রিকা, জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৭, জুন ১৯১০, ৪৫। প্রবন্ধটি অসমাপ্ত। বৈবাহিক সূত্রে দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের আত্মীয় ছিলেন কৃষ্ণমোহন শিরোমণি। এংর কথাই ঠাট্টা করে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর লিখেছেন। তারা-কুমার কবিবর হযত প্রবন্ধটির লেখক। প্রবন্ধটির হাদিস দিয়েছেন মৃদুল-কান্তি বসু।
- ৫। পঞ্চানন মন্ডল সম্পাদিত, চিঠিপত্রে সমাজচিত্র, দ্বিতীয় খণ্ড, কলিকাতা, ১৯৫৩, নং ১৪৩, ৯৯।
- ৬। বিপিনবিহারি চক্রবর্তী, প্রাগদুস্ত, ১৬৬
- ৭। তারাক্ষর বন্দ্যোপাধ্যায়, আমার কালের কথা, কলিকাতা, ১৩৫৮, ১০।

- ৮। দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের ভূমিকাসহ, নিত্যগোপাল গোস্বামী, সঙ্কলিত, কৃষ্ণকমল গীতিকাব্য, কলিকাতা, ১৩১৭। তথ্যগ্ধূলি পুত্র রচিত কৃষ্ণকমলের জীবনী থেকে আহত হয়েছে।
- ৯। ডা. গৌরমোহন দাস দে, পিছনে তাকাই, কলিকাতা, ১৯৯১, ৪২।
- ১০। গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য, অপূর্ণ পাঁচালী, ১৩৮১, ৪৭।
- ১১। বিভিন্ন সময়ের কার্যবিবরণী ও সাম্বৎসরিক প্রতিবেদন, হরিভক্তি প্রদায়িনী সভা, বেহালা। এই সূত্র ব্যবহারের জন্য শ্রী সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায় ও হরিসভায় কর্তৃপক্ষের কাছে আমি কৃতজ্ঞ।
- ১২। হরেকৃষ্ণ মুনোপাধ্যায় 'শ্রীধর কথক', উজ্জীবন, আশ্বিন, ১৩৭৯, ১৯শ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, ৩০২। এই প্রবন্ধটির হৃদিস দেবার জন্য দেবাশিস বসুর কাছে আমি ধন্য।
- ১৩। যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি, 'গল্প', কি লিখি? -তে সঙ্কলিত, কলিকাতা, ১৩৬৩, ১২৯।
- ১৪। চিঠিপত্রে সমাজচিত্র, ২য় খণ্ড, প্রাগদুস্ত, ১২৯ নং, ৮৯।
- ১৪ক। James Long, *Returns Relating to Publication in the Bengali Language in 1859, Selections from the Records of Bengal. Govt., No XXXII, Calcutta, para 17.*
- ১৫। 'অপ্রকাশিত আত্মচরিত,' দিনযাত্রা, আনন্দবাজার, 6 March, 1983।
- ১৬। পাঁচুগোপাল ভট্টাচার্য, শ্রীমদ্ হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ স্মরণে, কলিকাতা, ১৩৮৩, ৩৬-৩৭।
- ১৭। শ্রীপ্যারীমোহন মুনোপাধ্যায়, আমার দেখা কলিকাতা, কলিকাতা, ১৩৮৭, ১৩৫-১৩৬।
- ১৮। দীনেন্দ্রকুমার রায়, সেকালের স্মৃতি, আনন্দ সংস্করণ, ১৩৯৫, ৪০।
- ১৯। প্রাণকিশোর গোস্বামী, কথকতার কথা, প্রাগদুস্ত, ৩৩-৩৪।
- ২০। রাজকৃষ্ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎকার, সোনা মুনুখী, ১৩ই জুন, ১৯৯৩।
- ২১। Y. B. Damle, 'Harikatha—A study in Communication', *Bulletin of Deccan College Research Institute*, S. K. De Felicitation Volume. Ed. by N. G. Kalelkar, 1960, 63-107. Philip Lutgendorf, 'Rama's Story in Shiva's City: Public arenas and Private Patronage', in Sandra Freitag ed. *Benaras: Power, Community and Culture*. O. U. P., 1991, বিশেষ ভাবে দ্রষ্টব্য 34-60, 39-41, 56-61.
- ২২। Lutgendorf, ঐ, 40-41.
- ২৩। সেকালের স্মৃতি, প্রাগদুস্ত, ৪৩।

- ২৪। 'আমার জীবন' নবীনচন্দ্র রচনাবলী, শান্তিকুমার দাস সম্পাদিত প্রথম খণ্ড, কলিকাতা, ১৩৮১, ১৬৪।
- ২৫। শ্রীরামগতি ন্যায়রত্ন, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব, হুগলী বৃন্দোদয় যন্ত্রে কাশীনাথ ভট্টাচার্য স্বারা মুদ্রিত, ১৮৭২-১৮৭৩, ১৩৫।
- ২৬। সত্তর বৎসর, প্রাগদুস্ত, ১১৬।
- ২৭। কৃষ্ণকুমার মিত্র, আত্মচরিত, কলিকাতা, ১৩৮০, ৪১-৪২।
- ২৮। ন্যায় দর্শনে 'কারণতত্ত্ব'তে কার্যকারণের ভিন্ন ভিন্ন সম্পর্কানুযায়ী কারণের প্রকার ভেদ আছে, তাদের পারিভাষিক শব্দ ও প্রয়োগ নির্দিষ্ট। "তর্ক সংগ্রহ" নামক প্রচলিত পাঠ্য বইতে অত্র ভট্ট অসাধারণ কারণকে 'করণ' বলেছেন। অসাধারণ=ফলাযোগ্যব্যবচ্ছিন্ন। অর্থাৎ ফলের সঙ্গে যার অযোগ্য ব্যবচ্ছেদ=যেটা থাকলে ফল অবশ্য উৎপন্ন হয় সেটাই 'করণ'। নব্য ন্যায় দর্শনে ব্যাপারবদ্ কারণই করণ। 'তজ্জন্যে সতি তজ্জন্যজনকঃ' বা তজ্জন্য, (তা থেকে উৎপন্ন) অথচ তজ্জনিত অর্থাৎ কার্যের জনক। করণ যার মাধ্যমে কার্যের জনক হয় তাকে ব্যাপার বলে। যেমন—ইন্দ্রিয় সন্নিবর্ষ ইন্দ্রিয়জন্য এবং ইন্দ্রিয়জন্য প্রত্যক্ষের জনক হওয়ায় ইন্দ্রিয়রূপ করণের ব্যাপার। ভারতীয় দর্শনকোষ, প্রথম খণ্ড, শ্রীমোহন ভট্টাচার্য ও দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য সম্পাদিত, কলিকাতা, ১৯৭৮, ১৫০।
- কারণতত্ত্বের প্রাথমিক বক্তিতে জয়ন্তভট্টের দান অভিনব। উদাহরণ ও যুক্তির সাহায্যে কোনো কারণকে তিনি নাকচ করেননি, সব কারণের সমষ্টি অর্থাৎ সামগ্রীকে 'করণ' বলেছেন। কীভাবে 'কারণ সামগ্রী' সংসাদিত হয় ও 'করণ'ের বিধান হয়, এই ধারণা পাশ্চাত্য দর্শনসিদ্ধ কার্যকারণ সম্বন্ধের আলোচনাকে অন্যদিকে মোড় দিতে পারে। দ্রষ্টব্য, জয়ন্ত ভট্ট কৃত ন্যায়মঞ্জরী প্রথম আদেশঃ, প্রথম খণ্ড, পঞ্চানন তর্কবাগীশ অনূদিত ও সম্পাদিত, কলিকাতা, ১৯৩৯, ১০৪-১০৬, ১২২-১২৩।

□ পর্ব / ৪ □

- ১। দীনেন্দ্রকুমার রায়, সেকালের স্মৃতি, প্রাগদুস্ত, ৪২।
- ২। কথকতার কথা, প্রাগদুস্ত, ৯-১০, ১২।
- ৩। 'বিশ্বকমন্দ কাঁটাল পাড়ায়' হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচনা সংগ্রহ, দ্বিতীয় খণ্ড, প্রাগদুস্ত, ১৪।
- ৪। দীনেন্দ্রকুমার রায়, প্রাগদুস্ত।
- ৫। কথক ও শ্রোতার শাস্ত্রীয় লক্ষণ ও গুণের বিবর্তিত জন্য দ্রষ্টব্য শ্রীশ্রী জিতেন্দ্রনাথ গোস্বামী সম্পাদিত, রাসলীলা, নবম্বীপ, ১৩৬২ সন, পদুস্তিকায় হরিদাস দাসের ভূমিকা।

- ৬। কথকতার কথা, প্রাগদুস্ত, ১৮।
- ৭। জসীমউদ্দীন, ঠাকুরবাড়ীর আঙিনায়, কলিকাতা, ১৩৭৬, ৪৮-৪৯।
- ৮। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও রানী চন্দ, জোড়াসাঁকোর ধারে, কলিকাতা, ১৩৫১, ৪৩, ৪৮।
- ৮ক। পাতঞ্জলং মহাভাষ্যম, ড. বালশাস্ত্রী সম্পাদিত, বারানসী, ১৯৮৭। কৈয়টের মহাভাষ্য প্রদীপ ও নাগেশ ভট্টর প্রদীপোদ্ভোত নামক টীকা সহিত। ৩/১/২৬, ৯৪-৯৬। পালা 'বুদ্ধি বিষয়সত্ত্ব' হয় বলে ঘটনা বিবৃতিতে তিনটি কালের প্রয়োগ সংগত, যেমন "গচ্ছ হন্যতে কংসঃ", "গচ্ছ ধানিষ্যতে কংসঃ", "কিং গতেন, হতঃ কংসঃ।" বুদ্ধির অর্থ কেবল ধী বা মেধা নয়। জ্ঞান, উপলব্ধি, চৈতন্য ইত্যাদি বুদ্ধির পর্যায়শব্দ।
- ৯। চিঠিপত্রে সমাজচিত্র, প্রথম খণ্ড অপরাধ, প্রাগদুস্ত, ৩৯১-৪০৪। এই পদ্যস্পিকা সংকলন থেকে উদ্ধৃতিগদ্যলি নির্বাচিত করা হয়েছে। লিপিকর প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য, অমূল্যচরণ বিদ্যাবূষণ সম্পাদিত, বাঙ্গালা প্রাচীন পদ্যধির বিবরণ, পরিষৎ পদ্যশালায় সংগৃহীত, তৃতীয় খণ্ড, দ্বিতীয় সংখ্যা, কলিকাতা, ১৩৩৩, ৯।
- ১০। কথকতার কথা, প্রাগদুস্ত, ২০।
- ১১। চিঠিপত্রে সমাজচিত্র, প্রাগদুস্ত, ২য় খণ্ড, ৯৮।
- ১২। ঐ, ৯৩।
- ১৩। ঐ, ১০০-১০১।
- ১৪। H. P. Sastri, *A Descriptive Catalogue of Sanskrit Manuscripts in the Collections of the Asiatic Society of Bengal*, Vol. V, Purana Manuscripts, Calcutta, 1928, XXVII, CXXXI, 36-39, 363-364.
- ১৫। গণেশ বিদ্যাবিনোদ, আদিকাণ্ড কথা, এশিয়াটিক ৩৩১০, ৪০ক, ৮-১১ক।
- ১৬। রামায়ণ কথা, ঐ, ৬৬০১, ২৩ক-২৪ক।
- ১৭। রামায়ণ কথা সংগ্রহঃ, ঐ, ৩৭৮৭। ১৭৩৮ শকাব্দে (১৮১৬ খৃষ্টাব্দে) পদ্যধিটি রচিত হয়।
- ১৮। কথকতার কথা, প্রাগদুস্ত, ২০-২১।
- ১৯। কথকতার পালা, শ্রীমদ্ভাগবত (নানা আখ্যানাংশ), রামপদ ভট্টাচার্যের পদ্যধি, ব্যাসদেবের জন্ম ১২৯০ (১৮৮৩) সালে লিখিত, পাঠবাড়ী ২৭৮৩/১৩, ২১খ-২৩খ।
- ২০। দ্বিজরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথকতা, গোড়ীয় বৈষ্ণব সম্মিলনী, চালতাবাগান, ১৯/১২/৯২।
- ২১। কথকতার পালা (শ্রীকৃষ্ণের জন্ম), তারিখবিহীন, পাঠবাড়ী, ২৭৮৪/১৪, ২৬ক-২৭ক।

- ২২। কথকতার পালা (রামরাজা), খণ্ডিত, তারিখবিহীন, পাঠবাড়ী, ২৭৮৯/১৭, ১৯ক-২০ক
- ২৩। ঐ, ২৭ক-২৭খ।
- ২৪। কথকতার পালা (শ্রীকৃষ্ণের জন্ম), প্রাগদুস্ত, ৩৬ক-৩৭ক। মূল লেখায় ভুল-বশত টীকা নং ২৫ ছাপা হয়েছে।
- ২৫। কথকতার পদার্থ (ভাগবত), খণ্ডিত, তারিখবিহীন, ক. বি. ৫০০৭, ২ক।
- ২৬। কথকতার পদার্থ (সভাপর্ব), খণ্ডিত, রামগোপাল শর্মা লিখিত, বিশ্ব, ৬২০১, ১১০ ক, পদার্থতে সংস্কৃত শ্লোক যেমন আছে, তেমন উদ্ধৃত হল।
- ২৬ক। 'বাংগালা ভাষা', (রামগতি ন্যায়রত্ন লিখিত বাংগালা ভাষা ও বাংগালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব নামক পুস্তকের সমালোচনা), বঙ্গদর্শন, কার্তিক ১২৭৯, ৪৫৩-৪৫৪। কথকতা, পালাগান ইত্যাদিতে বঙ্গের সংস্কার ও শিক্ষা পরিবারগত, পিতৃদত্ত। বাল্যকালে যিনি কথকতার গান বাঁধতেন, প্রাপ্ত বয়সে তিনি দেশজ গান, পালার বিশাল সংগ্রহ গড়ে তুলেছেন। নানা সাক্ষ্যের মধ্যে একটি স্মৃতিচারণের উল্লেখ করা যেতে পারে। অক্ষয়চন্দ্র সরকারের, 'বঙ্গমহাশয়', অক্ষয় সাহিত্য সম্ভার, কালিদাস নাগ সম্পাদিত, কলিকাতা, ১৮৮৭ শকাব্দ (১৯৬৫, ১৪৮-১৪৯)।
- ২৭। কথকতার পালা (মহাভারত—নানা আখ্যান), ১২৯০-১৩০৬ (১৮৮৩-১৮৯৯)-এর মধ্যে লিখিত। মথুরাবাটীর রামপদ ভট্টাচার্য ছাত্র রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সাহায্যে পালাগানুলো লিখেছেন। শিবের বিবাহবর্ণন, ২৬ক-২৬খ। খণ্ডিত, ২৭৮৭ / ১৫ক, পাঠবাড়ি।
- ২৮। কথকতার পালা (রাস) তারিখবিহীন, ২৭৮৫/১৫, পাঠবাড়ি, ৩২খ।
- ২৯। ঐ, ২০ক-২০খ
- ৩০। ঐ, ৯১খ।
- ৩১। ঐ, ৯২ক, ৯৫খ।
- ৩২। ঐ, ৯৩ক।
- ৩৩। কথকতা : বিভিন্ন পালার অংশ বিশেষ ; কালিয়দমন পালা, ৭ক, ২৭৮৬/ ১৫ক, পাঠবাড়ি, আদিনিবাস কৃষ্ণনগর, হাল নিবাস ফরাসডাঙ্গার হাটখোলা, শ্রীরামপদ ভট্টাচার্য লিখিত। ১২৯২ (১৮৮৫) সাল নাগাদ পালার লেখার কাল বলে অনুমিত হয়।
- ৩৪। The Akhyayika and The Katha in Classical Sanskrit, in S. K. De, *Some Problems of Sanskrit Poetics*, Calcutta, 1981, 65-79.
- ৩৫। তুলনীয়, S. N. Dasgupta and S. K. De, *A History of Sanskrit Literature*, Classical Period, Vol. 1, Calcutta, 1977, 636-639.
- ৩৫ক। 'ভাবিকা' বা 'ভাবিকত্ব' সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রের মূল্যবান ধারণা। ভামহ পরবর্তী আলঙ্কারিকরা নানাভাবে এই ধারণাকে আলোচনা করেন। প্রাসঙ্গিক

- শ্লোক, কাব্যালঙ্কার, ৩নং পরিচ্ছেদ, ৫২-৫৩। ৩/৫২-৫৩, উদ্ধৃত অংশ নিয়ে বিস্তৃত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য V. Raghavan, *Studies on Some Concepts of the Alamkara Sastra*, Madras, 1973, 132-146. এই প্রসঙ্গে রাঘবনের ব্যাখ্যার উপর আমি নির্ভরশীল।
- ৩৬। বিশ্বনাথ কবিরাজ, সাহিত্য-দর্পণঃ, ৬/৩৩৩, বিমলাকান্ত মদুখোপাধ্যায় সম্পাদিত, কলিকাতা, ১৩৮৬, ৪৭৯। 'বিনির্মিতম' হবে।
- ৩৭। অনুরূপা দেবী, মন্ত্রশক্তি, কলিকাতা, ১৩২২, ৬৪। রমাকান্ত চক্রবর্তী উপন্যাসটির কথা আমাকে মনে করিয়ে দিয়েছেন।
- ৩৮। ঐ, ৭৫।
- ৩৯। ভরত নাট্যশাস্ত্র, সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও ছন্দা চক্রবর্তী সম্পাদিত ও অনূদিত, ৩/১৯।৪৩-৬২, কলিকাতা, ১৯৮২, ৮-১৫। অভিনবগদ্যপ্তের প্রাসঙ্গিক টীকা, নাট্যশাস্ত্রম্, Ed. M. R. Kavi, Baroda, 1934, Vol. II, সপ্তদশোদ্ধধ্যায়ঃ, ৩৯৯।
- ৪০। তুলনীয়, রাজ্যেশ্বর মিত্র, 'তান্ডব' ভরত নাট্যশাস্ত্র, প্রাগদুস্ত, প্রথম খণ্ড ৩১২-৩১৩। নাট্যশাস্ত্রে স্বর ও সুর নিয়ে বিশদ ব্যাখ্যামূলক আলোচনা, রাজ্যেশ্বর মিত্র, 'নাট্যশাস্ত্রে সংগীতচিন্তা', প্রাগদুস্ত, তৃতীয় খণ্ড, ২৯৮-৩৫২।
- ৪১। আচার্যপ্রদত্ত উদাহরণ এইরূপঃ "কিং! গচ্ছ! মা বিশ! সুদুর্জন। বারিতোহসি কার্যং ত্বয়া ন মম। সর্বজনোপভুক্ত।" ছন্দ অনুসারে বিরাম নয়, অর্থানুসারে থামতে হচ্ছে। ফলে পাঠকালে এক, দুই, তিন বা চার অক্ষরের পরও বিরামের প্রয়োজন হতে পারে। ভরত নাট্যশাস্ত্র, তৃতীয় খণ্ড, ১৪-১৫। ৬১ নং শ্লোক।
- ৪২। তারাক্ষর বন্দ্যোপাধ্যায়, আমার কালের কথা, প্রাগদুস্ত, ১৯৭।
- ৪২ক। রাখালচন্দ্র গোস্বামীর পদ্যবধু শান্তিরাণী গোস্বামীর সাক্ষ্য, শ্রী নিত্যগোপাল গোস্বামীর সৌজন্যে প্রাপ্ত, ২৯।৯।৯৩।
- ৪৩। কথকতার পালা (শ্রীমন্তাগবত), পাঠবাড়ী, ২৭৮৩/১৩, রামপদ ভট্টাচার্যের পুঁথি (১৮৮৩ সালে লিখিত)।
- ৪৪। কথকতার পুঁথি (বনপর্ব), খণ্ডিত, তারিখ অজ্ঞাত, বিশ্ব, ১৫২৫, ৮৬ক-৮৬খ।
- ৪৫। 'জীবনস্মৃতি' রবীন্দ্র রচনাবলী, বিশ্বভারতী সংস্করণ, সপ্তদশ খণ্ড, প্রাগদুস্ত, ৩০৮-৩০৯।
- ৪৬। যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি, 'গল্প', কি লিখি? প্রাগদুস্ত, ১২৮। শাস্ত্রী মহাশয় কথকের চূর্ণীগদ্যলোকে বাংলা ভাষার সম্পদ বলে মনে করতেন। কৈশোরে কথকের আসরে তাল ও লয়ের সঙ্গে চূর্ণী পাঠ হাজার হাজার শ্রোতার মতো তাঁকেও মগ্ন করছিল। তাই কাণ্ডনমালা উপন্যাসের সহজ সরল গদ্যের মধ্যে তিনি হঠাৎ 'চূর্ণী' বসিয়ে দেন। এইজন্য অক্ষয় সরকারও তাঁকে সমালোচনা

- করেন। 'অক্ষয়চন্দ্র সরকার', হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচনাসংগ্রহ, দ্বিতীয় খণ্ড, প্রাগদুস্ত, ১৩১-১৩২।
- ৪৭। কথকতার পালা (শ্রীমন্তাগবত) প্রাগদুস্ত, পাঠবাড়ি, ২৭৮৩/১৩। আলাদা পাতায় গানটি লিখিত।
- ৪৮। কথকতার পালা (প্রভাসতীর্থ যাত্রা), ২৭৮৬/১৬, পাঠবাড়ি, ৮ক,
- ৪৯। রামের অযোধ্যা প্রত্যাবর্তন, সীতারামকুটির, টালিগঞ্জ ১৫ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৩।
- ৫০। ঐ, ১৬ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৩। এইরকম গান আরো আছে। যেমন, 'রামায়ণ দেহতত্ত্ব', রামায়ণচার্য ফেলারাম বন্দ্যোপাধ্যায়, বিবর্তিত, শ্রীরামনামাবলী, বাঁকুড়া, ১৩৮৩, ২২ নং গান।
- ৫১। এই পত্রিকায় 'কথকতার গানে' সম্পূর্ণ গানটি আছে। রচয়িতা ফেলারাম বন্দ্যোপাধ্যায়ের গীতগুলি উপযুক্ত পদ্যস্তিকা থেকে গৃহীত হয়েছে। যথাযথ-স্থানে সূত্র নির্দেশে পদ্যস্তিকাটির অনুচ্ছেদের জন্য দর্শিত।
- ৫২। সাধক নবরত্ন ব্রহ্মচারীর ভাগবতপাঠ, (কথা ও সংগীতে) ৩৭-এর পল্লী হরিনাম সংকীর্তন সম্প্রদায়ের উদ্যোগে শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ জীউ-এর মন্দিরপ্রাঙ্গণ, বৈঠকখানা, কলিকাতা, ২৭ ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৩।
- ৫৩। কথকতার কথা, প্রাগদুস্ত, ৮৫-৮৬।
- ৫৪। কথকতার পাতড়া, ৫০৬৫ ও ৫০৬৭, বিশ্ব।
- ৫৫। পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সেকালের দুর্গোৎসবের প্রারম্ভে পল্লীচিহ্ন, আশ্বিন, ১৩২২, মর্মবাণী, ১ম বর্ষ, ১ম খণ্ড, ২৫৫।
- ৫৬। মন্ত্রশক্তি, প্রাগদুস্ত ৭৬-৭৭।
- ৫৭। চিঠিপত্রে সমাজচিহ্ন, ২য় খণ্ড প্রাগদুস্ত, ১২৩।
- ৫৮। সেকালের স্মৃতি, প্রাগদুস্ত, ৪২।
- ৫৯। Dinesh Chandra Sen, *History of Bengali Language and Literature*, প্রাগদুস্ত, 589-590।
- ৫৯ক। স্বিজরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রদত্ত সাক্ষাৎকার, ২০শে নভেম্বর, ১৯৯২। চালতাবাগান, কলিকাতা।
- ৬০। কথকতার কথা, প্রাগদুস্ত, ৪৭।
- ৬১। ঐ, ৭৩-৭৪।
- ৬২। প্রতিমাদেবী, স্মৃতিচিহ্ন, কলিকাতা, ১৩৫৯, ৮৫-৮৬।
- ৬৩। কথকতার কথা, প্রাগদুস্ত, ৩২-৩৩।
- ৬৪। হরিপদ চক্রবর্তী, 'কথকতার পদার্থ', সংস্কৃতি বস্তু, সূত্রলেখা, প্রাগদুস্ত, ৫৯২।
- ৬৫। আমার আলোচনা শ্রুতিনির্ভর। আসরের তারিখ ও স্থান নির্দেশ করা হল। কিছু আসরের পাঠ ক্যাসেটে ধরা আছে। প্রধানত সেইগুলি থেকে সরাসরি উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে। দুই-একটির ক্ষেত্রে মাত্র অনুলিখন নিয়েছি।

ক্যাসেটগুলি আমার সংগ্রহে আছে। সব আসরগুলিই অন্য উদ্দেশ্যে আয়োজিত, আমি সাধারণ শ্রোতা হিসাবে আসরে যোগ দিয়েছি। একমাত্র অবনীবাব্দুর আসরই আমার শোনার জন্য বসানো হয়েছিল।

৬৬। তরঙ্গীসেনবধ পালা, শ্বিজরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়, গোড়ীয় বৈষ্ণব সন্মিলনী, চালতা বাগান, কলিকাতা, ৫।১২।১২। অন্যান্য পালাতেও মঙ্গলাচরণের ছক এক থাকে। ক্যাসেটে সংরক্ষিত।

৬৭। সৈতুবন্দ পালা, ঐ, ৩।১২।১২। অনর্দলখন।

৬৮। শবরীর প্রতীক্ষা পালা, ২৭।১১।১২, ঐ, অনর্দলখন।

৬৯। তরঙ্গীসেন বধ পালা, প্রাগুক্ত।

৭০। তরঙ্গীসেনের যুদ্ধ ও পতন, কুস্তিবাস বিরচিত রামায়ণ, সাক্ষরতা প্রকাশন, ২৯৫-২৯৬।

৭১। বিভূতি ভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, পথের পাঁচালী, কলিকাতা, ১৩৭২, ২৯৩।

৭২। অবনী অধিকারীর কথকতা, অহল্যার শাপমোচন, ২৬শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৩, অরুণ নাগ ও মধুশ্রী নাগের গৃহ, শান্তিনিকেতন। ক্যাসেটে রক্ষিত।

৭৩। অনেক চেষ্টা করেও এখনো জগৎরামী রামায়ণের কোনো সংস্করণ পড়তে সক্ষম হইনি। তথ্যাদির জন্য দ্রষ্টব্য, D. C. Sen, *The Bengali Ramayanas*, Calcutta, 1920, সুকুমার সেন, বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড, আনন্দ সংস্করণ, ১৩৯৮, ৩৬৩-৩৬৪।

৭৪। ক্ষান্তিলতা দেবী, কুস্তীপুত্র (ভাগবতী), বছর দশেক আগে শ্যামাপূজার দিনে আয়োজিত পাঠ, ক্যাসেটে রক্ষিত, শ্রীযুক্ত করুণকান্তর সৌজন্যে প্রাপ্ত।

৭৫। বাসন্তী চৌধুরী, রাসলীলা, সপ্তম পর্ব, নিঃসম্বলানন্দ কলেজ, ভদ্রেশ্বর, ৫ই জুলাই, ১৯৯৩। ক্যাসেটে রক্ষিত।

□ পর্ব / ৫ □

১। ‘মানি কাকা’, জীবনকথা, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় লিখিত, কলিকাতা, ১৯৭৯, ১৪২-১৫০।

২। আলোচনায় ব্যবহৃত হয়েছে, আনন্দবর্ধন নাচার্য প্রণীত ধন্যলোক ও আচার্য অভিনবগুপ্ত বিরচিত লোচন, মূল ও সটীক অনুবাদ, অনুবাদক, শ্রীসুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত ও কালীপদ ভট্টাচার্য, কলিকাতা, ১৯৮৬। আলোচ্য শ্লোকটি অবশ্য ভরত নাট্যশাস্ত্র থেকে উদ্ধৃত, ১১। প্রবন্ধে ‘আনন্দবর্ধন’ বানান ব্যবহৃত হয়েছে।

৩। S. K De, *Sanskrit Poetics as a Study of Aesthetics*, O. U. P. 1963, 14-17. Edwin Gerow’s টীকা, ৬৬, ৪৫।

৪। রামায়ণ কথা সংগ্রহ, নং ৩৭৮৭, এশিয়া ১ক-১ খ।

- ৫। চন্দননগরের ফটকগোড়ায় কথক কুমুদবন্দ্যু প্রথম সাক্ষাৎকার ১৫ই জুলাই, ১৯৯৩। উল্লেখ্য এই যে এই জাতীয় ধারণা শ্রুতির মাধ্যমে শিষ্যপীরা তাঁদের চেতনায় গেঁথে রাখেন। ১৯২৫ সালে কলকাতায় কালকা বিদ্যাজি ঘরাণার চৌধুরান বাইজী নৃত্যের নানা অঙ্গভঙ্গিকে নাট্যশাস্ত্র মতে ব্যাখ্যা করে অমিয়নাথ সান্যালকে হকচকিয়ে দিয়েছেন। অমিয়বাবু তখনো নাট্যশাস্ত্র। গ্রন্থটি চোখেই দেখেননি আর বাইজি জানেনই না, ভরত লোকটি কে। দ্র. 'নৃত্যের বস্তুতত্ত্ব', সমকালীন, আষাঢ়, ১৩৬৮, পদ্মনন্দ্রীদ্রিত, ভরত নাট্যশাস্ত্র সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, ২য় খণ্ড, কলিকাতা, ১৯৮২, ২৮০-২৮১।
- ৬। ধন্যালোক, প্রাগুক্ত, ১৫, ৪৪, ৪৬। প্রথমোদ্যোতঃ।
- ৭। ঐ, ২৫-২৬, ৪০-৪১। পঞ্চম কারিকার বৃত্তি ও ভাষ্য প্রথমোদ্যোতঃ।
- ৮। ভট্টনায়কের 'ভুক্তিবাদ' ও অভিনবগদ্যপ্তের অভিব্যক্তিবাদ সম্পর্কিত তুলনামূলক আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য, 'বিশ্ববিদ্যাপদ ভট্টাচার্য', সাহিত্য মীমাংসা, বিশ্বভারতী, ১৯৭৫, ৭৬-১০৬।
- ৯। বিশ্বনাথ কবিরাজ, সাহিত্যদর্পণঃ, সম্পাদনা ও বঙ্গানুবাদ, বিমলাকান্ত মুখোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, ৩৯, ৯৫-৯৬।
- ১০। দীনেশচন্দ্র সেন, ঘরের কথা ও যুগসাহিত্য, কলিকাতা, ১৯৬৯, ১৮১-১৮২।
- ১০ক। মন্ত্রশক্তি, প্রাগুক্ত, ৭৫-৭৬।
- ১১। বেহালা হরিভক্তি প্রদায়িনী সভা, (স্থাপিত ১২৫৯ সাল/সন ১৮৫২)। দ্রষ্টব্য ৬৫ তম সাম্বৎসরিক পত্রিকা (১৩২৪) ও ৬৬তম সাম্বৎসরিক পত্রিকা, ১৩২৫, ১৭ ও ১৫।
- ১২। অনুচ্ছেদটি ৪।১১।৯২ সালে চালতাবাগানে স্বিজরাজবাবুর কথকতার আসরে সমাগত শ্রোতাদের সঙ্গে কথোপকথন-ভিত্তিক।
- ১৩। বিশ্বনাথ কবিরাজ, পূর্বোক্ত, ৩৮, ৯৪-৯৫। নাট্যশাস্ত্রের পরিভাষায় শ্রোতার সমাবেশরূপে সমাজ কথাটি প্রাচীনকাল থেকে ব্যবহৃত, অশোকের শিলালিপিতে শব্দের এই জাতীয় প্রয়োগ দেখা যায়। দ্রষ্টব্য, দেবদত্ত ভান্ডারকর ও ননীগোপাল মজুমদারের আলোচনা, Indian Antiquary, 1913, 255--258 ও Indian Antiquary, 1918, 221-223.
- ১৩ক। কথকতার কথা, প্রাগুক্ত, ৭৩।
- ১৪। Victor Turner, *Dramas, Fields and Metaphors*, Cornell, 1974. Partha Chatterjee, *More on Modes of Powers and the Peasantry, Subaltern Studies*, Vol, II, edited by Ranajit Guha, Delhi, 1983, 338-339.
- ১৫। ভরত নাট্যশাস্ত্র, প্রথম খণ্ড, প্রাগুক্ত, সপ্তম অধ্যায়, ৭নং শ্লোক, ১৫৪। সাহিত্য দর্পণঃ, তৃতীয় পরিচ্ছেদঃ, প্রাগুক্ত, ৮৬। একজন আধুনিক গবেষকের মতে

‘চমৎকার’ ধারণাটি উৎপন্ন হয়েছে ভালো খাবার পর জিভ দিয়ে টাক্‌রায় যে তৃপ্তিবিধায়ক আওয়াজ করা হয়, তার থেকে। ‘রামায়ণ চম্পদ’ টীকাতেও আছে। “চমদিত্যনুদকরণ শব্দঃ।” পরে শব্দের অর্থ বিস্তার হয়েছে, রসাস্বাদনে চিত্ত-বৃত্তির বিস্তার অর্থে প্রযুক্ত হয়েছে। Raghavan, প্রাগুক্ত, ২৯৪।

১৬। রাজানক কুন্তকাচার্যের বক্রোক্তজীবিত, রবিশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, ১/৫ প্রাগুক্ত, ৩০। Sushil Kumar De, *Vakroktijivita of Kuntaka*, প্রথমোন্মেষঃ, শ্লোক নং ৫, প্রাগুক্ত, ৫।

□ পর্ব / ৬ □

১। সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ‘যাত্রা’, বঙ্গদর্শন, পৌষ, ১২৭৯ পদ্বনমর্দ্দিত, সঞ্জীব রচনাবলী, সম্পাদনা অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, কলিকাতা, ১৯৭৩। ৪০৫-৪২৩। যাত্রাপালা নিয়ে মনোগ্রাহী আলোচনা, নাট্যকার মম্বথ রায়, লোকনাট্য যাত্রাগান, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৭৬।

২। হংসনারায়ণ ভট্টাচার্য, যাত্রাগানে মতিলাল রায় ও সম্প্রদায়, কলিকাতা, ১৩৭৪। সুকুমার সেনের অধিবচন; লেখকের মন্তব্য, ২০১।

৩। William Ward, প্রাগুক্ত, Vol. 1. Sec. VIII, 189-191. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত, রামমোহন গ্রন্থাবলী, ষষ্ঠ খণ্ড, সাহিত্য পরিষৎ সংস্করণ, ১৩৬২, ১২।

৪। বিভিন্ন উদ্ধৃতাংশের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে, দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের ভূমিকা সহ কবিপদ্রু নিত্যগোপাল গোস্বামী সম্পর্কিত কৃষ্ণকমল গ্রন্থাবলী, কলিকাতা, ১৩১৭। ২, ১৪, ৩৩০। আলোচনা, Nisikanta Chattopadhyay, *The yatras or the popular Dramas of Bengal*. London, 1882, Calcutta, reprint, 1976. পদ্বনমর্দ্দিত গ্রন্থে রমাকান্ত চক্রবর্তীর তথ্যসমৃদ্ধ মন্থবন্ধ উল্লেখযোগ্য।

৫। কামিনীকুমার গোস্বামী সম্পাদিত, কৃষ্ণকমল গীতিকাব্য, কলিকাতা, ১৩২৮, ১৮০-১৮১।

৬। গোবিন্দচন্দ্র দাস বৈরাগ্য প্রণীত, মানভঞ্জন যাত্রা, পালা সম্বলিত পদাবলী, তদীয় ভাগিনেয় প্রসন্নকুমার দাস বৈরাগ্যের আদেশানুসারে গরানহাটা ৪০৮ পুস্তকালয় থেকে শ্রী বাণেশ্বর ঘোষ কর্তৃক প্রকাশিত, কলিকাতা, ১২৯৩, প্রথম সংস্করণ। পাঁচকড়ি দে ভিন্ন ভিন্ন খণ্ডে এই পালাগুলো পরে ছাপান। গোবিন্দ অধিকারীর জীবনের জন্য দ্রষ্টব্য, গোপেশচন্দ্র দত্ত, কৃষ্ণযাত্রা ও নীলকণ্ঠ মন্থো-পাধ্যায়, কলিকাতা, ১৯৭৬, ৪২-৫৩। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে অক্ষয়কুমার সরকার জানিয়েছেন যে পালায় ‘পদাবলী আবৃত্তি করিতেন, ব্যাখ্যা করিতেন, গান করিতেন। মধ্যে মধ্যে ঘটকালি ও কথোপকথন থাকিত মাত্র।’ সংলাপ

- তাত্ত্বিক, গানই রসের পরিবাহী, সরকারের রচনায় এই ইঙ্গিত স্পষ্ট।
 দ্র. 'জয়দেব', অক্ষয় সাহিত্য সন্টার, কালিদাস নাগ সম্পাদিত প্রথম খণ্ড, প্রাগদুস্ত, ২৫৫।
- ৭। হরিপদ চক্রবর্তী, দাশরথি ও তাঁহার পাঁচালি, কলিকাতা, ১৩৬৭, ৭৩-৭৪।
 উক্ত লেখক সম্পাদিত ও সংকলিত, দাশরথি রায়ের পাঁচালী, কলিকাতা
 বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬২।
- ৮। পাঁচকাড়ি দে সংকলিত, মধুসূদন কিশোরের উপকীর্তন কলিকাতা, ১৩৪৩।
 পদ্যসংগ্রহের শেষে এই জাতীয় বিজ্ঞাপন আছে।
- ৯। দীনেশচন্দ্রকুমার রায় 'শীতলা ষষ্ঠী', পল্লীবেচিত্র ১৩১২, আনন্দ সংস্করণ ১৩৮৯,
 ৯১।
- ১০। দ্র. ভূমিকা, ভরতগমন গীতাভিনয়, মতিলাল রায় কর্তৃক প্রণীত, ১২৯৫।
- ১১। হংসনারায়ণ ভট্টাচার্য, প্রাগদুস্ত, ২০৭-২০৮।
- ১২। 'দ্রোপদীর বস্ত্রহরণ', গীতাভিনয়, শ্রীমতিলাল রায় কর্তৃক প্রণীত, কলিকাতা, সন
 ১২৮৮। ৯৭, ১০৯-১১০।
- ১৩। কথকতার পদ্ধতি, সভাপর্বা, ৬২৩১, বিশ্ব ১। ক-খ। (খণ্ডিত, তারিখ
 অজ্ঞাত)।
- ১৪। দ্রোপদীর বস্ত্রহরণ, প্রাগদুস্ত, ৮৯, ১৫৯)।
- ১৫। কথকতার পদ্ধতি, ১৫২৫ক, বনপর্বা, বিশ্ব, খণ্ডিত, তারিখ অজ্ঞাত, ৮৪ খ।
- ১৬। দ্রষ্টব্য, দ্রোপদীর বস্ত্রহরণের বিজ্ঞাপন, প্রাগদুস্ত।
- ১৭। দ্রষ্টব্য, ভরতগমন গীতাভিনয়ের বিজ্ঞাপন। প্রাগদুস্ত। বটলার পণ্ডিতদের
 নিয়ে সংশোধন, সংযোজন ও পরিমার্জন প্রচলিত রীতি ছিল। সঠিক সম্পাদনা,
 প্রাচীন বিচার করা ইত্যাদি আরেক রকমের পাঠ তৈরি করার ধারণা থেকে জাত।
 চন্দ্রশেখর মুনোপাধ্যায়, অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী প্রমুখরা এইসব পণ্ডিতদের বিরুদ্ধে
 খজ্ঞাস্ত ছিলেন।
- ১৮। হংসনারায়ণ ভট্টাচার্য, প্রাগদুস্ত, ২১৬-২২২। গোপেশচন্দ্র দত্ত, প্রাগদুস্ত, ২৪৭-
 ২৪৯।
- ১৯। রাজেশ্বর মিত্র, আমার দেখা বাংলা গানের জগৎ, কলিকাতা, ১৯৮৯, ৭৭।
- ২০। হিতেশ্বরজন সান্যাল, বাঙলা কীর্তনের ইতিহাস, কলিকাতা, ১৯৮৯।
- ২১। কৃষ্ণা বক্সী, কীর্তন গানের ইতিহাস, কলিকাতা, ১৩৯৫, ৮০-৮১। কথকী
 হিসাবে শ্রীমতী কৃষ্ণা বক্সীর সাক্ষ্য মূল্যবান। আখর ও কথার ভূমিকা কীর্তনে
 কীভাবে অমোঘ হতে পারে, তার জন্য দ্রষ্টব্য, আখরীয়া হরিদাসের কীর্তনবৃত্তান্ত,
 সরলাবালা সরকার, হারানো অতীত, কলিকাতা, ১৩৬০, ১৪০-১৪৭।

- ২২। খগেন্দ্রনাথ মিত্র 'কীর্তন,' বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ, কলিকাতা, ১৩৫২ পুনর্মুদ্রণ, ১১৫২, ৩৪-৩৫।
- ২৩। হরেকৃষ্ণ মদুখোপাধ্যায়, বাংগলার কীর্তন ও কীর্তনীয়া, রাজ্য পুস্তক পর্ষদ সংস্করণ ১৯৯০, ১০৫-১০৬।
- ২৪। পাঁচকড়ি দে সঙ্কলিত, মধুসূদন কিল্লরের ঢপকীর্তন, প্রাগদুস্ত।
- ২৫। উপর্যুক্ত অনুচ্ছেদের তথ্যভিত্তি, 'কৃষ্ণকীর্তন,' বিশ্বকোষ, নগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত, চতুর্থ ভাগ, ১৮৬৬-১৯১১, পুনর্মুদ্রণ, নিউ দিল্লী, ১৯৮৮, ৪০৪-৪৩৫।
- ২৬। উদ্ধৃতিগুলির উৎস, ঢপকীর্তন প্রভাস যন্ত্র পালা, শ্রীনৃসিংহ কুমার ঘোষ দ্বারা প্রকাশিত। কলিকাতা, চিংপূর রোড, ১৪০ নং কমলাকান্ত ঘোষ শ্রীতিনকড়ি বিশ্বাস দ্বারা মুদ্রিত। ১২৯২। ১-৪, ৮৩-৮৪।
- ২৭। পাঁচকড়ি দে সঙ্কলিত, প্রাগদুস্ত, ৬৪-৬৬।
- ২৮। কথকতার পুঁথি, ক.বি. খণ্ডিত, ৫০০৭, ১ ক-১ খ, লিপিকাল অজ্ঞাত।
- ২৯। পাঁচকড়ি দে, প্রাগদুস্ত, ৮০-৮১।
- ৩০। দীনেন্দ্রকুমার রায় 'কার্তিকের লড়াই', প্রাগদুস্ত, ২৯-৩০।
- ৩১। ঐ।

(। চান্দ্রাব্যুত্থিত।) □ পর্ব / ৭ □

- ১। 'লোকশিক্ষা', বঙ্কিমরচনাবলী, ২য় খণ্ড, যোগেশচন্দ্র বাগল সম্পাদিত, সংসদ সংস্করণ, ১৩৭১, ৩৭৬-৩৭৭।
- ২। দীনেশচন্দ্র সেন, বৃহৎ বঙ্গ, প্রথম খণ্ড, দে'জ সংস্করণ ১৯৯৩, ৩৮৬।
- ৩। দেবী প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, ভারতে বস্তুবাদ প্রসঙ্গে, অনুস্টপ, কলিকাতা, ১৯৮৭ ১৯২-১৯৫।
- ৩ক। রমাকান্ত চক্রবর্তী, 'কথকতা পাঠকতা' দৃষ্টব্য। বর্তমান সংখ্যা, যোগসূত্র।
- ৪। যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি, পৌরাণিক উপাখ্যান, কলিকাতা, ১৩৯০, ৮৮-৮৯।
- ৫। মহেন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের অনুধ্যান, সম্পাদনা, ধীরেন্দ্রনাথ বসু, কলিকাতা, ১৩৫০, ১২।
- ৬। দীনেশচন্দ্র সেন, বঙ্গভাষা ও সাহিত্য (অষ্টম সংস্করণের পুনর্মুদ্রণ, রাজ্য পুস্তক পর্ষদ প্রকাশন) অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, ১ম খণ্ড, কলিকাতা, ১৯৯১, ৭৯-৮০।
- ৭। দীক্ষণারঞ্জন মিত্র মজুমদার, ভূমিকা, (১৩১৫), ঠাকুরদাদার ঝুলি, কলিকাতা, ষোড়শ সংস্করণ, ১৩৯৩, ১৪।
- ৮। ঠাকুরদাদার ঝুলি, প্রথম সংস্করণ, ১৩১৫, ১৩৮-১৩৯।

- ৯। ঐ, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৩১৬, ৯৬।
- ১০। অনুচ্ছেদের অধিকাংশ শব্দাবলী ঠাকুরদাদার ঝুলির ভূমিকা (১৩১৬) থেকে উদ্ধৃত ; প্রচ্ছদের পেছনের কাগজে ছাপা সমসাময়িক সমালোচকদের নানা মন্তব্য ও দক্ষিণারঞ্জন লিখিত অন্যান্য বইয়ের বিজ্ঞাপনও কৌতূহলোদ্দীপক। বইয়ের আখ্যাপত্রে পুরোনাম—উপরে ছোট অক্ষরে “মাতৃগ্রন্থাবলী চতুর্থ সংখ্যা” দক্ষিণে কোণায় “বাংলার কথা সাহিত্য” মাঝে বড় অক্ষরে “বাংলার উপন্যাস ঠাকুরদাদার ঝুলি”। মলাটে কিন্তু ‘বঙ্গোপন্যাস’ লেখা আছে। প্রাগুক্ত সংস্করণ।
- ১১। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ভূমিকা (১৩১৪), ঠাকুরমার ঝুলি, দ্বিত্বংশতি সংস্করণ, ১৩৯১, ১২।
- ১২। যদুনন্দন দাস, গোবিন্দলীলামৃত, কৃষ্ণদাস কবিরাজ কর্তৃক সংস্কৃতে প্রণীত, কলিকাতা, ১২৭৪, ২।
- ১৩। শঙ্খ ঘোষ, কল্পনার হিষ্টিরিয়া, কলিকাতা, ১৯৮৪, ৫০।

(দীনেশচন্দ্র সেনের নামের আগে ভুলবশত ‘ডক্টর’ বসানো হয়েছে। এটা অপ্রয়োজনীয়।)



ভ্রম সংশোধন

“রিঙ্গনলীলার” বিন্যাস হবে এইরকম “নূপুর তুমি গুঞ্জনরবে সিঞ্জন করতঃ”—এর পরে “দিবানিশি জিতং শব্দ করহ” পড়তে হবে, ও “বিধি মার্গে জায় না জানা” পর্যন্ত টানা ক্রম বজায় থাকবে। এর পরে যারা “মাতৃ জাতিকে ঘৃণা করেন” থেকে “ভাষা শেখেন” অনুচ্ছেদটি আসবে। (দ্রষ্টব্য ৩৪-৩৭ পৃষ্ঠা)।

১৬৫ পৃষ্ঠায় “পটুয়াদের গানও শ্রোতারা শোনে না নির্বিকার উদাসীনতায়”—এই শব্দ পাঠ হবে।

তারানিশি ভট্টাচার্য নয়, তারানিশি মদুখোপাধ্যায় হবে।

